শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীহরিনামামৃত

দশ পর্বের পাঠক্রম

বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে গ্রন্থটি সংকলনে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন–

পতিত উদ্ধারণ গৌর দাস ব্রহ্মচারী

জগৎগুরু গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী

শুভ নিতাই গৌর দাস ব্রহ্মচারী

কৃষ্ণমুরারি দাস

অক্ষয়লীলা মাধব দাস

মায়াপুর ইনস্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশন

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক

শ্রীপাদ চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ

সেপ্টেম্বর, ২০১৪, (১৫০০ কপি)

গ্রন্থ প্রকাশে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন

শ্রীহরিনামামৃত কোর্সের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দ

মায়াপুর ইনস্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশন

ঢাকা, বাংলাদেশ

"*পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হৈবে মোর নাম ॥*" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এ বাণীর সার্থক রূপকার ও সেনাপতি ভক্ত, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)-এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের করকমলে।

মঙ্গলাচরণ

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

শ্রীগুরু প্রণাম

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীল প্রভুপাদ প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিতে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ-শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্যোজ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোহস্তুতে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী প্রণতি

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যমূর্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণতি

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রণতি

শ্রীগৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দেষ্টা সজ্জন-প্রিয়ঃ।
বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণব প্রণাম

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রণাম

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্ব প্রণাম

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তুতে ॥

শ্রীরাধা প্রণাম

তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী।
বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

সম্বন্ধাধিদেব প্রণাম

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দ মতের্গতী।
মৎসর্বস্ব-পদাম্ভোজে রাধা-মদনমোহনৌ ॥

অভিধেয়াধিদেব প্রণাম

দীব্যদ্-বৃন্দাবরণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

প্রয়োজনাধিদেব প্রণাম

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবট তটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ ॥

পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র

(জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

*****

সূচিপত্র

পর্ব তিন : নামাপরাধ

পর্ব চার : দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নামাপরাধ

পর্ব পাঁচ : পঞ্চম ও ষষ্ঠ নামাপরাধ

পর্ব ছয় : সপ্তম ও অষ্টম নামাপরাধ

পর্ব সাত : নবম ও দশম নামাপরাধ

পর্ব আট : নামাভাস ও নামগ্রহণ বিচার

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্

শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বিরচিত

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং পরিণাম সংশ্রয়ামি ॥ (১)

অর্থ : হে, হরিনাম, তুমি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ থেকে অভিন্ন বলে নিখিল শ্রুতিগণের শিরোরত্নমালার স্নিগ্ধদ্যুতির দ্বারা তোমার শ্রীপাদপদ্মের নখমণিসমূহ বন্দিত হচ্ছে (নীরাজিত); অর্থাৎ সমস্ত বেদসমূহ তেমার শ্রীচরণপ্রান্তের মহিমা কীর্তনপূর্বক স্তব করছে এবং মুক্ত পুরুষগণ নিরন্তর তোমার আরাধনায় নিযুক্ত রয়েছেন। অতএব আমি সর্বতোভাবে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়
জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগ্ উদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি ॥ (২)

অর্থ : হে হরিনামধেয় শ্রীহরি, আপনি সর্বোপরি জয়যুক্ত হোন। যে আপনি মুনিগণের কীর্তনীয় হয়েছেন, মানবগণের পরমানন্দ বিধানরূপ মনোরঞ্জনের জন্য চিদাক্ষররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই নাম-অভিহিত পরমতত্ত্ব আপনি অনাদরে অল্পমাত্র উচ্চারিত হলেও জীবের নিখল উগ্র সংসারতাপ ও পাপরাশি বিলুপ্ত করে থাকেন।

যদাভাসেহপ্যুদ্যন্ কবলিতভবধ্বান্তবিভবো
দৃশংতত্ত্বান্ধানামপি দৃষতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে
কৃতীতে নির্বক্তুংক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ (৩)

অর্থ : হে কৃষ্ণনামরূপ সূর্য, তোমার উদয়াভাসেও অবিদ্যান্ধকার কবলিত ব্যক্তির অজ্ঞানাদি দোষ বিদূরিত হয়ে যায়, তত্ত্বান্ধ ব্যক্তিগণের কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী বুদ্ধির বিকাশ হয়। অতএব এ জগতের কোন কৃতীমান ব্যক্তি তোমার বিস্তারিত মহিমা বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন?

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম! স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ (৪)

অর্থ : নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযোগ্য নিষ্ঠার দ্বারাও ফলভোগ ব্যতীত যে প্রারব্ধকর্মের অর্থাৎ অনাদিকাল থেকে সঞ্চিত পাপ-পুণ্যজনিত ফলের বিনাশ হয় না, হে নাম, জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফুরণমাত্রই তা ভোগ বিনা বিনষ্ট হয়ে যায়– একথা বেদই ঘোষণা করছে।

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণাকৃষ্ণাবিত্যনেক স্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বতাং নামধেয় ॥ (৫)

অর্থ : হে নামধেয় শ্রীকৃষ্ণ, অঘদমন, যশোদানন্দন, নন্দসুত, কমলনয়ন, গোপীচন্দ্র, বৃন্দাবনেন্দ্র, প্রণতকরুণ, কৃষ্ণ, ইত্যাদি অনেক স্বরূপে তুমি প্রকটিত থেকে অপার করুণা প্রদর্শন করছো; তোমার প্রতি আমার অনুরাগ সর্বোপরি বর্ধিত হোক।

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম স্বরূপদ্বয়ং
পূর্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণীসন্তাড্ভবে-
দাস্যেনেদমুপাস্য সোহপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ (৬)

অর্থ : হে শ্রীনাম, বাচ্য অর্থাৎ নামী এবং বাচক অর্থাৎ নাম– এ দুই স্বরূপে তুমি জগতে স্বপ্রকাশ রয়েছো। আহা, তার মধ্যে পূর্বেরটির চেয়ে পরেরটি অর্থাৎ নামীর চেয়ে নামকেই অধিক করুণাময় বলে বিবেচনা করি। কারণ যে জীব তোমার বাচ্য বা নামীস্বরূপের প্রতি অপরাধ করে, সেও আশ্রয়পূর্বক তোমার এ বাচকস্বরূপ নামের কীর্তনাদিরূপ উপাসনার দ্বারা অপরাধশূন্য হয়ে নিশ্চয়ই প্রেমরূপ সদানন্দসাগরে নিমগ্ন হতে পারে।

সূদিতাশ্রিত জনার্তিরাশয়ে
রম্যচিদ্ঘনসুখস্বরূপিণে।
নাম! গোকুলমহোৎসবায়তে
কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥ (৭)

অর্থ : হে নাম, হে কৃষ্ণস্বরূপ, তুমি আশ্রিতজনের নামাপরাধজনিত নিখিল ক্লেশবিনাশক। রমণীয় চিৎঘনসুখরূপ তুমি মহান উৎসবস্বরূপ। বিভূচিদানন্দবিগ্রহ সাক্ষাৎ মূর্তিমান শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অভিন্ন হে শ্রীনাম, তোমাকে বারংবার নমস্কার।

নারদীণোজ্জীবন সুধোর্মিনির্যাসমাধুরীপুর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥ (৮)

অর্থ : হে কৃষ্ণনাম, দেবর্ষি নারদের বীণার উজ্জীবনকারী, তুমি সুধা-উর্মিমালার সারাংশের ন্যায় নিরন্তর মাধুর্যরাশি বিস্তার করছো। অতএব তুমি আমার রসনায় রসের সাথে নিরন্তর যথেষ্টরূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হও। অর্থাৎ আমাকে নামরসিক করো।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীহরিনাম প্রভুর জয় হোক! শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অশেষ কৃপা এবং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামসংকীর্তন আন্দোলনের মহিমা প্রকাশসহ তা ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে শ্রীহরিনামামৃত কোর্সের পাঠক্রমটির সংকলন সম্পন্ন হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রীত। আমি একান্তভাবে চাই– এ কোর্সের মাধ্যমে আরো সুচারু ও ব্যাপকভাবে নামমহিমার প্রচার হোক।

সানন্দে জানাচ্ছি যে, মায়াপুর ইনস্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশন, বাংলাদেশ-এর পরিচালনায় এ কোর্সের পাঠক্রম প্রস্তুতিসহ প্রথম ব্যাচের ক্লাসও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। পাঠক্রমটি সংকলনে যে কজন শাস্ত্রানুরাগী ভক্তসেবক দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তা সার্থক হবে তখনই, যখন কোর্সটি সম্পন্ন করে ভক্তগণ সামান্য হলেও হরিনামের মহিমা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের জীবনকে ধন্য করতে পারবে। যারা কোর্সটি আয়োজনে, পাঠক্রম সংকলনে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ভূমিকা রেখেছেন, তাদের সকলকে আমি আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতাসহ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে হরিনামের সুবিজয় এবং বিশ্বশান্তি ও মঙ্গল কামনায় শেষ করছি।

চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
অধ্যক্ষ, স্বামীবাগ আশ্রম

ভূমিকা

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, "*গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন।*" আর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, "*নাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দ ভুবন মাঝে।*" এবং যে ধনের জন্য ঘোরতর এ কলিযুগও ধন্য ও মহাজনগণের প্রশংসারপাত্র হয়েছে, সে ধন সম্বন্ধে ধনলোলুপ বদ্ধজীব যদি সামান্যতমও জানত, তবে সর্বশক্তিমান পরমকরুণ সে হরিনামের আশ্রয় না নিয়ে তারা কিছুতেই থাকতে পারত না; সর্বতোভাবে নামের আশ্রয় গ্রহণ করে তারা তাদের জীবনকে পরম সফল ও সৌভাগ্যমণ্ডিত করত। নামরসে নিমজ্জিত শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ বলেছেন, **"দ্বিজাতিগণ অষ্টাঙ্গযোগ, বেদানুশীলন, নির্জনে ধ্যান ও তীর্থপর্যটনের দ্বারা নির্ভয় স্বরূপানুভূতি বা ব্রহ্মানন্দ লাভ করে করুক, কিন্তু আমরা শ্যামসুন্দর ভগবানের নামের সেবক, অতএব আমাদের লক্ষ লক্ষ জন্ম হোক।"**

হরিনামের অনন্ত মহিমার কথা যে সর্বশাস্ত্রেই কীর্তিত হয়েছে, তার কণারও কণামাত্র উপলব্ধি নয়, কেবল অধ্যয়ন করে আমরা নিজেদের যার পর নেই ধন্য মনে করছি এবং সেইসাথে অন্যদেরও তা জানানোর জন্য অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করছি। আর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীল প্রভুপাদসহ পূর্ব ও বর্তমান আচার্যবর্গের বাণী প্রচারের তাগিদ তো আছেই। এ ছোট গ্রন্থটির মাধ্যমে আমরা তাই শাস্ত্রবর্ণিত নামমহিমার কিঞ্চিৎমাত্র উপস্থাপন করার প্রয়াস করেছি। সেটাও নিঃসন্দেহে গুরু-গৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ এবং হরিনামের কৃপা ও শক্তিতেই।

পাঠক, এ পাঠক্রমের পাঠসমূহ সাজানো হয়েছে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং পূর্ব ও বর্তমান আচার্যবর্গের নাম সম্পর্কিত কথা, উপদেশ ও আলোচনার আলোকে। একে বহু গ্রন্থের নির্যাসও বলতে পারেন। প্রথম পর্বে জীবের স্বরূপধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার পরই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নামতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। তারপর নামাপরাধের বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করে বিভিন্ন উপমা, দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্র-উদ্ধৃতি সহযোগে প্রত্যেকটি নামাপরাধ ব্যাখ্যা ও প্রেক্ষাপটসহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণে এর পরিসর একটু বড় হলেও ধৈর্যের সাথে পুরোপুরি পড়লে নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা পাবেন।

শ্রীল প্রভুপাদসহ পূর্ব ও বর্তমান আচার্যগণ হরিনামামৃতসিন্ধুতে অবগাহণ করে লেখনি ও কথার মাধ্যমে যতটুকু ব্যক্ত করেছেন, তা থেকে বিন্দু বিন্দু করে সংগ্রহপূর্বক এ পাঠক্রমটি আত্মপ্রকাশিত হয়েছে। আমরা শ্রীল প্রভুপাদসহ সমস্ত বৈষ্ণবগণের দীনহীন সেবক হিসেবে তাঁদের কিঞ্চিৎ সেবা করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

অবশেষে, এর মাধ্যমে হরিনাম প্রভুর প্রীতিলাভ ও মানবসমাজের সামান্য উপকার সাধিত হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে। সকলকে কৃষ্ণপ্রীতি ও শুভেচ্ছা।

হরেকৃষ্ণ

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শুভ নিতাই গৌর দাস

মায়াপুর ইনস্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশন

ঢাকা, বাংলাদেশ

হরিনামের বিষয়ে প্রবেশ

জীবের স্বরূপধর্ম নির্ণয়

সম্বন্ধতত্ত্ব

সম্বন্ধতত্ত্বে তিনটি বিষয়ের পৃথক পৃথক শিক্ষা আছে– ভগবান বা প্রভুতত্ত্ব, জড়জগৎ বা মায়িকতত্ত্ব এবং জীব বা অধীনতত্ত্ব। এ তিন তত্ত্বের পারস্পরিক সম্বন্ধই সম্বন্ধতত্ত্ব। সম্বন্ধতত্ত্ব সম্যকভাবে জানতে পারলে সম্বন্ধজ্ঞান হয়। যাঁ থেকে সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম এবং পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই সমগ্র বিশ্ব এবং সমস্ত জীবের নিত্য-অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায়, তিনিই মূলত সম্বন্ধতত্ত্ব।

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর। / অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিকশেখর ॥ (চৈ. চ. ১/৭/৫)

সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন। / সর্বৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ ॥ (ঐ- ২/৮/১০৮)

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়; অনাদির আদি, সর্বশক্তিমান, সর্বকারণের পরম কারণ এবং তিনিই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও অনন্ত অবতারের আধার, সর্বাকর্ষক, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের একমাত্র নিলয়, মায়া ও জীবশক্তির একমাত্র আশ্রয়। মায়া ও জীবের আশ্রয় হয়েও সর্বদা সুন্দররূপে তিনি এক স্বতন্ত্র-স্বরূপ। তাঁর অঙ্গকান্তি সুদূরবর্তী হয়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত। তিনিই জগৎ ও জীব সৃষ্টি ও পালনকারী জগৎপ্রবিষ্ট পরমাত্মারূপী ঈশ্বরতত্ত্ব। তাঁর শক্তি, প্রকাশ ও বিলাস নিত্য ও অনন্ত; ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য– এ ষড়ৈশ্বর্য তাঁর নিত্যগুণ। এ ছয়টি গুণের কোনোটির অধিক প্রকাশ এবং কোনোটির স্বল্প প্রকাশ অনুসারে তাঁর প্রকাশভেদ হয়। যেখানে ঐশ্বর্যপ্রধান প্রকাশ, সেখানে তিনি পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ। যেখানে শ্রী ও মাধুর্য বলবান, সেখানে তিনি স্বয়ং বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার সর্বোত্তম প্রকাশ।
শ্রীসনাতন শিক্ষায় আরও বলা হয়েছে–

কৃষ্ণের স্বরূপবিচার শুন সনাতন। / অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব-আদি, সর্ব-অংশী, কিশোর-শেখর। / চিদানন্দ দেহ, সর্বাশ্রয়, সর্বেশ্বর ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' পর নাম। / সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম ॥
(চৈ. চ. মধ্য ২০/১৫২-৫৫)

অধিকারীভেদে এক সচ্চিদানন্দস্বরূপ বিভুচেতন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশভেদ

১। যখন শক্তি ও শক্তিমানের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হয় না, তখন বিশেষণরহিত হয়ে কেবল নির্বিশেষরূপে তাঁকে জানা যায়। কিন্তু চোখে দেখা যায় না বা পাওয়া যায় না। নির্ভেদদৃষ্টি জ্ঞানীগণের কাছে কেবল সত্তাপ্রধান ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাত হন।

২। যখন মায়াশক্তির মধ্যে চিৎশক্তির অংশবিশেষ সবিশেষরূপে তাঁকে জানা যায়, অন্তর্যামীরূপে অন্তরে দেখা যায়; কিন্তু সেব্যরূপে পাওয়া যায় না, তখন চৈতন্যপ্রধান পরমাত্মারূপে তিনি অষ্টাঙ্গযোগীগণের কাছে প্রতিভাত হন।

৩। যখন সর্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে তাঁকে জানা যায়, অন্তরে বাইরে দেখা যায় এবং সেব্যরূপে পাওয়া যায়, তখন আনন্দপ্রধান শ্রীভগবানরূপে তিনি ভক্তগণের কাছে প্রতিভাত হন।

৪। আর যখন পূর্ণপ্রকাশিত সর্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দ-রসঘনবিগ্রহ, বংশীধারী, নটবর গোপকিশোররূপে তাঁকে জানা যায়, অন্তরে ও বাইরে– শ্রীবৃন্দাবনে দেখা যায় এবং সর্বসেব্যরূপে পাওয়া যায়, তখন রসিক ভক্তগণের কাছে তিনি রসপ্রধান– রসরাজ স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রতিভাত হন।

সুতরাং ব্রহ্ম থেকে মূল বাসুদেব পর্যন্ত ভগবৎস্বরূপগণ এক সর্বমূল শক্তিমানতত্ত্ব কৃষ্ণস্বরূপেরই প্রকাশভেদ মাত্র। সাধক জীবের অধিকারভেদই পরতত্ত্বের উক্ত প্রকাশভেদের কারণ এবং সকলেই শক্তিমানতত্ত্ব, কেউই শক্তিতত্ত্ব নন। মায়াশক্তির সাথে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকায় মায়াশক্তির কার্য– দ্রব্য, গুণ ও কর্মসমূহ বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় হয়েও শ্রীকৃষ্ণ তা থেকে অতিরিক্ত, অবিতর্ক অচিন্ত্যতত্ত্ব। তাঁর স্বরূপের আবার চতুর্বিধ প্রকাশ; যথা : **নাম, রূপ, গুণ** ও **লীলা**, যেখানে বিরোধী ধর্মের কোনো সম্ভাবনা নেই। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই শ্রেষ্ঠ নামী এবং কৃষ্ণবাচক শব্দ 'কৃষ্ণ'ই শ্রেষ্ঠ নাম। এ নামের সাধনার চরম অবস্থায় পরাভক্তি বা পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান, যথা : (১) চিৎশক্তি, স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি, (২) জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি এবং (৩) মায়াশক্তি বা জড়শক্তি। চিৎশক্তির দ্বারা তিনি চিজ্জগৎ, তটস্থা শক্তির দ্বারা অনন্ত জীব বা জীবজগৎ এবং মায়াশক্তির দ্বারা তিনি চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড, তন্মধ্যস্থ ভোগ্যবস্তু, দেব-নরাদি যাবতীয় জীবের ভোগায়তন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

উক্ত তিন প্রধান শক্তির মধ্যে বহিরঙ্গা জড়শক্তির চেয়ে জীবশক্তি শ্রেষ্ঠা, আবার জীবশক্তির চেয়ে অন্তরঙ্গাশক্তি সর্বদা শ্রেষ্ঠা বলে তাকে পরাশক্তি বলা হয়। অন্তরঙ্গাশক্তির মধ্যে আবার সন্ধিনীর চেয়ে সম্বিৎ এবং সম্বিতের চেয়ে হ্লাদিনী শ্রেষ্ঠা। সুতরাং জানতে হবে ভগবানের সমস্ত শক্তির মধ্যে হ্লাদিনীই সর্বশ্রেষ্ঠা অর্থাৎ পূর্ণশক্তি। ("*তত্র সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিন্যোর্যথোত্তরমুৎকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ।*"– সিদ্ধান্তরত্ন) এ হ্লাদিনীর বৃত্তিই ভক্তি এবং ভক্তির পরম ঘনীভূতসমূর্তভাবই শ্রীমতি রাধারাণী– 'সর্বশক্তি ও ভক্তির মধ্যে সর্বাধিকা, সর্বকান্তাশিরোমণি– কৃষ্ণপ্রাণাধিকা।'

১. চিৎশক্তি

ভগবানের স্বরূপে **সৎ** (জ্ঞান), **চিৎ** (বল) ও **আনন্দ** (ক্রিয়া)– এ তিন বস্তু থাকায় তাঁর অন্তরঙ্গাশক্তিরও তিনটি বৃত্তি, যথা : সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈ শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।*" (শ্বেতাশ্ব. ৬/৮) অর্থাৎ জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া নামক শক্তি তাঁর স্বাভাবিকী বা স্বরূপভূতা।

সন্ধিনী : ভগবানের সৎ অংশের শক্তিকে বলে সন্ধিনী। এটি সত্তা সম্বন্ধিনী শক্তি। এর দ্বারা ভগবান নিজের ও অন্যের নিত্য সত্তা বা স্বরূপকে রক্ষা করেন।

সম্বিৎ : ভগবানের চিৎ অংশের শক্তিকে বলে সম্বিৎ। এটি জ্ঞান (চিৎ, চেতনা) সম্বন্ধিনী শক্তি। এর দ্বারা ভগবান নিজে জানেন, অন্যকেও জানান। শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান– এ জ্ঞানই সম্বিৎ শক্তির সার।

হ্লাদিনী : ভগবানের আনন্দ অংশের শক্তিকে বলে হ্লাদিনী। এটি আনন্দ সম্বন্ধিনী শক্তি। এর দ্বারা ভগবান নিজে আনন্দ উপভোগ করেন, অন্যকেও আনন্দ দান করেন। হ্লাদিনী শক্তির সার 'কৃষ্ণপ্রেম', কৃষ্ণপ্রেমের সার 'ভাব' এবং ভাবের চরম প্রকাশ 'মহাভাব'; আর শ্রীমতি রাধারাণী মহাভাবের মূর্ত প্রকাশ।

শুদ্ধসত্ত্ব : উক্ত প্রত্যেক বৃত্তিরই আবার অনন্ত বিলাস-বৈচিত্র্য আছে। সৎ, চিৎ ও আনন্দকে যেমন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীকেও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। চিৎশক্তি স্বপ্রকাশ। তা নিজেকেও প্রকাশ করে, অন্যকেও প্রকাশ করে এবং সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনীযুক্ত চিৎশক্তির স্বপ্রকাশ বৃত্তির দ্বারা ভগবান স্বয়ং প্রকাশিত ও আবির্ভূত হন। এ বৃত্তি বিশেষকেই বলে শুদ্ধসত্ত্ব। কৃষ্ণের মাতা-পিতা, ধাম-গৃহ, আসন-শয্যা ইত্যাদি সবই শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ। মায়ার সাথে এর কোনো সংস্রব নেই বলে একে বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে।

২. জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি

জীবশক্তি চিৎ এবং মায়িক উভয় শক্তির নিয়ন্ত্রণেই প্রবেশ করতে পারে, উভয় জগতে বাস করে উভয় জগতের বৈভব ভোগ করতে পারে। এজন্য একে বলা হয় তটস্থাশক্তি। ঠিক যেমন সমূদ্রের তট সমুদ্রের অংশও নয়, আবার স্থলভূমির অংশও নয়। জীব যখন নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে কৃষ্ণবহির্মুখ হয়ে যা তখন বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কবলে পতিত হয়; আবার যখন নিজের স্বরূপের স্মৃতি অক্ষুণ্ন রেখে কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি তাকে অঙ্গীকার করে।

মায়াশক্তি

সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণবিশিষ্ট ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিই ভগবানের ছায়াস্বরূপা মায়াশক্তি, যা বহির্মুখ জীবের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করে তাকে মায়িক বস্তুর প্রতি মোহিত করে। এই মায়াশক্তি কখনো শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে পারে না অথবা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা চিৎশক্তির কার্যক্ষেত্রেও প্রবেশ করতে পারে না। সর্বদা বাইরে থাকে বলে এ মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলা হয়। কৃষ্ণবহির্মুখ জীবকে সংসারসুখের প্রলোভন দেখিয়ে জীবকে ত্রিতাপজ্বালায় জর্জরিত করে, যাতে জীব সংসারের অনিত্যতা ও তুচ্ছতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সংসার ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়।

জীবের স্বরূপ

জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। কৃষ্ণ বৃহৎ চিৎবস্তু আর জীব অণু চিৎবস্তু–

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ– যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ *(চৈ. চ. আদি ৭/১১১)*

অর্থ : ঈশ্বরতত্ত্ব প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বৃহৎ, আর জীব এ প্রজ্বলিত অগ্নির কণাসদৃশ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। ভগবান অংশী আর জীব অংশ। সুতরাং জীব ভগবানের অধীন। স্ফুলিঙ্গসদৃশ জীব সংখ্যায় অপরিমেয় এবং এর আয়তন চুলের অগ্রভাগের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। জীব দুই প্রকার; যথা : নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ।

নিত্যমুক্ত জীব

যে সকল জীব মায়াবৈভব দর্শন করে মুগ্ধ না হয়ে স্বরূপ স্মরণপূর্বক শ্রীভগবানের সেবা করাকেই পরম সুখ মনে করলেন এবং সেজন্য শ্রীভগবানের কৃপায় বৈকুণ্ঠ আদি চিদ্ধামে নিত্যবাস করে ভগবৎসেবা সুখ উপভোগ করতে লাগলেন, তাঁরাই নিত্যমুক্ত। তাঁরা ভগবানের নিত্যপার্ষদ।

নিত্যবদ্ধ জীব

যে সকল জীব মায়িক বৈভবের বৈচিত্র্য দর্শন করে মুগ্ধ, আত্মহারা ও স্বরূপ-বিস্মৃত হয়ে দাসরূপে ভগবৎসেবা করতে বিমুখ হওয়ায় মায়িক জগতে বাস করে কর্তা সেজে জড়সুখ উপভোগ করাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করায় মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়েছে এবং কর্মমার্গের পথিক হয়ে চতুর্দশ ভুবনে পরিভ্রমণ করে সুখের নিয়ত দুঃখ ভোগ করছে, তারাই নিত্যবদ্ধ। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, উপরিউক্ত নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত শব্দে ব্যবহৃত 'নিত্য' শব্দের অর্থ অনাদি। কবে থেকে যে এই মুক্ত ও বদ্ধ অবস্থা শুরু হয়েছে, তার আদি নেই। এক্ষেত্রে নিত্য শব্দের দ্বারা চিরকাল অর্থ বোঝায় না, তাই মনে করার কারণ নেই যে নিত্যবদ্ধ জীব চিরকাল বদ্ধই থাকবে।

জীবের বন্ধনের কারণ

জীব অনাদিকাল থেকে তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করে ভগবানের প্রতি বিমুখ হওয়ার কারণেই মায়ার কবলে আবদ্ধ হয়েছে। ভগবৎবিমুখতার কারণে সে স্বরূপশক্তির কৃপা থেকে বঞ্চিত। আর এজন্যই মায়া তাকে কবলিত করতে পেরেছে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে জীব মায়াকবলিত হয়ে ত্রিতাপজ্বালায় জর্জরিত হচ্ছে। তবে মায়া ভগবানের শক্তি হওয়ায় জীবের অনিষ্ট করা তার উদ্দেশ্য নয়। বহির্মুখ জীবকে মায়ার যে দণ্ড, তা নিশ্চিতরূপে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন করে তাকে ভগবানের প্রতি উন্মুখ করার উদ্দেশ্যেই। ঠিক যেমন কোনো শিশু যখন বার বার আগুনে হাত দিতে চায়, তখন একজন বুদ্ধিমতি মা শিশুটিকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার জন্য ওর আঙ্গুল বা হাতটি ধরে আগুনে ছুইয়ে দেন, যাতে সে আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা বুঝতে পেরে আর কখনোই আগুনে হাত না দেয় এবং সর্বদা সাবধান থাকে।

জীবের প্রয়োজন

যা পাওয়ার জন্য জীব ব্যাকুল হয়ে নিরন্তর ছোটাছুটি করে, যা পেলে জীবের আর চাওয়ার কিছু থাকে না, তাই প্রয়োজন, তাই জীবের পরম পুরুষার্থ। ত্রিতাপ ক্লেশের তীব্র দহনে দগ্ধ মায়াবদ্ধ জীব যে বস্তু পেলে পরম সুখ ও আনন্দ লাভ করে, তাই প্রয়োজন। আর তা পাওয়ার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয়, তাকেই শাস্ত্র অভিধেয় বলে আখ্যা দেয়। যদি প্রয়োজনই স্থির না হয়, তবে তার অভিধেয় নির্ণয় হতে পারে না। তাই অভিধেয় সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে জীবের প্রয়োজন বা সাধ্য বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :

কায়িক, বাচিক, বা মানসিক যেকোনো কার্যই করা হোক না কেন, আনন্দ বা সুখ লাভই আমাদের পরম লক্ষ্য, সমগ্র জীবজগতে আনন্দই একমাত্র পুরুষার্থ। শাস্ত্রসমূহ জগতে আনন্দের সংবাদই দিয়ে থাকেন। এ আনন্দকেই শ্রুতিতে ব্রহ্ম (*আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং...*) এবং এর ঘনীভূত অবস্থাকে রস বলে অভিহিত করা হয়েছে। রসই রসরাজ ভগবানের স্বরূপ। এজন্য শাস্ত্রে ভগবানকে 'আনন্দঘনমূর্তি' বলা হয়েছে। সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি রসরাজ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রুতি বর্ণিত '**রসো বৈ সঃ**'। তিনিই জীবের ভাব ও অধিকার ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে প্রকাশিত হন।

গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতিতে বলা হয়েছে, "*ওঁ তদ্ যৎ তৎ সৎ পরং ব্রহ্মকৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ।*" –(১৫) "*বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।*"– (১৮) অর্থাৎ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই ঘনীভূত আনন্দ, ঘনীভূত বিজ্ঞান (চিৎ) এবং নিত্যানন্দস্বরূপ। তিনিই ভক্তিযোগে লভ্য সচ্চিদানন্দঘনরসস্বরূপ। জীব রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হলেই আনন্দ লাভ করে। যেহেতু আনন্দ থেকেই জীবের জন্ম, আনন্দই জীবের জীবনোপায় এবং আনন্দই তার শেষ বিশ্রামস্থল। এজন্যই নদী যেমন সাগরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ধাবমান হয়, তেমনি জীবও আনন্দ লাভের জন্য সর্বদা ছোটাছুটি করে। জল ছাড়া যেমন জলচর প্রাণী বাঁচতে পারে না, আনন্দসম্ভূত জীবও তেমনি আনন্দ ছাড়া বাঁচতে পারে না। আনন্দময় পুরুষের অংশ জীব জ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানেই হোক অনাদিকাল ধরে আসলে আনন্দময়ের অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত রয়েছে। জীবের চিরন্তনী বাসনা আসলে তাঁরই জন্য।

তবে দুঃখের বিষয় হলো, সেই আনন্দ বস্তুটির স্বরূপ কী তা মায়ার দ্বারা মোহিত জীব সম্যকভাবে জানেই না। বিষয়সংসর্গজনিত আনন্দের ছায়াই তাদের কাছে সুখ বলে পরিচিত। এর প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়, যেহেতু বিকৃত হলেও তা ভূমানন্দেরই ছায়াস্বরূপ। তাতে প্রকৃত আনন্দ নেই, আছে শুধু তার আভাস, মরীচিকার মতো হাতছানি মাত্র। তদুপরি তা অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর ও সীমিত। তাই জীবের পরিতৃপ্তি হয় না, তাঁর চিরন্তনী বাসনারও অবসান হয় না, কেবল সুখের লালসায় মরীচিকার পেছনে জীবনভর ছুটে চলা। তাই এ জগতে এত অভাব, এত অভিযোগ, এত দুঃখ-কলহ আর অশান্তি; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই গীতায় এ জগৎকে বলেছেন '*দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্*'। সুখের অভাব, অনিত্যতা ও অল্পতাই এর একমাত্র কারণ। অল্পে সুখ নেই, ভূমাই সুখ। ভূমা কী? ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭/২৩-২৪) ভূমা সম্বন্ধে বলা হয়েছে– 'যা দেখলে আর কিছু দেখার থাকে না, যা শুনলে আর কিছু শোনার থাকে না, যা জানলে আর কিছু জানার থাকে না, তাই ভূমা।' পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভূমানন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ।

আরেকটি বিষয় হলো, শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদ্য হওয়ায় আস্বাদন বা সুখপ্রাপ্তির জন্য অন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন হয় না। তিনি সাকার এবং সুখেরই গড়া মূর্তি। তাঁর ধাম, বসন-ভূষণ, পরিকরাদি সমস্তই আনন্দে গড়া, চিদানন্দময়। ভগবৎ-আনন্দ বা ভক্তিসুখ পূর্ণতম মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে পরমানন্দ পরম রসময় রূপ ধারণ করলে তাকে 'শ্রীকৃষ্ণানন্দ' বা পরম প্রেমসুখ বলে। ভক্তিসুখের সাথে এর ছায়ারূপ বিষয়সুখের কোনো তুলনাই চলে না। ছায়া কখনো ধরা যায় না। সেজন্য বিষয়ে না পাওয়ার এত অতৃপ্তি, কিন্তু ভক্তিসুখে প্রাপ্তির পূর্ণতা সাধিত হয়। ছায়াকে দেখা গেলেও তাকে ধরতে গেলে যেমন ধরা সম্ভব হয় না, বিষয়ভোগের মধ্যেও তেমনি পরিতৃপ্তি চিরকাল অধরাই থেকে যায়। পক্ষান্তরে কায়ারূপী ভক্তিসুখকে ধরা যায়, আলিঙ্গন করা যায়– প্রাপ্তির পরম তৃপ্তিতে আত্মার সুপ্রসন্নতাও সাধিত হয়। "*সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। / ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥*" *(চৈ. চ. ২/৮/১২১)*

একমাত্র ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত সেই ভূমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার অন্য কোনো উপায় নেই। কেবল ভক্তির দ্বারা বশীভূত হন বলে শাস্ত্রে তাঁকে **'ভক্তিবশঃ পুরুষঃ'** বলে অভিহিত করা হয়েছে। ধন লাভ করলে যেমন সুখরূপ ফল লাভের সাথে সাথে দুঃখও নিবৃত্ত হয়, তেমনি ভক্তি লাভ করলে এর প্রেমরূপ ফল ও ভূমানন্দস্বরূপ কৃষ্ণরস আস্বাদনের সাথে সাথে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, শোক-ভয়সহ ত্রিতাপক্লেশেরও চিরনিবৃত্তি হয়ে যায়। প্রেমানন্দই ভক্তির মুখ্য ফল; দুঃখনিবৃত্তি তার আনুসঙ্গিক ফল। সুতরাং দুঃখনিবৃত্তি জীবের প্রয়োজন হলেও তা মুখ্য নয়, মুখ্য প্রয়োজন হলো প্রেমলাভ যা পুরুষার্থ শিরোমণি। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমই জীবের প্রয়োজন।

অভিধেয়-তত্ত্ব

ভগবান, জীব এবং জড় জগতের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ তা জেনে সে অনুযায়ী কর্তব্য পালনকেই বলে অভিধেয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর জৈবধর্ম নামক গ্রন্থে বলেছেন, "সচ্চরিত্রতার সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন করতে হয়– এর নামই 'অভিধেয়-তত্ত্ব'। এ তত্ত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত হয়েছে বলে শ্রীমন্মহাপ্রভু একে অভিধেয়-তত্ত্ব বলেছেন।"

জীবের স্বরূপধর্ম

কোনো বস্তুর ধর্ম বলতে সে বস্তুর স্বাভাবিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়, যা ওই বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; আর বিচ্ছিন্ন করলে সে বস্তুর অস্তিত্বই থাকে না। যেমন জলের ধর্ম তারল্য, লবণের ধর্ম লবণাক্ততা ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবেই চেতন জীবেরও একটি ধর্ম আছে, যা শুধু চেতন জীবের মধ্যেই দেখা যায়। সেটাই জীবের ধর্ম। ভগবান প্রভু, জীব তাঁর নিত্য সেবক বা দাস। শক্তিমানের আনুগত্য ও অধীনত্বই শক্তির স্বাভাবিক ধর্ম বলে ভগবানের প্রতি আনুগত্য ও অধীনত্বই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম বা স্বরূপধর্ম। ভগবানকে ভালোবেসে এবং তাঁর সেবা করে আনন্দ লাভই জীবের স্বরূপধর্ম বা নিত্যধর্ম। তাই জড় জগতে আবদ্ধ জীবের মধ্যেও জীবের এ স্বভাবের প্রতিফলন আমরা দেখি :

সেবা : মানুষমাত্রই কারো না কারো সেবা করে– স্ত্রী স্বামীর, স্বামী স্ত্রীর, পিতা-মাতা সন্তানের, সন্তান পিতা-মাতার, বন্ধু বন্ধুর, অফিসকর্মী বসের, রাষ্ট্রপতি জনগণের।

ভালোবাসা : প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভালোবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তা হয়ে থাকে পাঁচভাবে; যথা **১) শান্ত, ২) দাস্য, ৩) সখ্য বা বন্ধুত্ব, ৪) বাৎসল্য এবং ৫) মধুর।** মানুষ তো বটেই মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও ভালোবাসার সম্পর্ক লক্ষণীয়। কোনো কোনো মানবাত্মার ভালোবাসা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবতা, সমস্ত জীব এবং সকলের উৎস পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অভিব্যক্ত হয়।

আনন্দ : অন্যদের সাহচর্যে অনুক্ষণ আনন্দে থাকাই চেতন জীবের স্বভাব। নানা আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিনিয়তই সে আনন্দে থাকতে চায়। এজন্যই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয় বিনোদন, খেলাধুলা, কাব্য-সাহিত্য-চলচ্চিত্র, মেলা-উৎসব আর আমোদ-প্রমোদে।

জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হয়ে এ স্বভাব বিকৃতভাবেও প্রকাশ পায়; যেমন : **(১) সেবাভাব বিকৃত হয়ে প্রকাশিত হয় প্রভুত্ব-বাসনায়। তাই সে অন্যদের ওপর প্রভুত্ব করতে চায়; (২) ভালোবাসা পরিবর্তিত হয় বিকৃত কাম ও স্বার্থপরতায় এবং (৩) শুদ্ধ ভগবৎপ্রেম, ভগবানের দিব্য-সান্নিধ্য এবং তাঁর সাথে জীবের উৎসবমুখর, আনন্দঘন প্রীতিবিনিময়ের বিকৃত প্রতিফলন ঘটে আমোদ-প্রমোদ, বিকৃত রুচির সঙ্গীত-কাব্য-সাহিত্য ও নেশা-মাদকতায়।** জড় জগতে গুণের প্রভাব অনুসারে জীবের এই বিকৃত স্বভাবের তারতম্য হয়। যতদিন না জীব এই গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হচ্ছে, ততদিন তার শুদ্ধ স্বভাব বা ধর্ম তার মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে না। জড় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে

মুক্ত হলেই কেবল সে তার যথার্থ স্বধর্মে অধিষ্ঠিত হয়ে পরমানন্দ আস্বাদন করে পূর্ণ পরিতৃপ্ত হতে পারে। নিম্নে একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো :

চুম্বকের দুটি ধর্মের কথা আমরা জানি। তার একটি হলো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ধর্ম এবং অন্যটি দিকনির্দেশনী ধর্ম। চুম্বক যেকোনো চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করে, দুটি চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। আর তা মুক্ত অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখলে সর্বদা উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে থাকে। চুম্বককে যেভাবেই রাখা হোক বা ধরা হোক না কেন, সেটি লোহা, কোবাল্ট ইত্যাদি চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করবেই। কোন দিক করে, কীভাবে ধরা হচ্ছে বা রাখা হচ্ছে তাতে যায় আসে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত একে কোনো অবলম্বনে বা কোনোকিছুর সংস্পর্শে রাখা হচ্ছে, ততক্ষণ এর দিকনির্দেশনী ধর্ম এটি প্রকাশ করতে পারে না। মুক্ত অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখলেই কেবল সেই ধর্ম প্রকাশ করে। এ দিকনির্দেশনী ধর্মকে তাই চুম্বকের মুক্ত অবস্থার ধর্ম বা স্বরূপধর্ম বলা যায়। চুম্বক এ ধর্ম প্রকাশ করে কেন? কারণ পৃথিবী নিজেই একটি বৃহৎ চুম্বক হওয়ায় ক্ষুদ্র চুম্বকের উপর স্বাভাবিকভাবেই এর আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে এবং ক্ষুদ্র চুম্বকের দুই বিপরীত মেরু পৃথিবীরূপ চুম্বকের উত্তর-দক্ষিণ মেরুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কোনো অবলম্বনে বা কোনোকিছুর সংস্পর্শ থাকলে ক্ষুদ্র চুম্বকটি বৃহৎ চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে না। একইভাবে জীবাত্মাও বদ্ধ অবস্থায় এ জড় জগতের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি সর্বদাই আকৃষ্ট হয়; জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তিই জীবের বন্ধন। এ অবস্থায় তার স্বরূপধর্ম (কৃষ্ণোন্মুখতা) প্রকাশিত হতে পারে না। কিন্তু মুক্ত হলেই ক্ষুদ্রচেতন জীব বিভুচেতন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর শরণাগত হয়, সেবা করে আনন্দ লাভ করে– এটিই জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি বা ধর্ম।

কিন্তু জড় জগতে বিভিন্ন ধর্মের প্রচলন; তাই বিচার করতে হবে তা নিত্যধর্মের অনুকূল কিনা। যে ধর্ম যে পরিমাণে অনুকূল, তা সে পরিমাণে গ্রহণযোগ্য, প্রতিকূল হলে গ্রহণযোগ্য নয়। একারণে সে সম্বন্ধে জানার আবশ্যকতা রয়েছে। অতি সংক্ষেপে এ নিয়ে আলোচনা করা হলো :

সাধারণ ধর্ম

শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ভুলে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঋষিগণ যে ভেদমূলক ধর্মোপদেশ করেছেন, সেসব ধর্মই সাধারণ ধর্ম। এসব ধর্ম অতিশয় ক্লেশকর এবং এর ফল অতি তুচ্ছ। মায়ানির্মিত অনিত্য ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্বর্গাদি কামনা করে এসব ধর্ম পালন করা হয়। এ ধর্মের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। এজন্যই তা সাধারণ। একে গৌণ ধর্মও বলা যায়। যেমন বর্ণাশ্রম ধর্ম।

নিত্যধর্ম বা ভাগবত ধর্ম

যে ধর্ম পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অর্পণ করেছেন, যা সকল জীবের পক্ষে অনায়াসসাধ্য, আবালবৃদ্ধবনিতা, ব্রাহ্মণ-শূদ্র-চণ্ডালসহ গৃহস্থ-সন্ন্যাসী সকলেই যে ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে সমান অধিকারী, যেখানে স্থান-কাল-পাত্র ও অবস্থার ভেদবিচার নেই, যা পালনের ফলে সচ্চিদানন্দময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রেম লাভ হয় এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু ভগবানের শক্তিপ্রসূত বলে বিশ্বপ্রেমও উৎপন্ন হয়, সে ধর্মই ভাগবত ধর্ম। এটিই জীবের নিত্যধর্ম বা মুখ্যধর্ম এবং ভগবদ্ভক্তিই জীবের নিত্যধর্ম।

নৈমিত্তিক ধর্ম

নিত্যধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হলে জীব নৈমিত্তিক ধর্মকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয় নৈমিত্তিক ধর্ম পরিবর্তনশীল, পরিবর্জনশীল ও পরিবর্ধনশীল; জীবের সাথে এর নিত্যসম্বন্ধ নেই। উদাহরণস্বরূপ, জলের নিত্যধর্ম হলো তারল্য, কিন্তু তা যখন বরফে পরিণত হয়, তখন এর অন্য একটি ধর্ম সৃষ্টি হয় এবং তা হলো কাঠিন্য। এ কাঠিন্যই জলের নৈমিত্তিক ধর্ম।

জড় জগতে বিভিন্ন সময় যেসব ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, তা-ই নৈমিত্তিক ধর্ম। নৈমিত্তিক ধর্ম যে পরিমাণে নিত্যধর্মের অনুকূল, সে পরিমাণে তা বিশুদ্ধ এবং সে পরিমাণে তা জীবনযাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে আদরণীয়।

নৈমিত্তিক ধর্ম এবং জীবের ক্রমোন্নতি

গ্রহণযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে বদ্ধ ও অশৃঙ্খল জীবকে ক্রমান্বয়ে কল্যাণের পথে নিয়ে আসার জন্য পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তৎকালীক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে; যথা : মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি। আমাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রেও বিভিন্ন শ্রেণীর বদ্ধজীবের ক্রমোন্নতির জন্য বিভিন্ন পন্থার বর্ণনা করা হয়েছে।

বদ্ধজীব নিজের স্বরূপ ও কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে কর্তা হয়ে বিষয় ভোগ করতে চায়। জ্ঞানহীন পশুরা যেমন ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, পারমার্থিক জ্ঞানশূন্য মানুষও তেমনি বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। বিষয়ী মানুষ ধর্ম-অর্থ-কামের প্রতি আকৃষ্ট। ভগবান সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। এহেন কৃষ্ণবহির্মুখ বদ্ধ জীবসমূহ যাতে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের সাথে সাথে ধীরে ধীরে পবিত্র হয়ে স্বরূপধর্মে বা নিত্যধর্মে অধিষ্ঠিত হতে পারে, সেজন্য বেদে ক্রমোন্নতি সাধনের পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবতমের ২/৭/৩২নং শ্লোকের তাৎপর্যে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, **"বৈদিক শাস্ত্রে দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে উচ্চতর অধিকারীদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করা।"**

ভোগের প্রতি আসক্ত জীব স্বভাবতই বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম চরিতার্থ করার জন্য তারা যজ্ঞ, দান, দেবতাপূজাসহ বিভিন্ন ধরনের পুণ্যকর্ম করে এবং প্রত্যাশিত ফল লাভ করার ফলে তাদের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের প্রতি বিশ্বাস জন্মে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন কাম্যবস্তু লাভের জন্য তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। ভূত-প্রেত, পিতৃপুরুষ, বৃক্ষাদির পূজাও অনেকে করে। যাই হোক, ধীরে ধীরে কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে যে, এ জগৎ অনিত্য ও দুঃখময়। পুরোহিতের কাছে এও জানতে পারে যে, স্বর্গেও দুঃখ আছে; দেবরাজ ইন্দ্রও রাজ্য হারানোর ভয়ে থাকেন। এভাবে জড় জগতের বাস্তবতা উপলব্ধির করার ফলে ঋষি ও শাস্ত্রের প্রতি তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। শাস্ত্র ও ঋষিগণের কাছ থেকে যখন জানতে পারে– তারা তাদের দেহ নয় চিন্ময় আত্মা, তখন জড়জগতের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে তারা মোক্ষ বা মুক্তি লাভের জন্য আধ্যাত্মিক চর্চায় ব্রতী হয়। কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে পরমার্থের উদ্দেশ্যে কর্ম করার মাধ্যমে কর্মযোগীতে পরিণত হয়। ব্রহ্মবাদী ও ভক্ত– এ দুই প্রকার কর্মযোগীর যেকোনোটিই হতে পারে। অনেকেই অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। অষ্টাঙ্গযোগী এবং ব্রহ্মে লীন হতে আকাঙ্ক্ষী ব্রহ্মবাদীরাও ভক্তসঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণসেবার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভক্তিযোগ বা স্বরূপধর্মে উপনীত হতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি মেয়ে জানাশোনা ছাড়াই হঠাৎ করে কোনো ছেলের প্রেমে পড়ে না। প্রথমে নির্ভরযোগ্য কারো কাছ থেকে ছেলের বিভিন্ন গুণমহিমার কথা শুনে (জ্ঞানযোগ) আকৃষ্ট হয়। তখন সে তার সম্বন্ধে আরো শুনতে চায় (শ্রদ্ধা); ধীরে ধীরে তাকে ভালোবেসে ফেলে (ভক্তি), তাকে পেতে চায় (ভাব)। পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা (অভিধেয় : ভক্তিযোগ) আরম্ভ করে। নিশ্চয়ই ছেলেটিও সব শুনে মেয়ের ভালোবাসায় সাড়া দেয়। এরপর পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ফলে ভালোবাসা ক্রমশ গাঢ় হয় (প্রেম) এবং অবশেষে মেয়েটি ছেলেটিকে লাভ করে। জীবের কৃষ্ণপ্রাপ্তিও এভাবেই ঘটে। গুরুদেব ও সাধু-মহৎগণই কৃষ্ণ সম্বন্ধে জানার নির্ভরযোগ্য যথার্থ মাধ্যম।

বেদের উদ্দেশ্যও তাই– সর্বস্তরের মানুষ যেন ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করে চেতনাকে পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের প্রতি আকৃষ্ট করে তাঁকে লাভ করতে পারে। তবে সাধু-মহাত্মার সঙ্গ ও কৃপা লাভ করে জীব ধারাবাহিক এ জটিল পন্থা ব্যতিরেকেই যেকোনো অবস্থা থেকে স্বধর্মরূপ ভক্তিযোগে উপনীত হতে পারে। এটিই কৃষ্ণভক্তি

লাভের একমাত্র পন্থা। কারণ ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি হওয়ায় স্বরূপশক্তির দূত মহৎগণের কৃপা ছাড়া কোনো সাধনার মাধ্যমে লাভ করা যায় না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন– *মহৎকৃপা বিনা কোনো কর্মে 'ভক্তি' নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥ (চৈ. চ. মধ্য ২২/৩২)* শ্রীল প্রভুপাদও গীতার (৪/২৮) তাৎপর্যে বলেছেন, "কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভক্তিযোগ লাভ করা যায় কেবল ভগবান ও তাঁর শুদ্ধভক্তের কৃপার ফলে।"

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কথা

যারা বিমূঢ়, মায়ামুগ্ধ– সুতরাং দেহসর্বস্ব, কেবল তাদের জন্যই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের কথা বলা হয়েছে। কামীর কামনা ভোগের দ্বারা কোনোদিন প্রশমিত হয় না; বরং ক্লেশের কারণ হয়। তখন সে মুক্তি চায়। তাই মৈত্রেয়ী-শ্রুতিতে বলা হয়েছে, "*বর্ণাশ্রমাচারযুতা বিমূঢ়াঃ কর্মানুসারেণ ফলং লভন্তে। বর্ণাদিধর্মং হি পরিত্যজ্যন্তঃ স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি ॥*" (১/১৩) অর্থাৎ বিমূঢ় লোকেরা বর্ণাশ্রমধর্মের আচরণ করে কর্মফল হিসেবে অর্থ, কাম, স্বর্গাদি লাভ করে থাকে; কিন্তু বর্ণাশ্রমাদিধর্ম পরিত্যাগ করলেই জীব স্বরূপধর্মের অভীষ্ট আনন্দ লাভ করতে পারে। এজন্য ভাগবতের শুরুতেই বলা হয়েছে– '*ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোহত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং*'– ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিকে পরিত্যাগ করো, মুক্তির আশাও পরিত্যাগ করো। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন– "*ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব। অজ্ঞানতমের নাম কৈয়ে কৈতব ॥*" বেদ জুড়ে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সমর্থন করা হলেও এখানে একে অজ্ঞানতম, কৈতব অর্থাৎ প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। তার মধ্যে মুক্তি বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান (শ্রেষ্ঠ প্রতারণা!), যা থেকে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান। মুক্তি লাভ করে ব্রহ্মে লীন হওয়ার চেয়ে তো কর্মবন্ধনে থাকা ভালো। তাহলে ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরতে ঘুরতে গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে ভক্তিলতা বীজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সাধুসঙ্গ লাভ হবে। তখন স্বরূপধর্মে অধিষ্ঠিত হওয়া যাবে, যা জীবের চরম লক্ষ্য, যথার্থ সুখ ও আনন্দ লাভের উপায়।

জীবের পরম ধর্ম কী?

ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্ অর্থাৎ ধর্ম পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং নির্ণয় করেছেন। বিষ্ণুদূতগণ ধর্ম কী– এ প্রশ্ন করলে যমদূতেরা উত্তরে বলেছিল,

বেদপ্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম ॥

(ভা. ৬/১/৪০)

বেদে যা কিছু নির্ধারিত হয়েছে, তাই ধর্ম এবং তার বিপরীতই হচ্ছে অধর্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং তা স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছে। বেদের সারবস্তু কী? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তা প্রতিপন্ন করেছেন : "*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো / বেদান্তকৃত বেদবিদেব চাহম্* ॥ **অর্থাৎ আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবিৎ।"** সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে জানাই বেদের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু বেদ পড়ে যদি কেউ কৃষ্ণকে উপলব্ধি বা গ্রহণ করতে না পারে, তবে বেদের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না।

যাই হোক, শ্রীমদ্ভাগবতই সর্বপ্রমাণ-চূড়ামণি, যেখানে সমস্ত জীবের সাধ্যরূপ পরমধর্ম নিরূপিত হয়েছে–

স বৈ পুংসাং পরোধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

(ভাঃ ১/২/৬)

সকল মানুষের পরম ধর্ম হলো সেই ধর্ম, যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত বস্তু শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ-নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে।
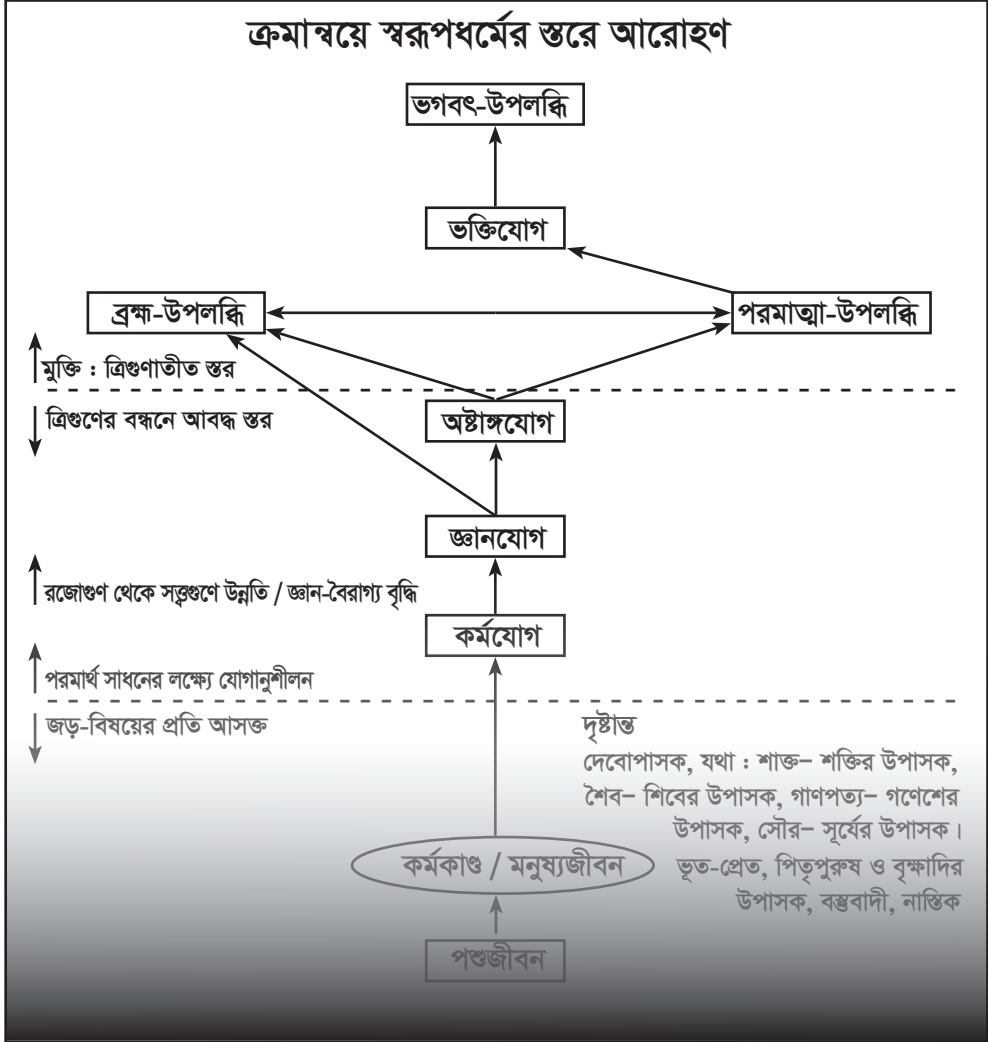
দেহের সুখ ও দুঃখ লাভ হয় বিষয়ের সংস্পর্শে এবং মনের শান্তি লাভ হয় জ্ঞানের সংস্পর্শে। আর দুঃখের কারণ হলো অজ্ঞানতা। মন শান্তি পায় জ্ঞান লাভের মাধ্যমে। কিন্তু আত্মা আনন্দ লাভ করে সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার মাধ্যমে। জগতের মানুষ ধর্ম-কর্ম করে দেহের সুখ এবং মনের শান্তির জন্য। আত্মার আনন্দ লাভের জন্য কেউ ধর্ম পালন করে না। অথচ বিষয়ের সংস্পর্শে যে সুখ লাভ হয়, তা ফোঁড়ায় ফুঁ দিয়ে সামান্য আরাম বোধ করার মতো, মানুষ তাকে সুখ মনে করলেও আসলে সুখ নয়।

ভোগ আর ত্যাগ করা যেমন দেহের ধর্ম, সংকল্প-বিকল্প যেমন মনের ধর্ম, তেমনি প্রেমই জীবাত্মার পরম ধর্ম। কিন্তু কার সাথে প্রেম ? জীবের সাথে মায়ার কিংবা জীবের নয়– কেবল ভগবানের সাথে। তবে জীব জীবকে অবশ্যই ভালোবাসবে তার মধ্যে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জেনে, ভগবানের অংশ চিন্ময় আত্মা বলে। কিন্তু এ জগতের বদ্ধ জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা আসলে দেহকেন্দ্রিক স্বার্থপূরণ ও ভোগের সম্পর্ক। প্রত্যেক সম্পর্কের মধ্যেই স্বার্থপরতা লুকিয়ে থাকে, যা কামের বহিঃপ্রকাশ। কাম ও প্রেমের সঠিক সংজ্ঞা শাস্ত্রে প্রদত্ত হয়েছে–

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

নৈমিষারণ্যে শৌণকাদি ঋষিরা সূত গোস্বামীকে যে ছয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছিলেন, তার মধ্যে শেষেরটি ছিল–

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্মবর্মণি।
স্বাং কাষ্ঠমধুনোপেতে ধর্মঃ কং শরণং গতঃ ॥

(ভা. ১/১/২৩)

অর্থাৎ পরমব্রহ্ম যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি তাঁর নিত্যধামে অন্তর্ধানরূপ অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করলে সনাতন ধর্ম কার শরণাপন্ন হয়েছে ?

উত্তর হলো, সত্য, শৌচ, দয়া, তপ– ধর্মের এ চার স্তম্ভের ওপর ধর্ম দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এ কলিযুগে ধর্ম মাত্র একটি স্তম্ভের ওপর স্থিত এবং আস্তে আস্তে তাও নষ্ট হয়ে যাবে। তখন ধর্ম কেবল ভাগবতের ওপর অবস্থান করবে, যেখানে সর্বতোভাবে ভগবানের নামের মহিমাই কীর্তিত হয়েছে; বলা হয়েছে–

এতবানেব লোকেঽস্মিন পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগে বহবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ (৬/৩/২২)

অর্থ : **ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের মাধ্যমে শুরু হয় যে ভক্তিযোগ, তা-ই মানবকুল তথা জীবের পরমধর্ম।**
শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বলা হয়েছে–

কলিং সভ্যজয়ন্ত্যর্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিণনঃ।
যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ (১১/৫/৩৬)

অর্থ : যথার্থ জ্ঞানবান উন্নত শ্রেণীর মানুষগণ এ কলিযুগের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম। তাই তাঁরা কলিযুগের প্রশংসা করে থাকেন, যেহেতু অধঃপতনের এ যুগেই নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে অনায়াসে জীবনের সমস্ত বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

কলিযুগের ধর্ম হয় নামসংকীর্তন

নাম সংকীর্তনের প্রবর্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে ভাগবতে বলা হয়েছে–

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গোস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ (১১/৫/৩২)

অনুবাদ : কলিযুগে যেসব বুদ্ধিমান মানুষ ভগবৎ-আরাধনার উদ্দেশ্যে সংকীর্তন যজ্ঞানুষ্ঠান করবেন, তাঁরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের নামগানের মাধ্যমে ভগবৎ-অবতারের আরাধনা করবেন। যদিও তাঁর দেহ কৃষ্ণবর্ণ নয়, তবু তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গে পার্ষদরূপে থাকবেন তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও সেবকগণ, নামরূপ অস্ত্র এবং সহযোগীবৃন্দ।

ভাগবতের এ কথাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত করে কলিযুগের প্রারম্ভে মহাবদান্যাবতার, পরমকরুণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং অবতরণ করে জীবের পরম ধর্ম বা পরম প্রয়োজন এবং একইসাথে কৃষ্ণপ্রেম লাভের একমাত্র পন্থা হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করেছেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

কলিকালে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। / কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন ॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার। / নাম হৈতে হয় সর্বজগৎ-নিস্তার ॥

(চৈ. চ. আদি ১৭/২২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্তিত 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, যেহেতু কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণনাম অভিন্ন। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন– *"কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার"*।

শ্রীকলিসন্তরণ উপনিষদের কথা

যদ্দিব্যনামস্মরতাং সংসারো গোষ্পদায়তে।
স্বানন্যভক্তির্ভবতি তৎকৃষ্ণপদমাশ্রয়ে ॥

হরি ওঁ।। দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম কথং ভগবন্ গাং পর্যটন কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মা সাধু পৃষ্টোহস্মি। সর্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভাগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ তন্নাম কিমিতি। স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ– 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ (১) ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে। (২) ইতি ষোড়শকলস্য জীবস্যাবরণবিনাশনম্। ততঃ প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম মেঘাপায়ে রবিরশ্মিমণ্ডলীবেতি। পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্ কোহস্য বিধিরিতি। তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি। সর্বদা শুচিরশুচির্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সরূপতাং সাযুজ্যতামেতি। যদাস্য ষোড়শীকস্য সার্দ্ধত্রিকোটীর্জপতি তদা ব্রহ্মহত্যাং তরতি বীরহত্যাং। স্বর্ণস্তেয়াৎ পূতো ভবতি। পিতৃদেবমনুষ্যাণামপকারাৎ পূতো ভবতি। সর্বধর্মপরিত্যাগপাপাৎ সদ্যঃ শুচিতামাপ্নুয়াৎ। সদ্যো মুচ্যতে সদ্যো মুচ্যতে ইত্যুপনিষৎ। হরিঃ ওঁ তৎ সৎ।। ইতি শ্রীকলিসন্তরণোপনিষৎ সমাপ্তা।

অর্থ : যাঁর দিব্যনাম স্মরণকারীগণের সংসার গোষ্পদতুল্য বোধ হয় এবং অনন্য ভগবৎসেবার প্রতি প্রবৃত্তি হয়, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করি। দ্বাপরের শেষে নারদ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভগবান, পৃথিবী পর্যটন করে কীভাবে কলিসমুদ্রে সাঁতার কাটব?" তদুত্তরে ব্রহ্মা বললেন, "ভালো কথা জিজ্ঞেস করেছো। সকল বেদের রহস্য এই গোপনীয় বিষয় শোনো; যা শুনে তুমি কলি-সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারবে। আদিপুরুষ ভগবান নারায়ণের নামোচ্চারণমাত্রই কলি বিদূরীত হবে।" নারদ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "সেই নাম কী?" হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বললেন– "*'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'* (১) এ ষোলনাম কলিকল্মষ নাশক। সর্ববেদে এর চেয়ে পরতর উপায় দেখা যায় না। (২) এ ষোলনাম ষোলকলা বিশিষ্ট জীবের আবরণ বিনাশক। মেঘের অপনোদনে যেমন সূর্যকিরণ দৃষ্টিগোচর হয়, এ নাম উচ্চারণ করলেও তেমনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নামোচ্চারণকারীর চিন্ময় চোখে প্রকাশিত হন।" পুনরায় নারদ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভগবান, নামগ্রহণের বিধি কীরূপ?" ব্রহ্মা বললেন, "এর কোনো বিধি নেই। সর্বদা শুচি বা অশুচি হয়ে নামোচ্চারণ করলেও ব্রাহ্মণ সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি লাভ করতে পারেন, এ ষোলনাম সাড়ে তিন কোটি বার জপ করলে ব্রহ্মহত্যা ও বীরহত্যাজনিত পাপ থেকে মুক্ত হন, স্বর্ণ অপহরণপাপ থেকে পবিত্র হন, পিতৃপুরুষগণের অপকার থেকে পবিত্র হন এবং সর্বধর্ম পরিত্যাগজনিত পাপ থেকে সদ্য শুচিতা লাভ করেন। সদ্য সদ্যই মুক্ত হন। ইহাই উপনিষৎ।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে–

কলি আগমনে নাথ জীবের দুর্দশা। / দেখি জ্ঞান, কর্ম, যোগ ছাড়িলে ভরসা ॥
অল্প আয়ু, বহু পীড়া, বল-বুদ্ধি-হ্রাস। / এই সব উপদ্রব জীবে কৈল গ্রাস ॥
প্রভু তুমি জীবের মঙ্গল চিন্তা করি। / কলিযুগে নাম-সঙ্গে স্বয়ং অবতরি ॥
যুগধর্ম প্রচারিলে নামসংকীর্তন। / মুখ্যপথে জীব পায় কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
নামের স্মরণ আর নাম-সংকীর্তন। / এই মাত্র ধর্ম জীব করিবে পালন ॥

শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবতের (২/১/১১) তাৎপর্যে বলেছেন :

হে রাজন, মহান আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা সকলের জন্য সিদ্ধি লাভের নিশ্চিত তথা নির্ভীক মার্গ। এমনকি যাঁরা সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন, যাঁরা সবরকম জড়-জাগতিক সুখভোগের প্রতি আসক্ত, এবং যাঁরা দিব্যজ্ঞান লাভ করার ফলে

আত্মতৃপ্ত, সকলের পক্ষে এটিই সিদ্ধিলাভের সর্বোৎকৃষ্ট প্রন্থা। এ শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবানের নাম গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ বিধি কেবল সফলতা সহকারে ভক্তি অনুশীলনের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি যারা জড়বিষয়ে আসক্ত তাদের জন্যও। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতে, সাফল্য লাভের এটিই যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তা কেবল তাঁর সিদ্ধান্ত নয়, পূর্ববর্তী আচার্যগণেরও। তাই আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন নেই। এ পন্থা শুধু বিভিন্ন স্তরের আদর্শবাদীর জন্য নয়, কর্মী, জ্ঞানী অথবা ভক্তরূপে যাঁরা ইতোমধ্যেই সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁদের জন্যও।

জীবের ভগবৎ-উন্মুখতার ক্রম

জীব

নিত্যমুক্ত

অনাদিকাল ধরে স্বরূপশক্তির কৃপা লাভ করে ভগবৎসেবা সুখে নিমগ্ন, কখনোই মায়াগ্রস্ত হননি, তাই মায়া সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। জড় জগতের দুঃখ, শোক, ভয়, ব্যাধি ইত্যাদি সম্বন্ধেও কোনো ধারণা নেই।

নিত্যবদ্ধ

অনাদিকাল ধরে ভগবৎবহির্মুখ হয়ে মায়াগ্রস্ত হয়েছে

১. বিষয়ী

স্বসুখবাসনায় সর্বদা মত্ত

২. ভগবৎ-অবজ্ঞাকারী

ভগবান সম্বন্ধে কোনো ধরনের জ্ঞান না থাকায় তাঁকে অবজ্ঞা করে

বিষয়ীর হৃদয়ে অপরাধের ধূলিলেপ এবং অবজ্ঞাকারীর হৃদয়ে কাদার লেপ বা আবরণ থাকে। দৈবাৎ ভক্তমহতের কৃপা লাভ করে এরা ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হতে পারে। মহতের উপদেশ অনুযায়ী সর্বভূতে আদরপূর্বক কর্মার্পণ করতে করতে হৃদয় থেকে যে পরিমাণে রজস্তমোগুণ দূর হয়, সে পরিমাণে দৈন্যের উদয় হয়ে এদের চোখে অশ্রুর উদ্গম হয়। এর দ্বারাই হৃদয়ের ধূলি ও কাদার আবরণ দূর হয়ে যায় এবং ক্রমশ কর্মাধিকারীর স্তর থেকে শুদ্ধভক্তির স্তরে উঠে ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

৩. ভগবানের প্রতি অরুচিবিশিষ্ট

৪. ভগবৎবিদ্বেষী

এদের হৃদয়ে অপরাধের অশ্মলেপ ও বজ্রলেপ থাকায় এরা মহৎকৃপা পাওয়ার অযোগ্য। তাই এদের ভক্তি লাভের সম্ভাবনা নেই।

নামতত্ত্ব

নাম কী?

আমরা জানি, ধ্বনি বা শব্দের লিখিত বা চিহ্নিত রূপই হলো বর্ণ। ধ্বনি ও বর্ণ অথবা শব্দ ও নাম পরস্পর অভিন্ন। জগতের সমস্ত শব্দকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা : ১. ধন্যাত্মক ও ২. বর্ণাত্মক। বাঁশিসহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র অথবা পশু-পাখির দ্বারা যেসব শব্দ উচ্চারিত হয়, তা ধন্যাত্মক শব্দ। আর মানুষসহ উন্নত প্রাণীসমূহ স্বর ও ব্যঞ্জন-বর্ণের সহযোগে যেসব অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করে, তা বর্ণাত্মক শব্দ। জগতে এর বাইরে কোনো শব্দ নেই। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর মুখ থেকে সাধারণত বর্ণময় শব্দ শোনা যায় না। কখনো কখনো টিয়া, ময়না ইত্যাদি পাখিকেও কিছু কিছু বর্ণময় ধ্বনি উচ্চারণ করতে দেখা যায়, কিন্তু তা তাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ নয়, মানুষের শেখানো বুলি। তাই আমরা নাম বলতে ধন্যাত্মক নয়, বস্তুবাচক বর্ণাত্মক শব্দ-সঙ্কেতকেই বুঝে থাকি।

শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ ভগবৎ-সন্দর্ভে বর্ণনা করেছেন– "*মনোগ্রাহ্যবস্তুনো ব্যবহারার্থং কেনাপি সঙ্কেতিতঃ শব্দো নামেতি।*" অর্থাৎ **মনে উদিত কোনো বস্তু বা প্রকাশ বিশেষকে ব্যক্ত করার জন্য যে বর্ণাত্মক শব্দ সংকেত ব্যবহার করা হয়, তাকে নাম বলে।** নাম দ্বারাই যেকোনো পদার্থ বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়। যেমন কোনো তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে চাইতে গিয়ে যে শব্দ উচ্চারণ করে, তা ঐ বস্তুর নাম– 'জল'। এমন মনোগ্রাহ্য যেকোনো বস্তুকে ব্যক্ত বা প্রকাশ করার জন্য সকল পদার্থেরই বিভিন্ন শব্দসঙ্কেত বা নাম আছে। নাম দ্বারা যে বস্তুকে নির্দেশ করা হয়, তকে বলা হয় নামী। নামী ও নামে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ; অর্থাৎ নামী বা বস্তু বাচ্য এবং এর নাম বাচক বা পদ। নাম বস্তুকে প্রকাশ করে।

নামের প্রকারভেদ :

নাম প্রথমত দুই প্রকার; যথা :

১. আধুনিক নাম– মানুষের দ্বারা নির্বাচিত, স্থান ও কালভেদে পরিবর্তিত হয়, চিরকাল থাকে না।

২. আজানিক বা নিত্য নাম– পরমেশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কোনোকালেই পরিবর্তিত হয় না।

আবার নাম দ্বারা যে বস্তুকে নির্দেশ করা হয়, তার ভিত্তিতে নাম তিন প্রকার; যথা :

১. প্রাকৃত বা জড় বস্তুর নাম : নাম ও নামী পরস্পর ভিন্ন, নামে বস্তুর গুণ ও ক্রিয়া থাকে না।

২. অপ্রাকৃত বা চিন্ময় বস্তুর নাম : নাম ও নামী ভিন্ন হলেও, ঐ চিৎবস্তুকে স্মরণ করে নাম গ্রহণ করলে জীবের শ্রেয়োলাভ হয়।

৩. শক্তিমান বস্তু বা পরমেশ্বরের নাম : নাম ও নামী অভিন্ন। (শক্তিমান ও শক্তিতত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা অবশ্যই স্মরণীয়– শক্তিমানতত্ত্বের নাম ও নামী অভিন্ন, কিন্তু শক্তিতত্ত্বের ক্ষেত্রে নাম নামী থেকে ভিন্ন।)

নামের আবশ্যকতা

ধরুন, কোনো ব্যক্তি যদি এখানে এসে বলে, 'এখানকার এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার', কিন্তু কোন ব্যক্তি তা জানার জন্য আমরা নিশ্চয়ই আগে তার নাম জানতে চাইব। আবার যদি কোনো ব্যক্তি কোনো দোকানে গিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে, "আমি একটি জিনিস কিনতে চাই, আপনার দোকানে তা পাওয়া যাবে কি?"

এমন অদ্ভুত প্রশ্নে নিশ্চয়ই দোকানদার কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে ভর্ৎসনার সুরে বলবেন, "আপনি কী কিনতে চাইছেন, সেটির নাম না বলতে পারলে তো আমি দিতে পারব না।" তার মানে নাম ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। যারা জীববিজ্ঞানের ছাত্র তারা নিশ্চয়ই পড়েছেন, বিভিন্ন দেশের মানুষ যেন বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকে এক নামে চিনতে পারে, সেজন্য বৈজ্ঞানিক নামকরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ICBN ও ICZN প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাস্তব জীবনের সবক্ষেত্রেই যেকোনো বস্তু বা ব্যক্তির নাম ও নামকরণ অত্যন্ত অপরিহার্য।

জড়বস্তুর নাম বস্তু থেকে আলাদা

নাম আর নামী যদি পৃথক বস্তু হয়, তবে নাম কেবল নামীকে নির্দেশ করে; কিন্তু নাম এবং নামী যদি অভিন্ন হয়, তবে নামীর সব গুণ, শক্তি ও ক্রিয়া নামের মধ্যে থাকে। অন্ন, জল, অর্থ, মধু ইত্যাদির নাম কেবল ওইসব বস্তুকেই নির্দেশ করে; কারণ এসব বস্তুর নাম উচ্চারণ মাত্র এসব বস্তুর স্বাদ বা গুণ উপলব্ধি করা যায় না। যদি এসব বস্তুর নামে এদের গুণ থাকতো, তবে জল উচ্চারণ করামাত্র তৃষ্ণা নিবারণ হতো। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, এ জগতের যেকোনো বস্তুর নাম কেবল নামীকে নির্দেশ করে, তাতে বস্তুর কোনো গুণ বা ক্রিয়া থাকে না।

কৃষ্ণনাম ও বদ্ধজীবের নামের মধ্যে পার্থক্য

কৃষ্ণ বিভুচৈতন্য হওয়ায় তাঁর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাঁর চিন্ময়স্বরূপ থেকে আলাদা নয়, সবই এক এবং অভিন্ন। জীব অণুচৈতন্য, তাই শুদ্ধাবস্থায় তার নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম তার চিৎস্বরূপ থেকে স্বভাবত অপৃথক। কিন্তু বদ্ধজীব অচিৎ-জগতে এসে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে পৃথক নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম লাভ করেছে। এটিই তার বিড়ম্বনা। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের কৃপার সংস্পর্শে তার আর সেই রূপ থাকবে না। শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে–

নাম-রূপ-গুণ-লীলা অভিন্ন উদয়। / অচিৎ সম্পর্কে বদ্ধ জীবে ভিন্ন হয় ॥
শুদ্ধ জীবে নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া এক। / জড়াশ্রিত দেহে ভেদ এই সে বিবেক ॥
কৃষ্ণে নাহি জড় গন্ধ অতএব তাঁয়। / নাম-রূপ-গুণ-লীলা একতত্ত্ব হয় ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন– "জড়ের হেয়ত্বই জড়ের দোষ, কিন্তু চিৎ-তত্ত্বে সেই দোষমুক্ত বৈচিত্র্য আছে। কৃষ্ণের আত্মা ও দেহ পরস্পর অভিন্ন। কিন্তু জড়বদ্ধ জীবের দেহ ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন। চিৎস্বরূপে দেহ-দেহী, অঙ্গ-অঙ্গী, ধর্ম-ধর্মীর মধ্যে কোনো ভেদ নেই। কিন্তু জড়বদ্ধ জীবে তা থাকে। কৃষ্ণ অঙ্গী হলেও তাঁর প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণকৃষ্ণ, সমস্ত চিৎবৃত্তি তাঁর সমস্ত অঙ্গে বর্তমান। তাই তিনি অখণ্ড পূর্ণ চিৎতত্ত্ব। কৃষ্ণ ও জীবাত্মা উভয়ই চিৎস্বরূপ, একারণে এক; কিন্তু ভেদ হলো, সমস্ত চিৎগুণসমূহ জীবাত্মায় অণুরূপে, শ্রীকৃষ্ণে বিভুরূপে বর্তমান। জীব শুদ্ধচিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হলে চিৎগুণসমূহ তার মধ্যে অণুরূপে প্রকাশ পাবে।" (প্রবন্ধাবলি)

কৃষ্ণনামের স্বরূপ

বস্তুমাত্রই নাম, রূপ, গুণ ও কর্মের দ্বারা পরিচিত। এ চারটি পরিচয় ছাড়া বস্তু হতে পারে না। ব্রহ্ম নির্বিশেষ বলে তা বস্তু নয়, ভগবত্তত্ত্বের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় মাত্র। কৃষ্ণই একমাত্র পরম বস্তু; অনন্তবৈভবযুক্ত এক অদ্বয়তত্ত্ব। তিনি নাম-রূপ-গুণ-লীলাময়। বিভুচৈতন্য হওয়ায় তাঁর রূপ, গুণ ও লীলা তাঁর চিন্ময়স্বরূপ থেকে অভিন্ন। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কোনোটিকেই কোনোটা থেকে পৃথক করা যায় না। সুতরাং কৃষ্ণনামের স্বরূপ বলতে রূপ, গুণ ও লীলাসহ স্বয়ং কৃষ্ণের স্বরূপকেই বুঝতে হবে। হরিনামের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে–

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, অনাদি, চিন্ময়। / যেই কৃষ্ণ সেই নাম, এক তত্ত্ব হয় ॥
চৈতন্যবিগ্রহ নাম নিত্যমুক্ততত্ত্ব। / নাম নামী ভিন্ন নয়, নিত্য শুদ্ধসত্ত্ব ॥
এ- জড়-জগতে তাঁর অক্ষর আকার। / রসরূপে রসিকেতে সত্ত্ব-অবতার ॥
কৃষ্ণ বস্তু হয় চারি ধর্মে পরিচিত। / নাম, রূপ, গুণ, কর্ম, অনাদি বিহিত ॥

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ (১৭/১৩৪)

শ্রীকৃষ্ণের নাম অপ্রাকৃত-চিন্ময় ও স্বপ্রকাশ হওয়ায় তা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন বা অনুভব করা সম্ভব নয়। তাই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর তাৎপর্যে বার বার বলেছেন যে, কৃষ্ণের নাম এবং পরিকরাদি সবই পরাশক্তির অন্তর্গত এবং জড়া শক্তির সাথে সম্পর্করহিত, এজন্য এ হরিনাম সংকীর্তনই চিন্ময় জ্ঞান লাভের সরলতম পন্থা। শ্রীল প্রভুপাদের এ কথার সূত্র ধরে গরুড় পুরাণের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়–

যদিচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানদ্ যৎ পরমং পদম্।
তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্তনম্ ॥ (১৯)

অর্থ : হে রাজন, যদি পরম জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান লাভ করে পরম পদ লাভ করার ইচ্ছা হয়, তবে আদরের সাথে গোবিন্দ নাম কীর্তন করুন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর জৈবধর্ম গ্রন্থে বলেছেন– "কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বরূপের মধ্যে কোনো পরিচয় ভেদ নেই; কেবল একটি রহস্য আছে। তা হলো, স্বরূপ অপেক্ষা নাম অধিক কৃপা করেন। স্বরূপের প্রতি যে অপরাধ হয়, তা স্বরূপ কখনোই ক্ষমা করেন না; কিন্তু সে অপরাধসহ নিজের প্রতি অপরাধও কৃষ্ণনাম কৃপা করে ক্ষমা করেন।"

নামাক্ষর কীভাবে অপ্রাকৃত হতে পারে?

হরিনামের জন্ম জড়জগতে হয়নি। "*গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন*"। চিৎকণাস্বরূপ জীব শুদ্ধস্বরূপে স্থিত হয়ে তার চিন্ময় শরীরে হরিনাম উচ্চারণের অধিকারী হয়; জড়জগতে বদ্ধ হয়ে জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনাম উচ্চারণ করতে পারে না। কিন্তু হ্লাদিনীর কৃপায় যখন তার নিজের স্বরূপের ক্রিয়া হয়; তখনই তার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে চিত্তে কৃপাপূর্বক শুদ্ধনাম অবতীর্ণ হয়ে ভক্তের ভক্তিপূত-জিহ্বায় নৃত্য করার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হয়, এটাই নামের রহস্য।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের অর্থ

কৃষ্ণ শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত; যথা : 'কৃষ্' এবং 'ণ'। 'কৃষ্' অর্থ সর্বাকর্ষক এবং 'ণ' অর্থ দিব্যানন্দ। নিরুক্তি অভিধানে বলা হয়েছে, 'কৃষ্' শব্দের অর্থ আকর্ষণ করা এবং 'ণ' শব্দের অর্থ নাশ করা। সুতরাং কৃষ্ণ অর্থ যিনি বদ্ধ জীবের জড়-বন্ধন নাশ করে নিজের প্রতি তাদের আকর্ষণ করেন। 'রাম' অর্থ পরমানন্দদায়ক। 'হরে' শব্দটি শ্রীহরির সম্বোধন পদ; শ্রীকৃষ্ণের অপর নামই শ্রীহরি। হরি শব্দের অর্থ যিনি মুক্তি প্রদান করেন। আবার শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তি রাধারাণীর আরেক নাম 'হরা' এবং এর সম্বোধন পদ 'হরে'। এজন্য 'হরে' শব্দের দ্বারা শ্রীহরি ও শ্রীমতি রাধারাণী উভয়কেই বোঝায়। তাই এ মহামন্ত্র দ্বারা এমন প্রার্থনা নির্দেশ করে : "হে হরা (রাধারাণী), হে সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ, হে পরমানন্দদায়ক রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ, দয়া করে আমাকে আপনাদের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত করুন।"

হরিনামই রাধাকৃষ্ণ

'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র 'হরে', 'কৃষ্ণ' ও 'রাম' এ তিন নামের সমষ্টি। এ নামগুলো সম্বোধনাত্মক আর রসিক ভক্তগণের মতে ব্রজেন্দ্রনন্দনবাচক। এ প্রসঙ্গে শ্রীমৎ গোপালগুরু গোস্বামী বলেছেন, "সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের ত্রিতাপক্লেশ হরণ করেন অথবা দিব্য সদ্‌গুণাদির দ্বারা সমস্ত বিশ্বের মন হরণ করেন অথবা নিজের কোটিকন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য ও মাধুরীর দ্বারা সমস্ত অবতার আদির মন হরণ করেন বলে শ্রীকৃষ্ণের নাম হরি। আর হরি শব্দের সম্বোধনই হরে।

কৃষ্ণ শব্দ নন্দনন্দনবাচক, ব্রহ্মসংহিতায় সেকথাই বলা হয়েছে–

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দসর্বকারণকারণং ॥
আনন্দৈকসুখস্যামী শ্যামঃকমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্যতে ॥

শ্রীগৌরসুন্দরও তা-ই বলেছেন, "*কৃষ্ণনামের বহু অর্থ নাহি মানি। শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি ॥*" আর কৃষ্ণ শব্দের সম্বোধনে কৃষ্ণ। রাম শব্দও নন্দনন্দনবাচক। যথা : শ্রীমৎ গোপালগুরু গোস্বামী উদ্ধৃত পুরাণবাক্য–

"*শ্রীরাধিকায়াশ্চিত্তমাকৃষ্য রমতি ক্রীড়তি ইতি রামঃ। রাম-শব্দস্য সম্বোধনে রাম।*"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এর অর্থ করেছেন– বৈদগ্ধিসারসর্বস্ব মূর্তি লীলেশ্বর। শ্রীরাধারমণ রাম নাম অতঃপর ॥ আর রাম শব্দের সম্বোধনপদ রাম। মধুররসিক ভক্তগণ 'হরে' শব্দটিকে 'হরা' শব্দের সম্বোধনে ব্যবহার করেন, যথা :

স্বরূপপ্রেমবাৎসল্যৈর্হরের্হরতি যা মনঃ।
হরা সা কথ্যতে সদ্ভিঃ শ্রীরাধা বৃষভানুযা ॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিনী।
অতো হরেত্যনেনৈব রাধেতি পরিকীর্তিতা ॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

অর্থ : শ্রীবৃষভানুনন্দিনী স্বরূপপ্রেম ও বাৎসল্যে শ্রীহরির মন হরণ করেন, এজন্য তাঁর নাম হরা এবং কৃষ্ণের আহ্লাদস্বরূপিনী শ্রীরাধা কৃষ্ণের মন হরণ করেন বলেও তাঁর নাম হরা। হরা শব্দের সম্বোধনে হরে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভজনরহস্যে লিখেছেন–

কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিনী শ্রীরাধা আমার। / কৃষ্ণ মন হরে তাই হরা নাম তাঁর ॥
রাধাকৃষ্ণ শব্দে শ্রীসচ্চিদানন্দরূপ। / হরেকৃষ্ণ শব্দ রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ ॥
আনন্দস্বরূপ রাধা তাঁর নিত্যস্বামী। / কমললোচন শ্যাম রাধানন্দকামী ॥
গোকুল আনন্দ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। / রাধাসঙ্গে সুখাস্বাদন সর্বদা সতৃষ্ণ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞেস করেন, "*উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান?*" উত্তরে রায় বলেন, "*শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণনাম ॥*" সুতরাং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম হওয়ায় এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপাস্য আর নেই।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের নিম্নরূপ অর্থ করা হয়েছে–

হরে : হে শ্রীমতি রাধে, কৃপাপূর্বক আমার মনকে আকৃষ্ট করে আমার ভববন্ধন মোচন করুন।
কৃষ্ণ : হে কৃষ্ণ, কৃপাপূর্বক আমার মনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করুন।
হরে : হে রাধে, আপনার অতুলনীয় মধুরিমার দ্বারা আমার চিত্তকে বিমুগ্ধ করুন।
কৃষ্ণ : হে কৃষ্ণ, আপনার শুদ্ধভক্তকৃত নামভজনের স্পর্শ দান করে আমার চিত্তকে শোধন করুন।
কৃষ্ণ : হে কৃষ্ণ, আপনার চিন্ময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্মরণের জন্য আমাকে অবিচল নিষ্ঠা প্রদান করুন।
কৃষ্ণ : হে কৃষ্ণ, কৃপা করুন আমি যেন আপনার সেবায় রুচি লাভ করতে পারি।
হরে : হে রাধে, অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক আমাকে আপনার সেবার যোগ্য করে তুলুন।
হরে : হে রাধে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা আস্বাদনের জন্য আমাকে যোগ্য করে তুলুন।
হরে : হে রাধে, কীভাবে আমি আপনার সেবা করতে পারব, আমাকে তার শিক্ষা দান করুন।
রাম : হে কৃষ্ণ, অনুগ্রহ করে আপনার এবং আপনার প্রিয়তমা রাধিকার অন্তরঙ্গ লীলাকথা আমাকে শ্রবণ করার অধিকার দিন।

হরে : হে রাধিকা, আপনার প্রেমাস্পদ মাধবের সাথে আপনার লীলাসমূহ আমার হৃদয়ে প্রদর্শন করুন।
রাম : হে কৃষ্ণ, কৃপাপূর্বক আপনার সাথে আপনার প্রিয়তমা রাধিকার লীলাসমূহ আমার হৃদয়ে প্রকাশ করুন।
রাম : হে কৃষ্ণ, অনুগ্রহ করে আপনার সচ্চিদানন্দঘন মধুর নাম-রূপ-গুণ ও লীলা স্মরণে আমাকে নিযুক্ত করুন।
রাম : হে কৃষ্ণ, কৃপা করে আমাকে আপনার সেবার যোগ্য করে নিন।
হরে : হে রাধিকে, আপনার একজন সেবিকারূপে গ্রহণ করে আমাকে আপনার ইচ্ছামতো নিয়োগ করুন।
হরে : হে শ্রীমতি রাধারাণী আমি আপনার কৃপা প্রার্থনা করছি।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত হরিনামের অর্থ

শ্রীল প্রভুপাদ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের বিভিন্ন অর্থ করেছেন, নিম্নে তা ক্রমান্বয়ে লেখা হলো :

১। শ্রীকৃষ্ণের শব্দবিগ্রহ, শব্দাবতার।
২। শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যক্ষ পন্থা।
৩। সবকিছুর প্রকাশকারী।
৪। চিন্ময়ী হ্লাদিনীশক্তির কাছে সেবা লাভের জন্য প্রার্থনা।
৫। আদিপুরুষ ও আদিপ্রকৃতি।
৬। নিত্যপ্রভুর কাছে নিত্যদাসের পরিত্রাণ ও সেবা লাভের জন্য প্রার্থনা।
৭। হে কৃষ্ণ, অনুগ্রহ করে আমাকে গ্রহণ করো।
৮। জন্ম-জন্মান্তরে সেবা লাভের প্রার্থনা।
৯। কামনা– কেবল সেবা লাভের জন্য।

* "এ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের অর্থ হলো, তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করা। যদি তুমি অপরাধশূন্য হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে থাক, তবে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করবে।" প্রভুপাদ পত্রাবলি, ২২/১০/৭২)

* "এ দিব্যধ্বনি উচ্চারণের ফলে জড় ও চিন্ময় সমস্ত বিষয়ের অর্থ প্রকাশিত হবে। কারণ তা পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন।" (ভা. তাৎপর্য, ৪/২৪/৪০)

শ্রীল প্রভুপাদ বার বার উল্লেখ করেছেন– "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের অর্থ কেবল রাধা ও কৃষ্ণ; (রাম অর্থ অযোদ্ধার রাম নন, রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণই)" এর অর্থ : * "হে কৃষ্ণ, হে রাধারাণী, কৃপাপূর্বক আমাকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করো, যাতে আমি মায়ার সেবা করা থেকে মুক্ত হতে পারি।" (প্রভুপাদ পত্রাবলি, ৭/৮/৬৯)
আরো সরাসরি বললে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের অর্থ * *রাধাদাস্যম*– শ্রীমতি রাধারাণীর দাসত্ব বরণ করা। কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করার জন্য শ্রীমতি রাধারাণীর কাছে প্রার্থনা করা।

ভগবানের নাম ভগবান থেকে অভিন্ন

ভগবানের নাম জড় বস্তুর নামের মতো শুধু নামীর নির্দেশক নয়, এতে নামীর সমস্ত গুণ ও শক্তি বিদ্যমান। এজন্যই চিনি বা গুড় উচ্চারণ করলে আমরা এর মিষ্টতা অনুভব করি না, কিন্তু ভগবানের নাম উচ্চারণ করার ফলে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ হওয়া যায়, মুক্তিলাভ করা যায় এবং শুদ্ধভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম

লাভ হয়। ভগবানের নাম ভগবানের মতোই চিন্ময়– "*নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ*।" শ্রীল প্রভুপাদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> কৃষ্ণের দেহ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর সবই চিন্ময় এবং কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন (সচ্চিদানন্দবিগ্রহ)। যতদিন জীব প্রকৃতির তিন গুণ এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ আদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে, ততদিন চিন্ময় জ্ঞান ও চিন্ময় আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে না। এজন্য কেবল শুদ্ধভক্তের কাছেই তা প্রকাশিত হয়। জড় জগতের যেকোনো বস্তুর নাম, রূপ ও গুণ পরস্পর ভিন্ন। এখানে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। কিন্তু আমরা যখন কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত হব তখন দেখব, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরের মধ্যে জড় বস্তুর মতো কোনো ভিন্নতা নেই।

আবার, ভগবান সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময় হরি। তিনি ইচ্ছামাত্র যেকোনো কিছু করতে সক্ষম, তাই তিনি চাইলে তাঁর নামে তাঁর সমস্ত শক্তি অবশ্যই প্রদান করতে পারেন, না পারলে সর্বশক্তিমান হবেন কীভাবে? ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তা স্বীকার করেছেন– *নাম্নামকারী বহুধা নিজসর্বশক্তি স্তত্রার্পিতা*। ভগবান তাঁর নামে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। আবার শাস্ত্রে বলা হয়েছে– "*সর্বং খলিদ্বং ব্রহ্ম*।" অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তবে কি তিনি তাঁর নামে থাকতে পারেন না?

অর্পণ বা অনুমোদনের শক্তি

কাগজের মুদ্রা এক টুকরা কাগজ হলেও এর একটা নির্দিষ্ট মূল্যমান আছে। কারণ সরকার নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করে সেই কাগজকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মানুষ টাকার পেছনে ছোটে এর মূল্য আছে বলেই। সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে বলেই টাকার মূল্য। শুধু তাই নয়, অনুমোদনের জন্যই কাগজের চেক নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার মূল্য ধারণ করতে পারে এবং যে কোনো সময় তা তোলাও যায়। স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়ে কোনো ব্যক্তি তার সমস্ত সহায়-সম্পদ কাউকে দান করতে পারেন। স্বাক্ষর বা নামের মাধ্যমে তা তার মৃত্যুর পরও কার্যকর থাকে। ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেও অনুমোদন বা অর্পণের দ্বারা তার সমস্ত শক্তি বা ক্ষমতার ব্যবহার হতে পারে। সুতরাং ভগবান যদি চান, তবে কি তিনি তাঁর নামে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করতে পারেন না? তদুপরি, ভগবান সমস্ত শক্তি, গুণ ও চিন্ময় বৈচিত্র্যের আধার এবং সম্পূর্ণ চিন্ময় হওয়ায় তাঁর নাম তাঁর থেকে সর্বদা অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে।

তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কে অগ্রপূজ্য হবেন– এ নিয়ে একবার দেবতাদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। ব্রহ্মা তখন দেবতাদের সকলকে ডেকে বলেন, "যিনি এ ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করে সবার আগে আমার কাছে আসতে পারবেন, তিনিই হবেন অগ্রপূজ্য।" ব্রহ্মার আজ্ঞা পেয়ে দেবতাগণ সবাই নিজ নিজ বাহনে চড়ে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন। গণেশের দেহ স্থূল, বাহনও ছোট্ট একটি ইঁদুর। তাই তিনি সবার শেষে বিষন্ন মনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন। হঠাৎ দেবর্ষি নারদের সঙ্গে তাঁর দেখা। দেবর্ষি বললেন, "ঠাকুর, আপনি এত ব্যস্ত হয়ে আজ কোথায় চলেছেন?" গণেশ বললেন, "দেবর্ষে, আপনি কি কিছুই শোনেননি? আজই ব্রহ্মাজি আদেশ দিয়েছেন, দেবগণের মধ্যে যিনি সর্বাগ্রে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করে তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারবেন, তিনি দেবতাদের মধ্যে অগ্রপূজ্য হবেন। আমার দেহটাও মোটা, বাহনটিও ছোট্ট একটা ইঁদুর, তাই আমিই সবার শেষে পড়ে গেলাম।" দেবর্ষি বললেন, "গণেশ ঠাকুর, আপনি কি অগ্রপূজ্য হতে চান?" গণেশ বললেন, "বলুন দেখি, এমন মর্যাদা কে না চায়!" দেবর্ষি বললেন, "তবে আসুন আমার সাথে।" দেবর্ষি গণেশকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনি ব্রহ্মার সামনে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে তাকে সাতবার পরিক্রমা করে বসে থাকবেন, তারপর যা করার আমি করব।" গণেশজি তাই করলেন। দেবতাগণ ধীরে ধীরে সবাই এলেন। ব্রহ্মা সবার সামনে ঘোষণা করবেন কে অগ্রপূজ্য; এমন সময় দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সামনে গিয়ে বললেন, "হে পিতা, আপনি স্বয়ং বেদবক্তা, আপনি শাস্ত্রের মর্ম জানেন। আপনি জানেন,

ভগবানের নাম এবং ভগবান অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নামে শ্রীকৃষ্ণের সকল ঐশ্বর্য নিত্য বিরাজমান। আপনার সামনে গণেশজি শ্রীকৃষ্ণের নামকে সাতবার পরিক্রমা করেছেন। ভগবানের লোমকূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং অন্যান্য দেবতাগণ একটি ব্রহ্মাণ্ডকে একবার পরিক্রমা করেছেন, আর গণেশ সবার আগে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আধার যিনি তাঁকে সাতবার পরিক্রমা করেছেন। ব্রহ্মাজি তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিলেন এবং গণেশই যে অগ্রপূজ্য হওয়ার অধিকারী, তা ঘোষণা করলেন।

ভগবান ও ভগবানের নামে অভিন্নতা প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয় প্রমাণ

শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে পদ্মপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন–

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণের নাম চিন্তামণিবিশেষ, তা চৈতন্যরসেরবিগ্রহস্বরূপ। তা পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক বস্তুর মতো আবদ্ধ ও খণ্ড নয়; তা শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া মিশ্র নয়। তা নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্বদা চিন্ময়, কখনো জড় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না । যেহেতু নাম ও নামীর স্বরূপে কোনো ভেদ নেই ।

ব্রহ্ম ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ এবং তার নাম ওঁ। যোগসূত্রে বলা হয়েছে, "*তস্য বাচক প্রণব*" অর্থাৎ ওঁকার ব্রহ্মবাচক নাম। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে-"ওঁমিতি ব্রহ্ম"– ওঁকার কেবল ব্রহ্মের নাম তা নয়, তা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। এখানেও নাম নামী অভেদ। এ ওঁ-এর পরিপূর্ণ রূপই কৃষ্ণনাম। যেমন দূর থেকে প্রথমে কোনো জনকোলাহলের নির্বিশেষ ধ্বনি শোনা যায়, যত কাছে আসে, ততই তা আরো স্পষ্ট শোনা যায়, তেমনি নির্বিশেষ প্রণবধ্বনি অতিক্রম করে সচ্চিদানন্দ নামতত্ত্বের যত নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই সবিশেষ রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ, মধুসূদন নাম সুস্পষ্ট হয়। অর্থাৎ ওঁকার এ সবিশেষ নামসমূহের নির্বিশেষ প্রকাশ। নারদমুনির দ্বারকা অবতরণের সময়ও আমরা দেখতে পাই যে, যখন তিনি আকাশমার্গ থেকে দ্বারকায় অবতরণ করছিলেন, তখন দ্বারকাবাসীগণ প্রথমে একটি জ্যোতির্ময় আলো দেখতে পেলেন, নারদমুনি ক্রমশ নিকটবর্তী হলে তাঁরা তাঁকে একটি শরীরধারী প্রাণী বলে মনে করলেন, ক্রমেই আরো নিকটবর্তী হলে তাঁরা তাঁকে পুরুষ বলে মনে করলেন এবং অবশেষে তাঁকে নারদমুনি বলে চিনতে পারলেন। ঠিক তেমনি ভগবানের ব্রহ্মস্বরূপের নির্দেশক এই ওঁকারও চরমে ভগবানের সবিশেষ নামেই পর্যবসিত হয়। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ ভগবৎসন্দর্ভে বলেছেন–

নামৈব চিন্তামণিঃ সর্বার্থদাতৃত্বাৎ।
ন কেবলং তাদৃশমেব, অপি তু চৈতন্যাদিলক্ষণো
যঃ কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ। তত্র হেতুভিন্নত্বাদিতীতি ॥

অর্থাৎ নামই চিন্তামণি; যেহেতু নাম সমস্ত অভীষ্ট প্রদান করতে সমর্থ। নাম যে কেবল অভীষ্ট প্রদানে সমর্থ তা নয়। চৈতন্যাদিলক্ষণ যে কৃষ্ণ সেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই কৃষ্ণনাম।

নাম নামীর অভিন্নত্ব প্রসঙ্গে যেসব বিষয় আলোচনা করা হলো, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ তার সারমর্ম শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করেছেন–

দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম– নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ ॥

অর্থাৎ ভগবানের ক্ষেত্রে দেহ ও দেহীতে যেমন ভেদ নেই; তেমনি নাম ও নামীতেও কোনো ভেদ নেই; কিন্তু জীবের ক্ষেত্রে দেহ, দেহী ও নাম পরস্পর ভিন্ন।

বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা যায়, হতে পারে কোনো ব্যক্তির নাম অমরেন্দ্র, কিন্তু বিচার করতে হবে দেহের সাথে তার নামের সম্বন্ধ কীরূপ? তার স্বরূপের সাথে তার দেহের ও নামের কী সম্বন্ধ? সে জীব, তার স্বরূপ সে অণুচৈতন্য। সে এ দেহে মাত্র কিছুদিন থাকবে তারপর দেহ বিনষ্ট হবে এবং সে অন্য এক দেহ ধারণ করবে। তার দেহ জড়, কিন্তু তার স্বরূপ চেতন বা চিন্ময়। তার স্বরূপ তো চিরকাল থাকবে, আর দেহ নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং নশ্বর। আবার তার নামের সাথেও তার স্বরূপের কোনো সম্পর্ক থাকে না। প্রত্যেক জন্মেই তার আলাদা আলাদা নাম হয়। জন্মের পর পিতামাতা স্বরূপ বিবেচনা করে নাম রাখেন না। অমরেন্দ্র নামটিও তার স্বরূপ বিবেচনা করে রাখা হয়নি। অমরেন্দ্র নামের অর্থ অমর বা দেবদেহ বোঝায় বা স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে বোঝায়। কিন্তু সে তো স্বর্গের রাজা ইন্দ্রও নয়, অমরও নয়। জড় জগতের সবার নামই তো এমন খেয়াল-খুশিমত রাখা। তাই এ জড় জগতের কারো নামের সাথে তার স্বরূপের কোনো সম্বন্ধই থাকে না। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, জড় জগতে আবদ্ধ জীবের ক্ষেত্রে দেহ, দেহী ও নাম পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু কৃষ্ণের নাম এবং কৃষ্ণ অভিন্ন। তাঁর দেহ এবং তিনি অভিন্ন। জীবাত্মা চেতন হলেও তার দেহ পঞ্চভূত নির্মিত জড়বস্তু মাত্র।

ঈশ্বরে নাহিক কভু দেহদেহী ভেদ।
স্বরূপ-দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥

ভগবানের নাম আমাদের নামের মতো কেবল কিছু বর্ণের সমষ্টি নয়, তাঁর নাম তাঁর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, রূপ, গুণ ও লীলার অর্থ প্রকাশক। যেমন 'কৃষ্ণ' নামের অর্থ সর্বাকর্ষক, 'রাম' নামের অর্থ পরমানন্দদায়ক প্রকাশ করে। প্রত্যেক নামই ভগবানের বিশেষ বিশেষ মহিমার প্রকাশক। তাই বলা হয়ে থাকে–

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥

শ্রীল প্রভুপাদ বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়েছেন :

> কৃষ্ণের শরীর এবং আত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কৃষ্ণ একইসাথে শরীর ও আত্মা উভয়ই। দেহ ও আত্মার পার্থক্য কেবল বদ্ধ জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বদ্ধ জীবের দেহ তার আত্মা থেকে ভিন্ন; আবার তার নাম তার দেহ থেকে ভিন্ন। যেমন : হতে পারে কারো নাম মি. জন। আমরা জন, জন বলে যতোই ডাকাডাকি করি না কেন যদি সে কাছে না থাকে, তবে কখনোই সে সাথে সাথে উপস্থিত হতে পারবে না। কিন্তু যদি আমরা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করি, তবে কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আমাদের জিহ্বায় উপস্থিত হন। পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "*মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ*" অর্থাৎ হে নারদ, যেখানে আমার ভক্তরা আমার নাম কীর্তন করেন, আমি সেখানেই অবস্থান করি। তাই ভক্তগণ যখন ***'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'*** কীর্তন করেন, তখন সেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকেন।

সাধ্য ও সাধন হওয়ায় হরিনাম নামীর চেয়েও করুণাময়

নাম এবং নামী এক বস্তু হলেও নামের করুণা নামীর চেয়েও অধিক। বৃহদ্ভাগবতামৃতে গোপকুমারের প্রতি বৈকুণ্ঠপার্ষদগণের উক্তি–

শ্রীনামপ্রভোস্তস্য শ্রীমূর্তেরপ্যতি প্রিয়ং।
জগদ্ধিতং সুখোপস্যাং সরসং তৎসমং নহি ॥

অর্থাৎ নারায়ণের মূর্তি অপেক্ষাও নামপ্রভু অধিক প্রিয়; জগতের জন্য মঙ্গলজনক; সুখের উপাস্য ও সরস; অতএব হরিনামের সমান আর কিছু নেই।

শ্রীনাম অধিকার অনধিকার বিচার না করে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেকোনোভাবে সেবিত হয়েই সকলের উপকার করে

থাকেন। শ্রীনাম সুখোপাস্য অর্থাৎ জিহ্বাগ্র স্পন্দন মাত্রই সেবিত হয়ে থাকেন। কিন্তু ভগাবন স্বয়ং বা তাঁর শ্রীবিগ্রহ অর্চন করার জন্য অধিকার ও বিধির প্রশ্ন আসে। স্বয়ং ভগবান এবং তাঁর নাম এক হলেও ভগবান তাঁর নামস্বরূপে অধিক কৃপা প্রকট করেছেন। কারণ নামী কেবল সাধ্য, কিন্তু নাম সাধ্য ও সাধন উভয়ই।

উপমা

উকিল ও বিচারক পৃথক ব্যক্তি হলে মামলায় জেতার জন্য ভালো উকিলের তত্ত্বাবধানে মামলা তদবির করলেও বিচারকের রায়ের অপেক্ষায় থাকতে হয়। জয় লাভের ক্ষেত্রে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু উকিল ও বিচারক যদি একই ব্যক্তি হন (যদিও এ জগতে প্রায় অসম্ভব), অর্থাৎ আজকে যিনি উকিল হয়ে পক্ষ অবলম্বনপূর্বক মামলায় জেতার উপায় উপদেশ করলেন, তিনিই যদি কাল বিচারকের আসনে বসে বিচার করেন, তবে জয়লাভের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। একেবারে বুক ঠুকে বলা যায় যে, জয় নিশ্চিত। সাধন হিসেবে হরিনামও ঠিক এমনই– উকিলও আবার বিচারকও বটে। একাধারে সাধ্য ও সাধন উভয়ই। হরিনাম সাধনের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, আবার সাধ্যের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। যাঁরা হরিনাম সাধন করছেন, তাঁদের হরিপ্রাপ্তির কোনোই সন্দেহ নেই, আর যাঁদের হরিপ্রাপ্তি হয়েছে, তাঁদের হরিনামই হরি।

হরিনাম সাধ্য ও সাধন উভয়ই

বাঞ্ছিত প্রয়োজনীয় বস্তুই সাধ্য। সেই সাধ্যবস্তু বা প্রয়োজন লাভের জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয়, তা-ই সাধন। যেমন কেউ যদি বাড়ি বানাতে চায়, তবে বাড়ি বানানো তার প্রয়োজন বা সাধ্য আর বাড়ি বানানোর জন্য যা যা করতে হবে তা সাধন। সাধ্য ভিন্ন হলে সাধনও ভিন্ন হয়। স্বর্গলাভ সাধ্য হলে পুণ্যকর্ম তার সাধন, মোক্ষলাভ সাধ্য হলে জ্ঞান তার সাধন। পরমাত্মার দর্শনলাভ সাধ্য হলে যোগ তার সাধন। অর্থাৎ সবক্ষেত্রেই সাধ্য ও সাধন পৃথক বস্তু। কোনো ক্ষেত্রেই সাধ্য ও সাধন এক বস্তু নয় এবং সাধ্যবস্তু প্রাপ্ত হলে আর সাধনার প্রয়োজন হয় না। যেমন কেউ কর্মের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করলে তার আর কর্ম করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু হরিনাম সাধকের সিদ্ধ ও সাধন উভয় অবস্থার জন্যই প্রযোজ্য।

জীব কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয়ে সিদ্ধি লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত নামীর স্বরূপকে দেখতে পায় না, এমনকি সাধনকালেও তাঁর দর্শন লাভ হয় না। কিন্তু নাম সর্বদা জীবের জন্য অত্যন্ত সুলভ এবং সর্বাবস্থায় জীবের পরম বন্ধু। এ নাম জীবের সাধনাবস্থায় সাধিত হয়ে সর্বদা জীবের সঙ্গে থাকেন, আর সিদ্ধাবস্থায় সাধ্য হয়ে থাকবেন। অর্থাৎ নাম সাধন ও সাধ্যরূপে সর্বদাই সাধকের সঙ্গে আছেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, নামই সাধ্য এবং নামই সাধন। একটি কাহিনীর মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো–

সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপাড়ে স্বর্ণপুরীতে ছিলো এক রাজার কুমার। আর এ পাড়ের এক তালবনে তালপাতার ঘরে থাকতো এক সুন্দরী তরুণী। খেলার বয়স ছাড়িয়ে উঠতেই সাত সাগরের ওপাড়ের রাজকুমারের সাথে তার বিয়ে হয়েছিলো শৈশবেই। তারপর এ পর্যন্ত আর স্বামীর সাথে তার দেখা হয়নি। স্বামীর দর্শন লাভের ব্যকুলতায় সে কেবল পথ চেয়ে বসে থাকে, কবে তার স্বামী তার এ বিরহদশা থেকে তাকে মুক্তি দান করবেন। একদিন প্রভাতে সে যখন তার বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো, তখন দেখলো এক রাজদূত তাকে তার প্রিয়তমের কাছে নিয়ে যেতে এসেছে। তাই সে রাজদূতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তার সঙ্গে চলতে লাগল। প্রথমে রাজদূতকে তার শুভাকাঙ্ক্ষী মনে হয়েছিল। কিন্তু পথ চলতে চলতে ধীরে ধীরে সে রাজদূতের গুণের প্রতি বিমুগ্ধ হলো। রাজদূত তরুণীকে রাজপুত্রের গুণ-মহিমার কথা শোনাতে লাগলো। পূর্বে রাজপুত্রের যেসব গুণের কথা সে শুনেছিল, তা রাজদূতের মুখে শুনে তার ভালোবাসা আরো প্রগাঢ় হতে লাগলো। এদিকে রাজদূতের সঙ্গে নদী-সমুদ্র পার হতে হতে সে রাজদূতের গুণের প্রতিও আকৃষ্ট হতে লাগলো। স্বামীর কথা শুনলেও সঙ্গলাভের ফলে রাজদূতের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়তে

লাগলো। দুই ব্যক্তির প্রতি আসক্তি জন্মানোর কারণে নিজেকে শতবার ধিক্কারও দিতে লাগল সে। যাই হোক, ইতোমধ্যেই তারা রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে পৌঁছালো। আর কিছুক্ষণ পরই স্বামীর সাথে তার সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু কীভাবে সেই রাজদূত তার হৃদয়ের এতটা জায়গা দখল করে নিলো? তাকেও একপলক দেখার সাধ হলো তার। অপলক দৃষ্টিতে সে তার দিকে তাকালো। তার শ্রীমুখখানি দেখামাত্র সে তার রূপে সম্পূর্ণ মুগ্ধ হলো। অতি মনোহর রূপের অধিকারী এ ব্যক্তিই কি তার স্বপ্নে দেখা রাজকুমার? তার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেল যেন; উল্লাসে, উদ্বেগে আর উৎকণ্ঠায় সে ভূমিতে পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর এক মোহন স্পর্শে তার চেতনা হলো। চোখ খুলে দেখলো, রাজসিংহাসনে বসে আছেন সেই পরম মনোহর রাজদূত। তিনি তাকে সহাস্যবদনে বলছেন, "আমি রাজদূত নই প্রিয়তমে, আমিই তোমার সেই রাজকুমার।" এতদিন ধরে যাকে তরুণী তার হৃদয়-সিংহাসনে স্থান দিয়েছিলো, আজ তাঁর দর্শনে যেন সে পরিতৃপ্ত হলো। তাকে দূত হয়ে আনতে যাওয়ার জন্য রাজকুমারের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাও কোটিগুণ বেড়ে গেল। রাজদূতবেশী রাজকুমারের করুণায় সে বিগলিত না হয়ে পারল না।

এ কাহিনীতে সাধন বা রাজদূত হলো নাম-সংকীর্তন। সাধক বা ভক্তরূপ তরুণীকে সেই রাজদূত রাজভবনে নিয়ে গিয়ে তিনি নিজেই যে রাজপুত্র (সাধ্য বা নামী) তা দর্শন করালেন। অর্থাৎ হরিনামই সাধন এবং হরিনামই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

মন্ত্র এবং নাম

নামের মহিমার বর্ণনায় শাস্ত্রে ভগবানের কৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু, নারায়ণ, গোবিন্দ, বাসুদেব, হরি ইত্যাদি ভগবৎস্বরূপ-বাচক শব্দবিশেষই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : হরিভক্তিবিলাসে বলা হয়েছে– "*নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ। প্রায়শ্চিত্তশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্ ॥*" (১১/২৬৪) অর্থাৎ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন) হে পরন্তপ, আমার নামসমূহের মধ্যে 'কৃষ্ণ' নামই মুখ্যতর; তা অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এবং প্রধান মুক্তিদায়ক। এস্থলে কৃষ্ণনামের কথা বলা হয়েছে, মন্ত্রের কথা বলা হয়নি। মন্ত্র শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ– যা মনন করার মাধ্যমে ত্রাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ মুক্তিলাভ করা যায়। মন্ত্রকে নাম বলা হয় না। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের নাম থাকে বলে মন্ত্রকে নামাত্মক বলা হয়। শ্রীজীব গোস্বামীপাদও মন্ত্রকে নামাত্মকই বলেছেন– '*ননু ভগবন্নামাত্মক এব মন্ত্র।*" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৪) মন্ত্রে '*নমঃ*', '*ওঁ*', '*ক্লীং*', '*স্বাহা*' ইত্যাদি থাকে, কিন্তু ভগবন্নামে তা থাকে না। মন্ত্র ও নামের মহিমা সমান নয়। মন্ত্রে নাম অবস্থান করে বলেই মন্ত্রের মন্ত্রত্ব। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণমন্ত্র ও কৃষ্ণনামের বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন–

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্র সার নাম– এই শাস্ত্র মর্ম ॥ *(চৈ. চ. আদি ৭/৭১-৭২)*

অর্থাৎ কৃষ্ণমন্ত্রের দ্বারা সংসার থেকে মুক্তি লাভ হয় আর কৃষ্ণনামের দ্বারা জীব ভক্তি লাভ করে শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত হয়। এজন্য সাধন হিসেবে মন্ত্র অপেক্ষা নাম শ্রেয়।

হরিভক্তিবিলাসে বলা হয়েছে–

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥ (হ. ভ. বি. ২/১১/৪৫৪)

অর্থাৎ হে ভরতবংশজ, যিনি পূর্বে শত শত জনম ধরে শ্রীবাসুদেবকে সম্যকভাবে অর্চন করেছেন; তাঁর মুখে শ্রীহরির নাম সর্বদা বিরাজ করেন। এখানে শত শত জন্মের অর্চনের চেয়েও হরিনামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে।

ভগবানের নাম ভগবান থেকে অভিন্ন। মন্ত্রসিদ্ধির মাধ্যমে যা লাভ হয়, কেবল নামের আভাসেই তা অনায়াসে লাভ করা যায়। মন্ত্রেও নামই থাকে এবং মন্ত্র থেকে নামকে পৃথক করলে মন্ত্রের মন্ত্রত্বই থাকে না। পক্ষান্তরে শুধু নাম উচ্চারণ করলেই মন্ত্র উচ্চারণ হয়ে যায়।

মন্ত্র এবং মহামন্ত্র

মন্ত্র অপেক্ষা নামের মহিমা অত্যধিক বলেই নামকে মহামন্ত্র বলা হয়। মন্ত্রে ভগবান বা ঋষিগণের শক্তি আহ্বান করা হয়, কিন্তু মহামন্ত্র বা নাম সর্বশক্তিমান ভগবানের অভিন্ন প্রকাশ।

অনেকেই মনে করে, মন্ত্রের দ্বারা ভোগ নিবেদন করা যায়, কিন্তু নামের দ্বারা যায় না। এ ধারণা দূর করার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শিক্ষা দিয়েছেন–

ভিক্ষা-নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া। / 'চল, আগে তুমি লক্ষেশ্বর হও গিয়া' ॥
প্রভু বলে, জানো– লক্ষেশ্বর বলি কারে? / প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে ॥
সে-জনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর। / তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর ॥

(চৈ. ভা. ১০/১১৭, ১২১-২২)

প্রতিদিন লক্ষ নাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত ভগবান মন্ত্রের দ্বারা প্রদত্ত নৈবেদ্যও গ্রহণ করতেন না। শ্রীখণ্ডের মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীমুকুন্দাচার্য শ্রীবামনদেবকে বলেছেন–

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালাহবস্তুতঃ।
সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রংমনুসংকীর্তনং তব ॥

(ভা. ৮/২৩/১৬)

অর্থাৎ, উচ্চারণে ত্রুটি হেতু মন্ত্রগত, ক্রমবিপর্যয়াদি দ্বারা তন্ত্রগত এবং দেশগত, কালগত, পাত্রগত ও দক্ষিণাদি বস্তুগত যে যে ত্রুটি ঘটে, আপনার নাম সংকীর্তন সেসকলকে নির্দোষ করে।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরহরি স্বয়ং ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণনামকে 'মহামন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন।

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশ। / কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ ॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'
প্রভু বলে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র। / ইহা জপ, গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥

(চৈ. ভা. মধ্য ২১/৭৬-৭৮)

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রকে মহামন্ত্র বলার আরো কিছু কারণ হলো, তা মন্ত্র এবং নাম উভয়ই। অন্য মন্ত্রে যেমন দীক্ষা প্রদান করা হয়, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রেও তেমনি দীক্ষা প্রদান করা হয়। আবার তা গ্রহণ কররার জন্য দীক্ষারও অপেক্ষা করতে হয় না। গুরুদেব শিষ্যকে মহামন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে এ ধারা প্রচলিত। যদি তা কেবল নাম হতো, তবে গুরুর কাছ থেকে দীক্ষার প্রয়োজন হতো না। তবে এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এ মন্ত্র ত্রিকাল, একাসনে উপবেশন, করন্যাস ও শৌচাদি মন্ত্রবিধির অতীত। এ মহামন্ত্র তারক (মুক্তিদানকারী) ও পারক (প্রেমদান-কারী) উভয়ই। প্রতি কলিযুগে যুগাবতারের দ্বারা প্রবর্তিত কলির যুগধর্ম মহামন্ত্রকে তারকব্রহ্ম নাম বলা হয়। যা কেবল মুক্তি প্রদান করে। কিন্তু যে বিশেষ কলিযুগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে নাম বিতরণ করেন, সে নাম পারকব্রহ্মনাম বলে খ্যাত। অর্থাৎ এ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়। এজন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত এ হরিনাম কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির জন্য গ্রহণ করা সর্বোত্তম।

কেন এ কলিযুগে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র?

সাধারণত যুগের আবর্তন অনুসারে এ কলিযুগ দ্বাপরের পরের যুগ হলেও ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ এক কল্প বা এক হাজার চতুর্যুগের এ বিশেষ কলিযুগেই বেদেরও দুর্লভ এ হরিনাম স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক এ জগতে প্রকাশিত হয়। কেবল এ যুগেই যেকোনো সাধারণ মানুষ এ নাম গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রেমভক্তি লাভ করতে পারে, তাই এ যুগকে প্রেমযুগ বলা হয়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত জোরালো উপস্থাপনা হলো :

এ কলিযুগে ভগবানের নামই হচ্ছে একমাত্র পন্থা, এ ছাড়া আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই।" এ কলিযুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই শ্রীকৃষ্ণের অবতার। কেবল এ নাম কীর্তন করার ফলে যেকোনো মানুষ সরাসরি ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারে। যিনি তা করেন, তিনি অবশ্যই উদ্ধার লাভ করেন। এ নামের প্রভাবেই কেবল সমস্ত জগৎ নিস্তার পেতে পারে। কলিযুগে হরিনামই যে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় এবং এ ছাড়া যে আর কোনো গতি নেই, তা সাধারণকে বোঝাবার জন্যই 'হরের্নাম' ও 'নাস্ত্যেব' শব্দ দুটি তিনবার করে ব্যবহার করা হয়েছে। 'কেবল' শব্দের দ্বারা নিশ্চিতভাবে জ্ঞান, যোগ, তপশ্চর্যা, সকাম কর্ম আদি অন্য সমস্ত পন্থা নিবারণ করা হয়েছে। এ শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে, সে কোনোমতেই উদ্ধার পেতে পারে না। সে জন্যই তিনবার 'নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে, যার দ্বারা স্থির নিশ্চিতভাবে পরমার্থ সাধনের প্রকৃত পন্থা নিরূপিত হয়েছে।

সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য তিনবার পুনরুক্তি করা হয়, যেমন : "তোমাকে এটি করতেই হবে, করতেই হবে, করতেই হবে।" তাই বৃহন্নারদীয় পুরাণে তিন সত্য করে বলা হয়েছে যে, এ কলিযুগে হরিনামই উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায়। যাতে মানুষ নিষ্ঠাভরে নামের আশ্রয় গ্রহণ করে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

আমাদের কৃষ্ণভাবনা আন্দোলনে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। যারা এ যুগে সিদ্ধিলাভের এ পন্থাটি মানে না, তারা অনর্থক জ্ঞানের চর্চা, যোগের অভ্যাস অথবা সকাম কর্ম ও তপশ্চর্যার মাধ্যমে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে কালক্ষয় করছে। নিজেদের সময় তো নষ্ট করছেই, পরন্তু তাদের অনুগামীদেরও বিপথে পরিচালিত করছে। আমরা যখন সে কথাটি অত্যন্ত সরল ভাষায় মানুষকে বলি, তখন বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সদস্যরা আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে আমরা সেসব তথাকথিত জ্ঞানী, যোগী, কর্মী ও তপস্বীদের সঙ্গে আপোস করতে পারি না। তারা যখন বলে যে তাদের প্রচেষ্টাও আমাদের মতো সৎ, তখন আমরা বলতে বাধ্য হই যে আমাদের প্রচেষ্টাই কেবল সৎ, তাদেরটা সৎ নয়। এ আমাদের অনমনীয়তা নয়, শাস্ত্রের উক্তি। কখনোই আমাদের শাস্ত্রনির্দেশ থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। (চৈ. চ. আদি ২০-২৫)

হরিনামের মহিমা

অন্যের কী কথা, অনন্তশেষরূপে ভগবান স্বয়ং অনন্ত মুখে হরিনামের মহিমা বর্ণনা করতে থাকলে হরিনামের অত্যুজ্জ্বল অনন্ত মহিমার সীমা খুঁজে পান না। সুতরাং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কৃষ্ণনামের অনির্বচনীয় মহিমা ও শক্তির কথা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে কেউই সক্ষম নন। স্বাভাবিকভাবেই তাই হরিনামের মহিমা বর্ণনা করার জন্য সামান্য কয়েক পৃষ্ঠা লেখা নিতান্তই নগণ্য। তবু যৎসামান্য তুলে ধরা হলো :

নামের মহিমা সম্বন্ধে শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে—

নাম-নামী এক, নামে দিয়া সর্বশক্তি। / সর্বোপরি করিয়াছ তব নামভক্তি ॥
নামই পরম-মুক্তি, নাম উচ্চগতি। / নামই পরম-শান্তি, নাম উচ্চস্থিতি ॥
নামই পরমভক্তি, নাম শুদ্ধা মতি। / নামই পরমপ্রীতি, নাম পরা স্মৃতি ॥
নামই কারণতত্ত্ব, নাম সর্বপ্রভু। / পরম আরাধ্য নাম গুরুরূপে বিভু ॥

কিন্তু যাদের ভক্তিসুকৃতি নেই, ভক্তিতত্ত্বে তাদের কখনোই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হয় না। শ্রীনাম সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিতত্ত্ব হওয়া সত্ত্বেও সুকৃতির অভাবেই তাদের নামে রুচি হয় না। নামের অনন্ত মহিমার প্রতিও তাদের বিশ্বাস হয় না। বিষয় এবং শাস্ত্রের একাঙ্গে যাদের গভীর আসক্তি, শাস্ত্রের তাৎপর্য তারা জানতে পারে না।

বেদে শ্রীনামের মহিমা

ঋকবেদে বলা হয়েছে, "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সদিত্যাদি ॥" (১/১৫৬/৩) শ্রীজীব গোস্বামীপাদের তাৎপর্য : হে বিষ্ণো, তব নাম চিৎ (চিৎস্বরূপম্) অতএব মহঃ (স্বপ্রকাশরূপম্)। সুতরাং এ নামের উচ্চারণ-মাহাত্ম্য সম্যকরূপে না জেনে বা সামান্যমাত্র জেনেও যদি আমরা কেবল উচ্চারণ করে যাই, তবে তার ফলে আমরা তোমার সম্বন্ধীয় বিদ্যা (ভক্তি) লাভ করতে পারব। যেহেতু তা প্রণববব্যঞ্জিত বস্তু, তাই স্বতঃসিদ্ধ। বেদের প্রমাণে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১১/২৭৫) বলা হয়েছে, "হে পরমপূজ্য, আপনার পদারবিন্দে আমি বারংবার প্রণাম করি; কারণ ঐ শ্রীচরণমাহাত্ম্য শ্রবণ করলে ভক্তগণ যশ ও মোক্ষের অধিকারী হতে পারেন। অন্য কী কথা, যাঁরা ঐ শ্রীপাদপদ্ম নির্বাচনের জন্য বাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হন এবং পরস্পর কীর্তনে তা অবধারণ করেন, তাঁদের অন্তরে আসক্তির বিকাশ ঘটলে সাক্ষাৎকারের জন্য চৈতন্যস্বরূপ আপনারই নামের আশ্রয় করে থাকে (শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর টীকা অনুযায়ী শ্রীশ্যামাচরণকৃত অনুবাদ)।

হরিনামই জীবের মুখ্যকর্ম

হরিনাম অন্যান্য মার্গ বা পন্থার মতো কেবল উপায় নয়; তা উপায় ও উপেয় উভয়ই। তাই তা স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বরাট ও সর্বশক্তিমান। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কৃষ্ণনাম কীর্তনের ওপরই নির্ভর করে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁর থেকে অভিন্ন নামও তদ্রূপই। কৃষ্ণের শ্রীমূর্তির চেয়েও তাঁর নাম তাঁর কাছে অধিক প্রিয়। কৃষ্ণনাম অতীব সুখোপাস্য, জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হলেই তা সম্পাদিত হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা এবং সাক্ষাৎ রসবিগ্রহও বটে। মধুর অক্ষরময় বলে সুরস ও কোমল। প্রেম ও ভক্তিরসে তা কেবল কীর্তিতই হয় না, মিলন ও বিরহ উভয় অবস্থায় নামীর হৃদয়ে স্ফুর্ত হয়। সুতরাং শ্রীনাম একই সাথে মিলনসেতু এবং বিরহের বন্ধু। গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে ডেকেছেন; আবার কৃষ্ণের সাক্ষাতে তাঁরা 'কৃষ্ণনাম' গান গেয়েছেন।
হরিনামের দিব্য মহিমার সারাংশ নিরূপণ করে পদ্যাবলিতে (২৯) বলা হয়েছে–

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনাসামুচ্চটানং চংহসা-
মাচণ্ডলমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষানং ন চ সৎক্রিয়াং ন পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥

অর্থ : বহু সুকৃতিসম্পন্ন সাধুগণের চিত্তের আকর্ষক, অখিল পাপনাশক, মূক ব্যতীত আচণ্ডাল সবার কাছে সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্যের বশকারী, শ্রীকৃষ্ণের নাম সমন্বিত এ মহামন্ত্র জিহ্বায় স্পর্শমাত্র ফল দান করে, দীক্ষা আদি বিধি ও স্থান-কাল-পাত্রের কিঞ্চিৎমাত্রও অপেক্ষা করে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে–

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ (৬/২/১৮)

অর্থ : শ্রীভগবানের নামের মাহাত্ম্য জেনে বা না জেনে যেভাবেই হোক, যদি লোকে তা কীর্তন করে, তবে অগ্নি যেভাবে ইন্ধনসমূহ দহন করে, সেভাবে তার সকল পাপ দগ্ধ হয়ে যায়।

জেনে অথবা না জেনে যেভাবেই হোক, আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়বেই, তেমনি হরিনামের মাহাত্ম্য জেনে অথবা না জেনে যেভাবেই হোক, কেউ হরিনাম গ্রহণ করলে ফল লাভ করবেই। শুধু তা-ই নয়, নামগ্রহণকারী নিজের মঙ্গলের সাথে সাথে সর্বজীবেরও কল্যাণ সাধন করেন; ভগবান ও ভগবন্নামের কীর্তি শ্রবণ করিয়ে সমগ্র জগৎকে পবিত্র করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, "হে নৃসিংহদেব, যাঁরা আনন্দিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে তোমার নামকীর্তন করেন, তাঁরাই সাধু, তাঁরাই সর্বজীবের অকপট ও স্বার্থশূন্য বন্ধু।" (হ. ভ. বি. ১১/১৬৫-৬৭) হরিনাম সর্বব্যাধিবিনাশক এবং সর্বদুঃখের উপশমকারী। ভাগবতে আছে, "ভগবানের নামগুণাদি সংকীর্তন অথবা তাঁর বিক্রমবৃত্তান্ত শ্রবণ করলে ভগবান হৃদয়ে প্রবেশ করে সূর্য যেমন তমোরাশি বিনাশ করে অথবা ঝরোবায়ু যেমন মেঘকে বিচ্ছিন্ন করে, সেভাবে জীবসমূহের নিখিল দুঃখ অপসারণ করেন।" (১১/১৬৯-৭২)

নামকীর্তনই ভক্তি, ভক্তির প্রাণ এবং জীবের পরমধর্ম

শ্রীহরির নামকীর্তনকেই শাস্ত্রে ভুক্তি ও মুক্তিকামী এবং মুক্ত সকলের সাধন ও সাধ্যরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। হরিনামই জীবের পরমধর্ম বা সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন, যার সাথে অন্য কোনো সাধনের তুলনাও অপরাধ। সেজন্য পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের লোকই শ্রীহরির নাম (ভাষাভেদে আল্লা, খোদা, গড ইত্যাদি নাম) গ্রহণ করে থাকে। এমনকি যারা ভগবানের রূপ বা বিগ্রহকে অস্বীকার করে, তারাও তাঁর নামকে বাদ দিতে পারে না। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী ভাগবতের (৬/৩/২২) টীকায় বলেছেন যে, কেবল শ্রীভগবানের নাম গ্রহণই প্রাণীগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম– তা ভিন্ন আর অন্য কিছু নয়; এর তাৎপর্য হলো, ভগবানের নাম গ্রহণই সাক্ষাৎ ভক্তি। তবে শ্লোকোক্ত 'এব' শব্দের প্রয়োগ করে তিনি সাধনের পন্থাও ব্যাখ্যা করেছেন, যথা : ভক্তি কেবল ভগবানের সন্তোষবিধানের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হবে। যদি নিজের সুখ ও ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নামগ্রহণ করা হয়, তবে তা পরমধর্ম বা ভক্তি হবে না। কারণ তুচ্ছ কাম্যকর্মের নশ্বর ফল লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাতে নামাপরাধ হয়ে থাকে এবং ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যফল লাভেই এর পরিসমাপ্তি ঘটে। স্বয়ং মহাপ্রভুই হরিনামকে ভক্তির প্রাণ বলে ঘোষণা করেছেন– *বিদ্যাবধুজীবনং* এবং বিদ্যা বলতে তিনি কৃষ্ণভক্তিকেই বুঝিয়েছেন।

হরিনাম স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ

হরিনামের নিরপেক্ষতা বা স্বাতন্ত্র্য দুই প্রকার : ১. সাধ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থার অপেক্ষা না করা এবং ২. সাধ্যবস্তু প্রদানের জন্য কারো (কর্ম, জ্ঞান বা যেকোনো ভক্ত্যঙ্গের) সহায়তার অপেক্ষা না করা। প্রথম নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে–

ন দেশকালাবস্থাত্মশুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নামকামিতকামদং ॥

অর্থ : এ নামকীর্তন দেশ, কাল, অবস্থা ও আত্মশুদ্ধাদির অপেক্ষা করে না, ইনি স্বতন্ত্র ও কামনাকারীর কামপ্রদ।
হরিনামের দ্বিতীয় প্রকার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে ভাগবতে বলা হয়েছে–

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিননঃ।
যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥

অর্থ : যথার্থ জ্ঞানবান উন্নত শ্রেণীর মানুষেরা এ কলিযুগের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম। এমন জ্ঞানবান মানুষেরা কলিযুগের প্রশংসাই করে থাকেন, যেহেতু এ অধঃপতনের যুগে নামসংকীর্তনের মাধ্যমে অনায়াসেই জীবনের সকল বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

ক্রমসন্দর্ভেও বলা হয়েছে– "যাঁরা নামসংকীর্তনের মহিমা জানেন, সেই আর্য সারগ্রাহীগণ কলির প্রশংসা করে থাকেন, যেহেতু যে সংকীর্তনে অন্য সাধনের অপেক্ষা না করেই সমস্ত যুগের সহস্র সহস্র সাধ্যসমূহ লাভ হয়, সেই সংকীর্তন কলিতে প্রচারিত। ভাগবতশাস্ত্রসমূহ সুস্পষ্টভাবে বারবার নামমহিমা কীর্তন করে বলেন, জীব কর্তৃক নাম যেকোনো প্রকারে একবার মাত্র শ্রুত বা গীত হলেই মুক্তি দান করেন।"

নামের কৃপা থেকেই গুরুকৃপা লাভ হয়

মায়াগ্রস্ত মনোধর্মী জীব নিজ বুদ্ধিবলে কখনোই মহৎকে চিনে তাঁর পদাশ্রয় করতে পারবে না। কারণ মহৎ সর্বদা অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থান করেন। কিন্তু বদ্ধজীব প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত। এ অবস্থায় মহতের সঙ্গ ঘটলেও জীব মহতের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং তাঁর পদাশ্রয় করাও তার নিজের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে ব্যাকুল হৃদয়ে অহরহ হরিনাম কীর্তন করলে নামপ্রভুর কৃপায় তাঁর নিজজন মহতের সন্ধান অবশ্যই লাভ করা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে বিশেষত গৌরনাম পরম উদার এবং অত্যন্ত করুণাময়। কলিহত জীবকে ব্রজপ্রেম দান করার জন্য যে গৌরহরি অবতরণ করেছিলেন, তাঁর নাম ধরে আর্ত চাতক এবং বিরহব্যাকুল চক্রবাক ও কুররীর ন্যায় ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকলে তিনি অবশ্যই তাঁর অন্তরঙ্গজনের পদাশ্রয় করিয়ে দেবেন।

হরিনামেই গুরুভক্তি হয়

পদ্যাবলি গ্রন্থে শ্রীব্যাসদেব বলেছেন–

বিষ্ণোর্নামৈব পুংসাং শমলমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ
ব্রহ্মাদিস্থানভোগাৎ বিরতিমথ গুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দভক্তিম্।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহস্মৃতিজনন ভ্রান্তি বীজঞ্চ দগ্ধ্বা
সম্পূর্ণানন্দবোধে জহতি চ পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তিম্ ॥

অর্থ : শ্রীবিষ্ণুর নাম কেবল পাপই হরণ করে না, পুণ্যও উৎপাদন করে। এস্থলে 'পুণ্য' শব্দে সাধকের লভ্য কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্যকে বোঝায়। ব্রহ্মাভোগ্য বস্তুতেও নাম সাধকের বিরক্তির উদয় হয়, শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তত্ত্বজ্ঞান প্রকট হয় এবং জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার ভ্রমণের অবিদ্যা দগ্ধ হয়। শ্রীনাম অখণ্ড সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রেমময় দাস্যে নামসাধককে সমর্পিত করায় অন্য করণীয় কার্য তার নিবৃত্ত হয়ে থাকে।

নামসংকীর্তন অন্য সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের পূর্ণতাকারক সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ তথা ভক্তিরাজ্যের চক্রবর্তী মহারাজ

কলিযুগের যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন হওয়ায় নাম-সংকীর্তনই কলিযুগের মুখ্য সাধনাঙ্গ। এ প্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন–

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। / কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন। / নিরপরাধ নাম হইতে হয় প্রেমধন ॥

অর্থাৎ সাধনের মধ্যে নববিধা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। তার মধ্যে আবার হরিনাম সংকীর্তন শ্রেষ্ঠ। হরিনাম ব্যতীত অন্য কোনো সাধনকে এ যুগের জন্য গৃহীত হয়নি। 'নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ ক্রমসন্দর্ভে বর্ণনা করেছেন– "*যদ্যপ্যেকতরেণাপি বুৎক্রমেণাপি সিদ্ধির্ভবত্যেব,তথাপি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমং অন্তকরণশুদ্ধর্থমপেক্ষ্যম্ ॥*" অর্থাৎ নববিধা ভক্তির যেকোনো একটি অঙ্গের দ্বারা অথবা ক্রমবিপর্যয়ে কোনো একটি

অঙ্গের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হলেও অন্তকরণশুদ্ধির জন্য প্রথমে শ্রীহরিনাম শ্রবণ অত্যাবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিযোগের নানা অঙ্গের কথা বলা হলেও মুখ্য অঙ্গ বলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী নামকীর্তনকেই শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে উল্লেখ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি একে জীবের পরম সাধ্য ও সাধন বলেও উল্লেখ করেছেন। শ্রী জগন্নাথপুরীতে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন–

ভক্তি সাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সংকীর্তন ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে বর্ণনা করেছেন :

"শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবৎপ্রেম লাভের নয়টি অঙ্গের মধ্যে নাম-সংকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ। অপরাধশূন্য হয়ে যিনি নামকীর্তন করেন, তিনি নিশ্চিত ভগবৎপ্রেম প্রাপ্ত হন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলা হয়েছে, ভক্তির কোনো অঙ্গই শ্রীকৃষ্ণ নাম-সংকীর্তন ব্যতীত পূর্ণ নয়। হরিভক্তি সুধোদয়ে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণের করুণা লাভ করার জন্য হরিনাম সংকীর্তন সমস্ত পারমার্থিক আচার-অনুশীলনের মধ্যে সর্বোত্তম ও অগ্রগণ্য। অন্যান্য অঙ্গ এর সহায়ক হলে, তা গ্রহণ করা যেতে পারে।"

আবার তিনি জৈবধর্মে ব্যাখ্যা করেছেন,

"যত প্রকার ভজন আছে, সর্বাপেক্ষা নামভজনই বলবান। নাম ও নামীতে কোনো ভেদ নেই। তাই নিরপরাধে নাম করলে, অতি শীঘ্র সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়। আপনি বিশেষ শ্রদ্ধার সাথে নামগ্রহণ করুন। নাম করতে করতে নববিধা ভক্তি হয়ে থাকে। নাম করতে করতে নববিধা ভজন হয়ে থাকে। নাম উচ্চারণ করলে শ্রবণ-কীর্তন উভয়ই হয়। নাম করার সাথে সাথে হরিলীলা স্মরণও মানসে পদসেবা, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন সবই হয়।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এ কথাই বলা হয়েছে–

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব-পাপক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ *(মধ্য ১৫/১০৭)*

ভক্তির পাঁচটি মুখ্য অঙ্গের মধ্যে নাম-সংকীর্তন যে মূল এবং অন্যসব ভজন অঙ্গ যে নাম সংকীর্তনের অনুবর্তী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এ বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে প্রদর্শন করেছেন–

১. সাধুসঙ্গ : নামভজনে রুচি লাভের জন্য ভক্তসঙ্গের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উন্নত ভক্তগণের সঙ্গলাভ করার মাধ্যমেই এ রুচি লাভ হয়ে থাকে।

২. ভাগবত শ্রবণ : ভাগবতকেই নামভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বারবার নামভজনের উপযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩. মথুরাবাস : ভগবানের দিব্যলীলাবিলাস সমন্বিত ধামে বসবাসরত সাধুগণ সর্বদা নামকীর্তন করেন।

৪. শ্রীবিগ্রহ অর্চন : যেসব মন্ত্রের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের সেবা করা হয় তা ভগবানের নামে পরিপূর্ণ। হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে আছে এবং শ্রীল জীব গোস্বামীপাদও বলেছেন– শ্রীবিগ্রহ অর্চন সর্বদা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন সহযোগেই করা উচিত।

হরিনাম থেকেই সমস্ত সাধন অঙ্গ উদগম হয়। নামাশ্রয়পূর্বক ভজনপথে অগ্রসর হওয়ার সময় কারো শ্রবণে, কারো অর্চনে, কারো বন্দনে, কারো পাদসেবনে এবং কারো অন্যান্য ভজন অঙ্গ বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়; ভজনপথে তা স্বাভাবিক হলেও নামকীর্তনকে অন্যান্য ভজনাঙ্গের সমান মনে করা উচিত নয়। নিজ নিজ আকর্ষণীয় ভজনাঙ্গে সেবারত থেকে নামকেই সেই সেবাপ্রাপ্তির কারণ জানতে হবে। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ বলেছেন যে, নববিধা ভক্তির

অর্চন, বন্দনাদি অন্যান্য অঙ্গও সম্পাদন করা উচিত, কিন্তু তা অবশ্যই হরিনামের অনুগামী হবে। রাগানুগা মার্গে স্মরণ মুখ্য অঙ্গ হলেও তা নামকীর্তনের অধীনেই করতে হবে। **শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিই একমাত্র অভিধেয়রূপে নির্ণীত হলেও নামকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ এবং নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কীর্তনের মধ্যে নামকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।**

হরিনাম সর্বাভীষ্ট প্রদাতা

হরিনাম কীর্তনের ফলে যে সর্বাভীষ্ট পূরণ হয়, সে প্রসঙ্গে কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, "*এতদ্ধেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিশচ্ছতি তস্য তৎ।*" অর্থাৎ কেবল এই অক্ষর (ওঁ) জানতে পারলেই যে ব্যক্তি যা ইচ্ছা করবে, সে তা লাভ করবে। হরিনামকে বলা হয় চিন্তামণি (*নামচিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ*)। এর মানে হরিনাম কীর্তন করতে করতে যে যা লাভের চিন্তা করবে, সে তা-ই প্রাপ্ত হবে। হরিনাম কীর্তনের মাধ্যমে জাগতিক সুখ, উচ্চলোক, সাযুজ্য মুক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেম সবই লাভ করা যায়। এমনকি, হরিনামের আশ্রয় ব্যতীত কর্ম ও জ্ঞানযোগ সাধনেও কোনো ফল লাভ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু এ প্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন–

কৃষ্ণভক্তি হয়- অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক- কর্ম-যোগ-জ্ঞান ॥
এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥ (চৈ. চ.)

অর্থাৎ 'অভিধেয়' অর্থ সাধন। কৃষ্ণভক্তিই সকল সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কর্ম, যোগ, জ্ঞানাদির সাধন সর্বদা ভক্তির অনুগামী হয়। হরিনামের আশ্রয় ব্যতীত অন্য সাধনসমূহ ফলদানে সমর্থ নয়। শুধু তা-ই নয়, ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট জীব যে যা চায়, তাকে তা প্রদান করে এক হরিনামই। মহাপ্রভু স্বয়ং তা নিশ্চিত করেছেন, সর্বসিদ্ধির লাভের কথা বলে– ধন-জন, বৈভব, আরোগ্য, স্বর্গসুখ নাম গ্রহণে অনায়াসে লাভ হয়, পাপনাশ করতে চাইলে, ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াতে চাইলেও নামের মতো এত সহজ ও শক্তিশালী উপায় দ্বিতীয়টি নেই, মোক্ষ, চিত্তশুদ্ধিও নামাশ্রয়েই সহজে হয়ে থাকে। আর নিরপরাধে নামাশ্রয় করলে জীবের পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। মোটকথা, আপনি যা-ই চান না কেন, কেবল নামাশ্রয়েই তা অতি অনায়াসে লাভ করা সম্ভব।

নামগ্রহণের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় কীভাবে?

সনাতন গোস্বামী ও সম্রাট আকবর সম্বন্ধে একটি সুন্দর ঘটনা আছে–

আকবর তখন দিল্লির সম্রাট। একদিন তিনি শুনলেন, সম্রাট হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী– শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন রাজকার্য পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে এসেছেন। তাই তিনি একদিন তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বৃন্দাবনে এলেন। এসে দেখলেন, সনাতন গোস্বামী নির্জনে বসে একান্তে ভগবানের নাম জপ করছেন। জপ করতে করতে তিনি কখনো কাঁদছেন, কখনো আনন্দে হাসছেন। কিছুক্ষণ পর সনাতন গোস্বামীর বাহ্যদশা ফিরলে তিনি সম্রাট আকবরকে দেখে যথাযোগ্য সম্মান জানালেন। আকবর তখন সনাতন গোস্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি অমন করে কখনো কাঁদছিলেন, আবার কখনো হাসছিলেন কেন?" সনাতন গোস্বামী উত্তরে বললেন, "হরিনাম করার সময় আমি যখন আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে দেখছিলাম তখন হাসছিলাম এবং তিনি যখন আমার কাছ থেকে অন্তর্হিত হচ্ছিলেন, তখন আমি কাঁদছিলাম।" উত্তর শুনে আকবর অবাক হয়ে বললেন, "নামের মাধ্যমে কি কাউকে দেখা যায়? কারো নাম ধরে ডাকলেই যে তার দর্শন লাভ করা যায়, তার কোনো সত্যতা নেই।" তখন সনাতন গোস্বামী তাকে বললেন, "ভগবানের নাম ধরে ডাকলে যে ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হন, আমি তা আপনাকে প্রমাণ করে দেখাব যে।" এ কথা

শুনে সম্রাট আকবর আবার দিল্লিতে ফিরে গেলেন।

কিছুদিন পর সনাতন গোস্বামী ছদ্মবেশে সম্রাট আকবরের রাজপ্রাসাদের সামনে বসে জপ করতে লাগলেন– আকবর, আকবর, আকবর...। অনবরত এ নামজপ তিনি চালিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর সে সংবাদ সারা প্রাসাদে ছড়িয়ে পড়ল– 'এক সাধু আকবরের নাম জপ করছেন।' সম্রাট আকবর সে কথা শুনে ভাবলেন হয়তো কোনো ভিক্ষুক হবে; কিছু দান পাওয়ার জন্য হয়তো তার নাম জপ করছে। তাই তিনি কিছু অন্ন ও বস্ত্র তার কাছে পাঠালেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি আকবর আকবর করেই চললেন। তখন আকবর ভাবলেন, নিশ্চয়ই তার আরও বড় কোনো চাওয়া আছে। তখন তিনি মন্ত্রীকে দিয়ে কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাঠালেন এবং তিনি কী চান, তা জানতেও বললেন। মন্ত্রী গিয়ে তাঁকে স্বর্ণমুদ্রাসমূহ দিলেন এবং তিনি কী চান, তা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু শত প্রলোভনেও সনাতন গোস্বামী কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে নিরন্তর আকবরের নাম জপ করতে লাগলেন। মন্ত্রী সব কথা সম্রাটকে গিয়ে বলার পর সম্রাট শুনে অবাক হলেন– এতকিছু দেওয়া সত্ত্বেও সাধু সন্তুষ্ট হলেন না! নিশ্চয়ই তিনি কোনো সাধারণ সাধু নন। তাই সম্রাট নিজেই তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী চান আমার কাছে?" তখন সনাতন গোস্বামী তাঁর প্রকৃত রূপ দেখালে সম্রাট অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সনাতন গোস্বামী, আপনি এখানে কেন?" তখন সনাতন গোস্বামী বললেন, "আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এসেছি। আপনি বলেছিলেন– ভগবানের নাম জপ করার মাধ্যমে তাঁকে দর্শন করা যায় না। কিন্তু দেখুন, আপনার নাম জপ করার মাধ্যমে আমি আপনাকে পেলাম কি না? আপনার নাম জপ করে যদি আপনাকে পাওয়া যায়, তবে সর্বশক্তিমান ভগবানকে ডাকার মাধ্যমে কি তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে না? তবে ভগবানকে ডাকার জন্য অবশ্যই জড়-বাসনাশূন্য হতে হবে। ঠিক যেমন, যদি আমি আপনার পাঠানো সম্পত্তির প্রতি লোভ করতাম, তবে আপনি আমার কাছে আসতেন না। তেমনি যদি কেউ জাগতিক লাভালাভের জন্য ভগবানকে ডাকে, তবে ভগবান তাঁকে দর্শন দান করেন না। কিন্তু ভগবানের কোনো ঐকান্তিক ভক্ত যখন নিঃস্বার্থভাবে কেবল তাঁরই সেবা ও দর্শন লাভের জন্য আকুলভাবে তাঁর নামকীর্তন করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই ভগবান তাকে দর্শন দান করে পরিতৃপ্ত করবেন।" এ কাহিনী থেকে খুব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, কেবল ঐকান্তিক ও নিঃস্বার্থভাবে ভগবানের নাম গ্রহণ করার মাধ্যমে স্বয়ং ভগবানকে দর্শন করা যায়।

এ প্রসঙ্গে হরিনামের মহিমাসূচক পুরাণের কিছু অনুপম শ্লোক অনুবাদসহ তুলে ধরা হলো :

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ। / তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ততে হৃদয়ে মম ॥
ন নামসদৃশং জ্ঞানং ন নাসদৃশং ব্রতম্। / ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলম্ ॥
ন নামসদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশঃ শমঃ। / ন নামসদৃশং পুণ্যং ন নামসদৃশী গতিঃ ॥
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা গতিঃ। / নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ ॥
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ। / নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ ॥
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভরেব চ। / নামৈব পরমারাধ্যং নামৈব পরমো গুরু ॥

(আদিপুরাণ ১০৪-১০৮, ২৩৬,২৫৪)

অনুবাদ : হরিনামের মতো কোনো ব্রত নেই; এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো জ্ঞান নেই, কোনো জ্ঞানই এর সমীবর্তী হতে পারে না। কোনোকিছুই হরিনামের মতো শক্তিসম্পন্ন নয় এবং তা সর্বোচ্চ ফল প্রদান করে। হরিনামই পরম ধর্ম এবং সকল জীবের পরম আশ্রয়। বেদও এর বিশালত্ব নির্ণয় করতে অসমর্থ। নামই মুক্তি, নামই শান্তি এবং চিরন্তন জীবন লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। নামই ভক্তির সর্বোচ্চ শিখর, হৃদয়কন্দরের আনন্দময় অভিব্যক্তি এবং পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করার সর্বোত্তম উপায়। নামই জীবের গুরুরূপে আবির্ভূত প্রভু, নিয়ন্তা ও আরাধ্যস্বরূপ।

সংকীর্তন কী?

সংকীর্তন অর্থ সম্যকভাবে কীর্তন করা। অনেকে মিলিত হয়ে মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন করাকে সংকীর্তন বলা হয়। *কৃষ্ণবর্ণং উচ্চ ত্বিষাকৃষ্ণং*– শ্লোকের টীকায় জীবগোস্বামীপাদ লিখেছেন– নামকীর্তন উচ্চৈঃস্বরেই বিশেষ প্রশস্ত। তিনি এ প্রসঙ্গে দুটি যুক্তিও প্রদর্শন করেছেন। "যারা উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন করেন, তাঁরা নিজের উপকারের সাথে সাথে অন্য প্রাণীদেরও পরম উপকার সাধন করেন। শ্রীনৃসিংহ পুরাণে প্রহ্লাদ মহারাজ নৃসিংহদেবের স্তুতি করে বলেছেন– "হে ভগবান, যে মহৎগণ উচ্চৈঃস্বরে পরমানন্দে তোমার নামকীর্তন করেন, অবশ্যই তাঁদের সর্বজীবের বান্ধব বলে জানতে হবে।" সংকীর্তনের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলেছেন–

জপিলে যে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চসংকীর্তনে পর উপকার করে ॥
অতএব উচ্চ করি কীর্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্বশাস্ত্রে বলে ॥

শ্রীল প্রভুপাদ নামসংকীর্তনের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,
প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান করা। আর সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা তা অনায়াসে সম্পাদন করা যায়। যখনই ভগবানের নামসংকীর্তন হয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ভগবানের অবতার গৌরনারায়ণ তৎক্ষণাৎ সেখানে আবির্ভূত হন এবং সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা পূজিত হন। (ভা. ৪/৩০/৩৬)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণে ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, নারদ, প্রহ্লাদ প্রমুখ মহাজনগণ কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি লোলুপ হয়ে পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কৃষ্ণনাম কীর্তন করে নেচেছিলেন এবং কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় ভেসেছিলেন। লক্ষ্মীদেবী প্রমুখ ভগবানের শক্তিবর্গও কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হয়ে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে নাম-প্রেম আস্বাদন করেছিলেন। অন্যদের কী কথা, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে প্রেম-রস আস্বাদন করেছিলেন। তাই কৃষ্ণদাসী মায়াদেবী যদি এ প্রেম ভিক্ষা করেন, তবে বিস্মিত হওয়ার কী আছে? শুদ্ধভক্তের কৃপা এবং ভগবানের নামকীর্তন ব্যতীত ভগবৎপ্রেম লাভ করা যায় না। (চৈ.চ.অন্ত্য ৩/২২৭–২৬৬, তাৎপর্য)

শিক্ষাষ্টকের আলোকে নামসংকীর্তনের মহিমা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের **প্রথম শ্লোকে** কৃষ্ণনাম সংকীর্তনকে সাতটি বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন; তা ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হলো–

১. চেতোদর্পণমার্জনম্

কৃষ্ণবহির্মুখ মানুষের চিত্ত বিষয়-বাসনার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় তাদের চিত্তরূপ দর্পণে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ, ধাম, লীলাদি প্রতিবিম্বিত হয় না। দর্পণ মার্জিত হওয়ার সাথে সাথে যেমন সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি শ্রীহরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা চিত্তরূপ দর্পণ যতই মার্জিত হয়, ততোই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির মাধুরী তাতে প্রতিবিম্বিত হবে। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে– 'হে দ্বিজোত্তম, অমিততেজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনের মাধ্যমেই দিবাগমে অন্ধকার নাশের ন্যায় সকল দুর্বাসনা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হরিনাম ছাড়া অতি সহজে জীবের পাপ বিনাশের আর কোনো উপায় নেই। যেকোনো সাধনায় ফল লাভের ক্ষেত্রে এ চিত্তশুদ্ধিই প্রথম স্তর। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কোনো সাধনেই কোনো ফললাভ করা যায় না। জ্ঞানাদি সাধনার দ্বারা আগুনের মতো চিত্তের মলরাশি নাশ হলেও তা সাথে সাথে সাধকের চিত্তকেও দগ্ধীভূত করে। কিন্তু নামসাধনাই কেবল গঙ্গা জলের ন্যায় চিত্তকে ধৌত করে শুদ্ধ ও স্বচ্ছ করে। এভাবে হরিনাম সংকীর্তনের ফলে চিত্তরূপ দর্পণ যেভাবে মার্জিত হয়, জ্ঞানাদি সাধনায় তা কখনো হয় না।

২. ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্

জড়বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ রচনার নামই ভব বা সংসার। মহাজ্বালাময় দাবানলে যেমন বৃক্ষলতা, জীবজন্তু সবকিছু দগ্ধ হয়, তেমনি এ সংসাররূপ দাবানলেও কৃষ্ণবহির্মুখ জীবকুল ত্রিতাপ জ্বালায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছে। সংসারকে দাবানলের সাথে তুলনা করার বিশেষ তাৎপর্য হলো, দাবানল যেমন কেউ জ্বালিয়ে দেয় না, বৃক্ষসমূহের পরস্পর সংঘর্ষেই জ্বলে ওঠে; জীবের সংসারজ্বালাও তেমনি দুর্বাসনার ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়ে জ্বলে ওঠে। এ জ্বালার জন্য জীব নিজেই দায়ী, অন্য কেউ নয়। দাবানলে বৃক্ষলতাদি দগ্ধ হওয়ার সময় কোথাও পালিয়ে তাপদাহ থেকে আত্মরক্ষা করা যায় না। কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তাপে জ্বলে-পুড়ে মরা ছাড়া উপায়ন্তর থাকে না। তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীব ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হলেও কোনো প্রতিকারের মাধ্যমেই সে নিজে এ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না। মেঘের ভারী বর্ষণ ছাড়া ভীষণ দাবানল যেমন অন্য কোনো উপায়ে নিবৃত্ত হয় না, তেমনি নামসংকীর্তনরূপ মেঘের বর্ষণ ছাড়া ত্রিতাপ জ্বালারও নিবৃত্তি হয় না।

৩. শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্

শ্রেয় অর্থ মঙ্গল। কৈরব অর্থ পদ্ম এবং চন্দ্রিকা মানে জ্যোৎস্না। নামসংকীর্তন জ্যোৎস্নার ন্যায় জীবের মঙ্গলরূপ পদ্মকে প্রস্ফুটিত করে। এ শ্রেয় বা মঙ্গল কী? ভক্তিই একমাত্র শ্রেয়। জীব যার দ্বারা ভগবৎসেবা লাভ করতে পারে, শুদ্ধ জীবের পক্ষে তা-ই যথার্থ শ্রেয়। যতদিন পর্যন্ত দেহজাত বিষয়ের প্রতি জীবের আকর্ষণ থাকবে, ততদিনই জীবকে অমঙ্গলময় সংসারচক্রে নানা যোনী ভ্রমণ করে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। কৃষ্ণনাম জীবকে ভক্তি দানপূর্বক তার বিষয়াসক্তিরূপ যন্ত্রণা বিনষ্ট করে।

৪. বিদ্যাবধূজীবনম্

নামসংকীর্তন বিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ। এখানে বিদ্যা উপমেয়, বধূ উপমা। নামসংকীর্তন উপমেয় এবং প্রাণ উপমা। বিদ্যা কাকে বলে? বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা, সুতরাং বিদ্যা অর্থ জ্ঞান। এ জ্ঞান সাধনা অনুযায়ী সাধকের চিত্তে আবির্ভূত হয় এবং তা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান বা সবিশেষ ভগবজ্জ্ঞান দুই-ই হতে পারে। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান তরঙ্গহীন সিন্ধুর ন্যায় বৈচিত্র্যশূন্য, কিন্তু সবিশেষ ভগবজ্জ্ঞান অশেষ বৈচিত্র্যের আধার। বিদ্যা দ্বারা প্রেমভক্তিকেও বোঝানো হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে রায়রামানন্দ সংবাদে কৃষ্ণভক্তিকেই বিদ্যা বলা হয়েছে।

প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনু বিদ্যা নাহি আর ॥

অতএব, বিদ্যা শব্দে প্রেমভক্তিকেই বোঝানো হয়, যা জীবের মঙ্গলরূপ কৈরব-কুসুমের পরিস্ফুটন ঘটায়, যা সাধ্যবস্তুর সার। কিন্তু এখানে বিদ্যাকে বধূর সাথে তুলনা করার তাৎপর্য হলো এ শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনই প্রেমভক্তিরূপ নববধূর জীবনস্বরূপ। প্রাণ না থাকলে যেমন সবকিছু ব্যর্থ, তেমনি নাম-সংকীর্তনবিহীন ভক্তিসাধনাও ব্যর্থ।

৫. আনন্দাম্বুধিবর্ধনম্

নামসংকীর্তন আনন্দসমুদ্রকে বর্ধিত করে। নদীর প্রবাহ দিবানিশি সমুদ্রে প্রবেশ করলেও সমুদ্র তাতে একটুও বিচলিত হয় না, কিন্তু আকাশে যখন পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়, তখন সমুদ্র বিশাল বিশাল তরঙ্গরাজিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে সমুদ্রতট প্লাবিত করে। তেমনি বিশ্বে আনন্দ লাভের বিভিন্ন উপায় থাকা সত্ত্বেও তা কখনো ভক্তের হৃদয়কে আন্দোলিত করতে পারে না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন ভক্তের আনন্দসিন্ধুকে অনন্ত তরঙ্গে আন্দোলিত করে।

৬. প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদানং

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদিত হয়। প্রতিপদে তো বটেই, প্রতি অক্ষরে পূর্ণামৃত লাভ হয়। নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায় নামীর সৌন্দর্য-মাধুর্যের অফুরন্ত আস্বাদন নামের মধ্যেই বিদ্যমান। যেমন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারতেন না– "জজ গগ জজ গগ গদ্‌গদ বচন।"

এখানে পূর্ণামৃত বলতে প্রেমানন্দকেই বোঝানো হয়েছে। এ বিশ্বে যেমন অমৃত অপেক্ষা সুস্বাদু বস্তু নেই, তেমনি চিন্ময় জগতে প্রেমের চেয়ে অধিক সুস্বাদু বস্তু নেই। জ্ঞানের চরম সাধ্যবস্তু ব্রহ্মানন্দও অপূর্ণ, কারণ তা আস্বাদনের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই। চরমে আস্বাদ্য, আস্বাদন এবং আস্বাদক সব এক হয়ে যায়। এ জন্য ব্রহ্মানন্দ অপূর্ণ। অপরপক্ষে প্রেমানন্দে ভগবানের সাথে ভক্তের এক অসাধারণ প্রেমের বিনিময় হয়ে থাকে, যা ভক্তকে প্রেমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত করে প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। প্রেমানন্দের এ সমুদ্রের কাছে ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদতুল্য (গরুর ক্ষুঁরের দ্বারা সৃষ্ট গর্ত)। প্রেমের উদয় হলে যখন নামকীর্তন চলতে থাকে, তখন তা শ্রবণ ও স্মরণে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিপদে কৃষ্ণস্ফূর্তি হয়। এভাবে প্রেম আস্বাদন হতে হতে যখন ভক্তের হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেই প্রেমপূর্ণ চিত্তে নামোচ্চারণ স্বয়ং কৃষ্ণকে পর্যন্ত আকর্ষণ করে।

৭. সর্বাত্মস্নপনং

সর্বাত্মস্নপনং বলতে বোঝায় নামসংকীর্তন সকলকে স্নাত করায় অর্থাৎ ভক্তের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা ভগবানের নামরূপ অমৃতসাগরে অবগাহন করে। জিহ্বার দ্বারা কোনো বস্তু আহার করার ফলে যেমন সকল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পুষ্টি সাধিত হয়, তেমনি নামসংকীর্তন দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ই আনন্দরসে নিমজ্জিত হয়। এ নাম গ্রহণের এমনই স্বভাব যে, আস্বাদনের সাথে সাথে বিপুল তৃষ্ণা ও পিপাসা উদিত হয়ে ততোধিক আস্বাদনের লালসা বৃদ্ধি করে। ভক্ত হৃদয়ের এমন অবস্থার বর্ণনা শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের বিদগ্ধমাধব নাটকে পরিলক্ষিত হয়–

তুণ্ডে তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্য স্পৃহাম ॥
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাংকৃতিং।
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতং কৃষ্ণেতি বর্ণাদ্বয়ী ॥

অর্থ : কৃষ্ণনাম জিহ্বায় উচ্চারিত হয়ে বহু বহু জিহ্বা লাভের বাসনা জাগায়, কর্ণকুহরে প্রবেশ করামাত্র অর্বুদসংখ্যক কর্ণ লাভের বাসনা জাগায়, চিত্তপ্রাঙ্গণে সঙ্গিনী হয়ে সর্বেন্দ্রিয়কে স্তিমিত করে দেয়! আহা, না জানি কত অমৃত দিয়ে এ 'কৃ' ও 'ষ্ণ' বর্ণ দুটি রচিত হয়েছে।

অনাদিকাল ধরে সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ জীবের দেহ, মন, প্রাণসহ সর্বেন্দ্রিয়ের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে পরমানন্দরসে আপ্লুত করতে পারে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামরস। এ সাত মহিমা নিয়ে নামসংকীর্তন স্বমহিমায় জয়যুক্ত হচ্ছেন। এ জন্য শ্লোকের শেষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনামের পরম বিজয় ঘোষণা করছেন।

দ্বিতীয় শ্লোক

নাম্নামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কাল।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

হে পরমেশ্বর ভগবান, তোমার নামই জীবের মঙ্গল বিধান করে। এ জন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' আদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ। সে নামে তুমি তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ এবং তা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র আদির কোনো বিচার করোনি। হে প্রভু, জীবের প্রতি এভাবে কৃপা করে তুমি তোমার নামকে সুলভ করেছ, তবুও আমার এমনই দুর্দৈব যে সে নাম গ্রহণ করার সময় আমি অপরাধ করি এবং তার ফলে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মায় না।

শ্রীনামসংকীর্তনের মহিমাসূচক প্রথম শ্লোকটি পাঠ করার পর ভক্তিজাত অতৃপ্ত ভাবের কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনে হলো 'নামের মধ্যে কৃষ্ণের কত করুণা নিহিত! কিন্তু হায়! আমি সেই নামরস আস্বাদনে বঞ্চিত, এমন কৃষ্ণনামেও আমার অনুরাগ জন্মায় না। প্রেমভক্তির চরমে অবস্থান করা সত্ত্বেও মহাপ্রভু একজন অনর্থযুক্ত সাধকের ভূমিকা নিয়ে শিক্ষাষ্টকের এ শ্লোকটি পাঠ করেছেন। শ্রীল কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥

ভগবান কেন বহুবিধ নাম বিস্তার করলেন? (নাম্নামকারী বহুধা)

সংস্কারানুসারে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥

রুচি ভিন্ন হওয়ার কারণে ভগবানের কোনো একটি নামে সকলের রুচি বা লোভ সমান নাও হতে পারে। তাই করুণাময় ভগবান অনন্ত অবতারে অনন্ত নাম প্রচার বা প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণ, নৃসিংহ, রাম, বামন ইত্যাদি নামের মধ্যে যার যে নাম প্রিয়, সে সেই নাম কীর্তন করে মঙ্গল লাভ করবে। অবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে যেমন অসংখ্য স্বরূপ অবতার প্রকাশিত হয়, তেমনি অসংখ্য নামরূপ অবতারও প্রকাশিত হয়। রূপ-গুণ ও লীলাভেদে ভগবানের নামেরও বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন :

* **অবতারসূচক নাম–** কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ ইত্যাদি।
* **গুণবাচক নাম–** সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু, দীনবন্ধু, করুণানিধি ইত্যাদি।
* **কার্যসূচক নাম–** গোবিন্দ, গিরিধারী, মধুসূদন, কালীয়দমন ইত্যাদি।

ভগবানের রাম, নৃসিংহ অবতারে যেরূপ শক্তির প্রকাশ, তাঁদের নামেও সেরূপ শক্তির প্রকাশ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভক্তগণ তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন বাঞ্ছা অনুসারে ভগবানের যে যে নাম কীর্তন করেন; সেসব নামের সবগুলোর মহিমা কি সমান?

কৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠত্ব

পরমব্রহ্ম হরির নাম তাঁর মতোই সচ্চিদানন্দময় এবং তাঁর সকল নামেই সর্বসিদ্ধি ঘটে থাকে। তাই মনে হতে পারে, ভগবানের সব নামই সমান। কিন্তু না, প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণনামের সর্বশ্রেষ্ঠত্বই সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত। সূত গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমে অন্যান্য অবতারের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে গণ্য করলেও পরে তিনি একমাত্র কৃষ্ণকেই সর্বঅবতারের অবতারী পরমেশ্বর বলে প্রতিপন্ন করেছেন, যথা :

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। *(ভা. ৩/৩/২৮)*

অর্থ : পূর্বোল্লিখিত অবতারগণ হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং।

'*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*' এ প্রমাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষত্ব হলো, তিনি পরমেশ্বর, তিনিই ভগবান স্বয়ং। তাই কৃষ্ণনামের একটি বিশেষত্ব আছে; তা হলো এটি স্বয়ং ভগবানের নাম। রাম, নৃসিংহাদির নাম ভগবানের নাম বটে, কিন্তু স্বয়ং ভগবানের নাম নয়। অনন্ত ভগবৎস্বরূপগণ হলেন অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণেরই অনন্ত রসবৈচিত্র্যের মূর্তরূপ। তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবস্থিত। "*একোহপি সন্ যো বহুধা বিভাতি।*' অর্থাৎ একই বিগ্রহে করেন নানাকার রূপ। তাঁরা সকলেই নিত্য এবং স্বরূপে পূর্ণ– "*সর্বে পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ ॥*" শক্তি প্রকাশের পার্থক্য অনুসারেই তাঁদের মধ্যে পার্থক্য। শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে শক্তির এক রকম বিকাশ, শ্রীনৃসিংহদেবের মধ্যে আরেক রকম বিকাশ। আবার শ্রীনারায়ণের আরেক রকম। কিন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সর্বশক্তির সর্বাতিশায়ী বিকাশ। অন্যান্য স্বরূপে শক্তির আংশিক বিকাশ; তাই অন্যান্য স্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলা বলা হয়।

নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায় রামস্বরূপ এবং রাম নাম অভিন্ন। উভয়ের মহিমাও একই। স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণেই সর্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ হওয়ায় তাঁর নামেও সমস্ত নাম-মহিমার পূর্ণতম বিকাশ এবং তা স্বয়ংনাম। স্বয়ং ভগবান

শ্রীকৃষ্ণে যেমন অপর সকল ভগবৎস্বরূপ অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেই যেমন অপর সকলের পূজা হয়ে যায়, তেমনি অপর সকল ভগবৎস্বরূপের নাম কৃষ্ণনামেই অবস্থিত, কৃষ্ণনাম উচ্চারণেই সকল ভগবৎস্বরূপের নামোচ্চারণ হয়ে যায় এবং একই সাথে সেসব নামের ফলও পাওয়া যায়। অর্থাৎ কৃষ্ণনাম অন্য সকল ভগবৎস্বরূপের নামের ফল দিতে সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের আরেকটি বিশেষত্ব হলো ভগবানের অনন্তরূপ থাকা সত্ত্বেও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই (মহাপ্রভু) যেমন প্রেম দান করতে পারেন, তেমনি ভগবানের অনন্ত নাম থাকলেও একমাত্র কৃষ্ণনামই প্রেম দিতে পারে। এ বিষয়ে পাদ্মোত্তর পাতালখণ্ডের এক প্রমাণে কৃষ্ণনামের যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তার সারমর্ম তুলে ধরা হলো : চিৎশক্তি থেকেই ভগবান এবং তাঁর নামের মহিমা উদ্ভূত। ভগবানের যত নাম আছে, তার মধ্যে তারক রামনাম এবং পারক কৃষ্ণনাম সার। রামনাম উচ্চারণের ফলে মুক্তিলাভ, কাশীবাস হয়; আর পারক কৃষ্ণনাম উচ্চারণের ফলে প্রেমভক্তি লাভ হয়। তাই যিনি কৃষ্ণনাম করেন, প্রেমবিহ্বল হয়ে কখনো অশ্রুপাত করেন, কখনো নৃত্য করেন, কখনো প্রেমানন্দে মূর্ছাপ্রাপ্ত হন, কখনো আবার কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন। (মথুরামাহাত্ম্য) এ কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বলা হয়েছে– "*মুক্তিহেতুক 'তারক' হয় রামনাম। / কৃষ্ণনাম 'পারক' করে প্রেমদান ॥*" (৩/৩/২৪৪)

কৃষ্ণনামই যে শ্রেষ্ঠ তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনকে বলেছেন– "*নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ। প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্*" অর্থাৎ হে পরন্তপ, আমার নামসমূহের মধ্যে কৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠ; তা অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এবং পরমমুক্তিকর (প্রেমপাপক)। (হ. ভ. বি. ১১/২৬৪) শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আরও উল্লেখ আছে (১১/২৬৭) যেখানে শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে বলছেন, "হে শম্ভো, আমি সত্য বলছি, আমার কৃষ্ণাখ্য নাম অতি গোপনীয়, একে নিশ্চিত মৃত্যুসঞ্জীবনী বলে জেনো।"

ভগবৎতত্ত্বের মৎস-কূর্মাদি অবতারের নাম অপেক্ষা শ্রীনৃসিংহনাম শ্রেষ্ঠ, নৃসিংহনাম অপেক্ষা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নাম শ্রেষ্ঠ। বৃহৎবিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বলা হয়েছে–

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ (৭২/৩৩৫)

অর্থ : **মহাদেব পার্বতীকে বললেন– "হে বরাননে, 'রাম' 'রাম' বলে মনোরম যে নাম, তাতে আমি রমণ (আনন্দ-লাভ) করি। এক রামনামই সহস্র বিষ্ণুনামের সমতুল্য।**

আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হয়েছে–

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥

অর্থ : **শ্রীবিষ্ণু পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করলে যে ফল হয়, মাত্র একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করলেই সে ফল লাভ হয়ে থাকে।** সুতরাং এক কৃষ্ণনাম তিন রামনামের সমান। শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে এক কথায় বলা হয়েছে–

"*সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য হয় এক রামনাম। / তিন রামনাম তুল্য এক কৃষ্ণনাম ॥*"

বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নাম সর্বমাধুর্যে পরিপূর্ণ হওয়ায় ভগবান বর প্রার্থনা করতে বললে নারদমুনি যে বর প্রার্থনা করেছিলেন, তা হলো, "হে ব্রজজনের প্রেমসরোবরে ক্রীড়াশীল রাজহংস, আমি যেন দেহগত সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হয়ে গোকুলরূপ ক্ষীরসমুদ্র থেকে উত্থিত গোপলীলা আদির দ্বারা বিকশিত আপনার সর্বশোভাযুক্ত মধুর নামামৃত পান করতে করতে উন্মত্তের মতো জগতের সকলকে আনন্দিত করে সর্বত্র বিচরণ করতে পারি।"

এ প্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ বলেছেন–

বিষ্ণু, নারায়ণ, নৃসিংহ, রাম, মথুরানন্দন, যাদবেন্দ্র ইত্যাদি নামের চেয়েও কৃষ্ণনাম অতীব মধুর। সেসব নামে নয়, কেবল কৃষ্ণনামের দ্বারাই ব্রজপ্রেম লাভ হয়। নামী ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণতেই যেমন সমস্ত অবতারগণ অবস্থান

করেন, তেমনি কৃষ্ণনামেও সমস্ত অবতারগণের নাম পর্যবসিত হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরহরিও কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানেননি–

প্রভু কহে কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণনাম বলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীগণ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের নামকেই মনে করবেন। শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেও তিনি কৃষ্ণনামেরই জয়গান গেয়েছেন, "*...পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥*"

মহৎকীর্তিত নামে ভগবান অধিক প্রীত হন

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবানের নামসমূহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আবির্ভূত। এ জন্য তা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবর্ধক। মহৎগণ তাই পরম আদরের সাথে ভগবানের সেসব নামই কীর্তন করে থাকেন। শুধু তা-ই নয়, সেসব নামের অনুকীর্তনও শ্রীকৃষ্ণের কাছে অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। মাতা পুত্রকে যে নামে ডাকে, তা পুত্রের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রীতিপ্রদ হয়। সে নামে অন্য কেউ তাকে ডাকলে সে খুব খুশি হয় এবং যে ডাকে তাকে নিজের প্রিয় বলে মনে করে। তদ্রূপ মহৎ-উচ্চারিত শ্রীনামসমূহ আবেশযুক্ত হয়ে কীর্তন করলে শ্রীকৃষ্ণ অতিসত্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়ে যান। কারণ মহৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন হওয়ায় মহৎকীর্তিত নামসমূহ তিনি যার মুখে শ্রবণ করেন, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। আর মাতা যশোদাসহ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের যত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ছিলেন, তাঁদের সবার কাছেই যে কৃষ্ণনামের প্রাধান্য ছিল, তা তো সর্বজনবিদিত।

হরিনামের মহিমা ও মূল্য বোঝা

যে কেউ হরিনাম উচ্চারণ করতে পারে, জানতে পারে, গাইতে পারে এমনকি জপও করতে পারে; কিন্তু এর মহিমা ও মূল্য সম্বন্ধে সবাই জানে না। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে–

এক শিষ্য গুরুদেবের কাছ থেকে হরিনাম দীক্ষা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দেখল, গঙ্গার ধারে কাপড় কাচায় ব্যস্ত ধোপা, জাল বুনতে বুনতে জেলে, এমনকি কিছু বালকও খেলাচ্ছলে এ হরিনাম গাইছে। এসব দেখে শিষ্য আবার গুরুদেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "গুরুদেব, আপনি আমাকে এ কেমন গুহ্যমন্ত্র দান করলেন, যা ধোপা, জেলে, এমনকি বালকেরা পর্যন্ত জানে?" গুরুদেব তার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে একটি মূল্যবান পাথর দিয়ে বললেন, "ঐ ধোপা, জেলে ও বালকদের কাছ থেকে তুমি এ পাথরটির মূল্য জেনে এসো।" শিষ্য একে একে ধোপা, জেলে ও বালকদের কাছে সেই মূল্যবান পাথরটি নিয়ে গেল। তা দেখে ধোপা বলল, "আমার কাছে এর মূল্য নেই বললেই চলে; তবে এটি কাপড় কাচার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।" জেলে বলল, "এর আবার মূল্য কী, তবে আমি একে আমার জাল ডোবানোর কাজে ব্যবহার করতে পারি।" বালকদেরও একই জবাব, "পাথরের আবার মূল্য! তবে এটি আমাদের খেলার উপকরণ হতে পারে।" গুরুদেব বললেন, "এ পাথরের মতো হরিনামের মহিমা ও মূল্য সম্পর্কেও তারা কেউ জানে না এবং গাইলেও প্রকৃতপক্ষে হরিনামকে তারা কেউই জানে না।"

(এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে হরিনামের মহিমাসূচক ১৬০ টি শাস্ত্রীয় শ্লোক উল্লেখ করা হয়েছে, পড়তে ভুলবেন না।)
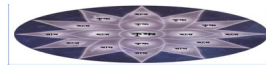
নামাপরাধ

যে নাম পূর্বকালে গ্রহণ করামাত্র ফল দান করত, সে নামই এখন বহুদিন ধরে গ্রহণ করার পরও প্রেমফল প্রদান করছে না; বরং দেহ ও গৃহের প্রতি অহম বা আমি-আমার বোধের বিস্তার হচ্ছে– এর কারণ, কলি কর্তৃক নামাপরাধ সঞ্চার, নামগ্রহণকারীর উপেক্ষা এবং নামদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের নিরপরাধে নাম গ্রহণের নির্দেশের প্রতি অনাদর। নিখিল অপরাধের মধ্যে নামাপরাধই সবচেয়ে ভয়ানক অপরাধ। পারমার্থিক অন্যান্য সাধনা নিজের শক্তি অনুযায়ী ফল প্রদানে সক্ষম হলেও নামাপরাধ হলে কোনো সাধনারই কোনো সার্থকতা থাকে না। নামের প্রকৃত স্বরূপ ও পরম অদ্ভুত শক্তি উপলব্ধি করতে না পারার একমাত্র কারণ নামাপরাধ। কলিযুগের জীবমাত্রই যেহেতু নামাপরাধী, তাই ভগবানের নাম ব্যতীত "*কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নস্ত্যেব গতিরন্যথা।*"

নামাপরাধ কী?

অপরাধ শব্দের অর্থ হলো যা থেকে 'রাধ' বা প্রসন্নতা অপগত হয়েছে। 'অপ' উপসর্গের অর্থ অপগত, বিরোধী, বিহীন বা ত্যাগ করা এবং 'রাধ' শব্দের অর্থ সফলতা, সমৃদ্ধি, প্রীতি বা প্রসন্নতা। সুতরাং নামাপরাধের অর্থ হলো নামের অপ্রসন্নতা, শ্রীনামকে অবজ্ঞা করে শ্রীনামের অসন্তোষ উৎপাদন করা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর শ্রীমাধুর্যকাদম্বিনী গ্রন্থে (৩/৫) উল্লেখ করেছেন, "*অপ্রসন্নেন তেন স্বশক্তিঃ সম্যক্ ন প্রকাশ্যতে।*" অর্থাৎ শ্রীনাম প্রভু অপ্রসন্ন হলে তার নিজ শক্তি প্রকাশ করেন না। যেহেতু শ্রীনাম পূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অর্থাৎ ভূমা জ্ঞানময় (সর্বজ্ঞ), কোনো জড়বস্তু নয়; তাই সর্বসমর্থ শ্রীনাম তাঁর আশ্রিত জীবসমূহের চিত্তবৃত্তি ও দুর্বাসনাদির গতিবিধি বিচার করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। বিশেষ করে যুগধর্ম হরিনাম, এ যুগের সবার অভিভাবক হওয়ায় কারো ঐকান্তিকতার অভাব হলে অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের অব্যর্থ মহিমা প্রকাশে বিরত থাকেন। জীবের যে আচরণ পরমকরুণ শ্রীনামের এ অসন্তোষ সৃষ্টি করে, তা-ই নামাপরাধ। বিজ্ঞানময় ও সর্বজ্ঞ শ্রীনামের এমন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মহিমাসমূহ ব্যক্তিত্বহীন প্রাকৃত জড়বস্তুর গুণের মতো সবক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় না– এটাই চিৎবস্তুর বৈশিষ্ট্য।

বৈষ্ণবগণ অপরাধ শব্দটির আরো একটি ব্যঞ্জনার্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, অপরাধ শব্দে ভগবানের আনন্দদায়িকা শক্তি রাধাবিহীন বা রাধার বিরোধিতাকে বোঝায়। সেজন্য নামাপরাধযুক্ত নামগ্রহণ হলো সবচেয়ে নিম্নমানের জপ-কীর্তন। কৃষ্ণনামের প্রতি অপরাধ মানে শ্রীরাধার চরণেও অপরাধ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দায়িনী শক্তি এবং প্রেমানুরাগ ও কৃষ্ণ-আরাধনার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তির প্রকাশ। জৈবধর্ম নামক গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দু'ধরনের অপরাধের উল্লেখ করেছেন, যথা : মুখ্য ও গৌণ। যদি গৌণ অপরাধ হয়, তবে নামাভাস হয় এবং কিছুকাল পরে ফল দান করে। কিন্তু যদি মুখ্য অপরাধ হয় তবে নামাপরাধ হয়, যা নিরন্তর হরিনাম গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল অপগত হতে পারে।

পাপ এবং অপরাধ

অধর্ম বা কলুষকেই পাপ বলে। সাধারণ জীবের প্রতি অনাদর, অবজ্ঞা ও হিংসার কারণে তাদের অনিষ্ট সাধনের মাধ্যমে পাপ হয়ে থাকে। পাপের ফলে জীবকে নরকযন্ত্রণাসহ বিভিন্ন ধরনের ক্লেশ ভোগ করতে হয়। আর অপরাধ হলো ভগবান এবং ভগবান সম্বন্ধীয় বস্তুর প্রতি অনাদর বা অবজ্ঞা করা। ভগবান সম্বন্ধীয় বস্তু হলো, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা, ভগবদ্ভক্ত, শ্রীতুলসী, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীগঙ্গা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাপ্রসাদ ইত্যাদি। অপরাধের কারণে

জীবের ভক্তি লাভ হয় না, যাতনাতো হয়ই, সাথে সাথে জীবের জড়বন্ধন দৃঢ় হয়ে অধোগতিও হয়। সংসারবন্ধন আরও দৃঢ় হয়। ব্রত, দান, তপস্যা, ধ্যান ইত্যাদি পুণ্যকর্মের দ্বারা পাপ নাশ হয়; কিন্তু যার চরণে অপরাধ হয়, তিনি ক্ষমা না করা পর্যন্ত অপরাধের নিবৃত্তি হয় না আর আছে একমাত্র সহায় শ্রীহরিনাম।

নামাপরাধ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ

শ্রীমন্মহাপ্রভুই সর্বপ্রথম জগৎবাসীকে নামাপরাধ সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। পদ্মপুরাণসহ অন্যান্য শাস্ত্রে নামাপরাধ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা থাকলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্বে কোনো আচার্য তা লোকচক্ষুর সামনে আনেননি। তিনিই প্রথম নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করার উপদেশ দেন :

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ– নববিধা ভক্তি। / কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্তন। / নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥”

(চৈ. অন্ত. ৪/৬৫–৬৬)

শ্রীবল্লভ ভট্টকে শিক্ষাদানের সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন :

অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসংকীর্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥

(শ্রীচৈ. চ. অন্ত. ৭/১২১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরিউক্ত উপদেশ থেকে জানা যায় যে, হরিনাম সংকীর্তন সাধনশ্রেষ্ঠ হলেও নামাপরাধ তার ঘোর প্রতিবন্ধক। অতএব, প্রেমলাভেচ্ছু সাধক যত্নপূর্বক নামাপরাধ বর্জন করে নিরন্তর হরিনাম সংকীর্তন করলে নিশ্চিত প্রেমলাভ করতে পারবেন।

নামাপরাধ সম্বন্ধে কিছু কথা

নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করার ফলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। শুদ্ধ প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য অবশ্যই জড়বাসনামুক্ত হয়ে হরিনাম কীর্তন করতে হয়। যদি শুদ্ধ প্রেমের কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত না হয় অথবা অত্যন্ত মন্থর গতিতে হয়, তবে বুঝতে হবে যে অবশ্যই নামাপরাধ হচ্ছে। নামাপরাধের ফলে আমরা ভগবৎসেবার রুচি হারিয়ে ফেলি। শ্রবণ-কীর্তনাদিতে কোনো ধরনের আনন্দ পাই না। আমাদের অবস্থা হয় প্রবল জ্বরে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির ন্যায়। যাকে অনেক সুস্বাদু খাবার খেতে দিলেও তার পক্ষে তা আহার করা সম্ভব হয় না। কারণ সে তার রুচি হারিয়ে ফেলেছে, মুখ তার বিষাদে ভরে গেছে। তবে সঠিক ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে তার রুচি ফিরে পায় এবং তারপরই তার পক্ষে আহার্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়। একইভাবে ভক্তও দীর্ঘকাল নিরন্তর নামভজনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে নামাপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে হরিনামে রুচি ফিরে পেতে পারেন।

দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীমদ্ভাগবতের ৭/৫/২৩-২৪ শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন :

এই হরিনাম কীর্তনের বিষয়ে পদ্মপুরাণোক্ত দশবিধ নামাপরাধ অবশ্যই পরিত্যাজ্য; সনৎকুমারের বাক্যে তা উক্ত হয়েছে– “সকল অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিও শ্রীহরির আশ্রিত হলে মুক্ত হয়। যে দ্বিপদ মানবাধম এমন শ্রীহরির প্রতিও অপরাধ করে, সে ব্যক্তিরও যদি কখনো হরিনামাশ্রয় ঘটে, তবে সে শ্রীনাম বলেই ভীষণ সেই অপরাধ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু সর্বজীবের সুহৃদ শ্রীনামের প্রতি অপরাধ হলে অপরাধী নিশ্চয়ই অধঃপতিত হয়।

সংক্ষেপে অপরাধের বিষয়গুলো এখানে লেখা হলো : **(১) সাধুগণের নিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণু থেকে শিব নামাদির স্বাতন্ত্র্যচিন্তন, অর্থাৎ বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলায় মায়িক ভেদ না থাকায় শিবাদি সকল দেবতা যে বিষ্ণুরই অধীন তা বিস্মৃত হয়ে শিবাদি দেবতার ন্যায় নিত্যমঙ্গলময় বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিও পরস্পর ভিন্ন– এরূপ চিন্তন, (৩) গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দন, (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যে অন্য প্রকার অর্থকল্পন বা শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে প্রশংসাবাক্য বলে চিন্তন, (৬) শ্রীনামের মাহাত্ম্যে অন্য প্রকার অর্থ কল্পন, (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) অন্য শুভ ক্রিয়াসমূহের সঙ্গে শ্রীনামকে সমজ্ঞান, (৯) শ্রদ্ধাহীন বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নাম-গুণ শ্রবণে অনিচ্ছুক বা বিমুখ ব্যক্তির নিকট নামোপদেশ এবং (১০) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শুনেও শ্রীনামের প্রতি অপ্রীতি**। এসব অপরাধের যে অন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই, তা-ও সেখানে বলা হয়েছে। যথা : "যারা শ্রীনামের নিকট অপরাধী (পুনরায় স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ করার বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থেকে অপ্রমত্ত অবস্থায়), নিরন্তর গৃহীত নামই তাদের সেসব অপরাধ হরণ করে থাকে। অবিশ্রান্তভাবে শ্রীনাম গ্রহণ করার ফলেই তাদের অভীষ্ট-সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ক্রমশ নিরন্তর নামোভাসের ফলে অনর্থনিবৃত্তি এবং তারপর শুদ্ধনাম উদয়ের ফলে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়।
অপরাধ থাকলেও ভগবানের সন্তোষ বিধানে সর্বদা নামকীর্তন করা কর্তব্য। একমাত্র শ্রীনামই যে 'নামাপরাধ' ক্ষমা করতে পারেন, তা শ্রীঅম্বরীষাদি চরিতেও দেখা গিয়েছে।

দশবিধ নামাপরাধ

পদ্মপুরাণ অনুসারে নামাপরাধ দশবিধ : (শ্রীপদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড ৪৮/৪৭-৫০; শ্রীনারদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসনৎকুমার বলেছেন :

১. "সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধংবিতনুতে,
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্‌বিগরিহাম্।
২. শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং,
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥
৩. গুরোরবজ্ঞা ৪. শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দসমং, ৬. তথার্থবাদো ৫. হরিনাম্নি কল্পনম্।
৭. নাম্নো বলাদ্‌যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥
৮. ধর্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
৯. অশ্রদ্দধানে বিমুখেহপ্যশৃন্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥
১০. শ্রুতেহপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতহধমঃ।
অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোহপ্যপরাধকৃৎ ॥"

নিচে এই শ্লোকের প্রচলিত অর্থ তুলে ধরা হলো :

১. যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের দিব্যনাম প্রচারের জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নিন্দা করা।
২. শিব-ব্রহ্মা আদি দেবতাদের নাম ভগবানের নামের সমান বা তা থেকে স্বতন্ত্র মনে করা।
৩. শ্রীগুরুদেবকে অবজ্ঞা করা।
৪. বৈদিক শাস্ত্র বা বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা।

৫. হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাহাত্ম্যকে কাল্পনিক বলে মনে করা।
৬. ভগবানের নামে অর্থবাদ আরোপ বা এর মাহাত্ম্যকে অতি স্তুতি বলে মনে করা।
৭. নামবলে পাপ আচরণ করা।
৮. হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করাকে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বর্ণিত পুণ্যকর্ম বলে মনে করা।
৯. শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্যনামের মহিমা সম্পর্কে উপদেশ দান করা।
১০. ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণবিশ্বাস না থাকা এবং এর অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরেও বিষয়াসক্তি বজায় রাখা।

নামাপরাধের ফল

সূর্যোদয়ে আলোকের বিকাশ অনিবার্য হলেও কেবল মেঘসঞ্চার ব্যতীত যেমন অন্য কোনো কারণেই তা ব্যাহত হয় না, তেমনি হরিনাম গ্রহণের ফলে ক্রমে ভক্তি এবং পরিশেষে প্রেম উদয়ের লক্ষণ অনিবার্য হলেও কেবল 'নামাপরাধ', অর্থাৎ শ্রীনামের অন্তরে অপ্রসন্নতারূপ মেঘসঞ্চার ব্যতীত অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে না। নামাপরাধের ফলে ভক্তি অনুশীলনে রুচি নষ্ট হয়ে যায়, অনাগ্রহ আসে। ভক্ত তখন শ্রবণ-কীর্তন, সাধুসঙ্গ এবং গুরুসেবা করে কোনো আনন্দ পায় না। কৃষ্ণভক্তির জগৎ তখন নীরস, রোগাক্রান্ত ও বিস্বাদ মনে হয়। ঠিক জ্বরাক্রান্ত মানুষের রুচি কমে যাওয়ার মতো। অনেক সময় দেখা যায় যে, সাধক লোক হিসেবে খুব ভালো অথচ তার ভক্তি অনুশীলনের কোনো ফল দেখা যাচ্ছে না। এ স্থলে নিশ্চিত তার কোনো না কোনো নামাপরাধ আছে বুঝতে হবে। কেবল নামাপরাধ স্পর্শ না করে কোনো ব্যক্তি যদি লৌকিক সমস্ত পাপও করে থাকে, তবু একবার মাত্র কৃষ্ণনামে, এমনকি নামাভাসেও তার সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হবে, তাতে সন্দেহ নেই (*একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে। জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে ॥*)। কিন্তু নামাপরাধ থাকলে অশ্রদ্ধা, কুটিলতা, জড় অভিনিবেশ, ভজনশৈথিল্য ও দম্ভ– এ লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

অশ্রদ্ধা

ভগবৎবিষয়ক দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেও তার প্রতি সংশয় ও অবিশ্বাস। যেমন দুর্যোধন। সে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে জেনেও তাঁর প্রতি আদর বা প্রীতিহীন ছিল। সাধুর মুখে শ্রীহরিনামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করেও তাতে বিশ্বাসের অভাবও অপরাধের ফল।

কুটিলতা

গুরুদেব, বৈষ্ণব ও ভগবানের প্রতি অন্তরে অনাদর করে বাইরে তাঁদের পূজার আড়ম্বরকে কুটিলতা বলা হয়। এটি না থাকলে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সঙ্গ বা সেবার আভাসেই মঙ্গল হয়ে থাকে। কুটিলতা ভক্তি লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। মূর্খ কিন্তু অকুটিলের প্রতিই সাধু ও ভগবানের কৃপার আধিক্য দেখা যায়।

জড় অভিনিবেশ

এর অর্থ হলো দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, অর্থাৎ ভগবৎবহির্মুখ (দেহ ও দেহ সম্পর্কিত) বস্তুর প্রতি আসক্তি। তা ভক্তিকে ধ্বংস না করলেও ভক্তি অনুশীলনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। সিদ্ধিলাভের ঠিক পূর্বেও যদি দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হয়, তবে কষায় (বাসনা) উপস্থিত হয়ে ভক্তি অনুশীলনে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন : মূর্ছিত-কষায় ভরত মহারাজ। তিনি ভজন করতে করতে দৈবাৎ হরিণশিশুর প্রতি মনোনিবেশ করায় সিদ্ধিলাভে তাঁর কিছু বিলম্ব হয়েছিল। অবশ্য এতে তাঁর ভক্তি নষ্ট হয়নি।

ভজনশৈথিল্য

জড়সুখ কামনা করে তা পাওয়া না গেলে দুঃখ লাভ হয়। এ দুঃখ ভক্তি অনুশীলনে শৈথিল্য আনে। আবার প্রার্থিত

সুখলাভ হলেও তাতে উল্লসিত হওয়ার কারণে ভক্তি অনুশীলনে বাধা সৃষ্টি হয়। এ জন্য ভগবন্নিষ্ঠ সাধক জড়-জাগতিক সুখ-দুঃখে বিহ্বল না হয়ে অনাসক্তভাবে কেবল পরমার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই দেহযাত্রা নির্বাহ করেন; অতি ভোগ বা অতি বৈরাগ্য করেন না। ভক্তি অনুশীলন করেও যদি জড়-জাগতিক সুখ-দুঃখে বিহ্বলতা দেখা যায়, তবে অপরাধ আছে বুঝতে হবে।

দম্ভ

নিজের খুব ভক্তি হচ্ছে বলে অভিমান বা অহঙ্কারই দম্ভের নিদর্শন। নিজ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা কিংবা এতে কেউ সম্মত না হলে তার প্রতি ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ও নিন্দা করার প্রবৃত্তি হৃদয়ে উৎপন্ন হলে নিশ্চিত পূর্ব অপরাধ আছে বলে বুঝতে হবে। আবার কোনো বৈষ্ণব এ তা সমর্থন না করলে তাঁর প্রতিও দ্বেষভাব হওয়ার ফলে বৈষ্ণবাপরাধ হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

পূর্ব অপরাধ থাকলেই উপরিউক্ত লক্ষণগুলো দেখা যায়। এ জন্য এদের অপরাধের ফল বলা যাবে। অপরাধ থাকলে ভক্তি অনুশীলন করলেও ফলোদয় হয় না।

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ *(পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৪৮-৪৯)*

অর্থ : হরিনামের প্রতি অপরাধকারীদেরও হরিনাম জপের বিধান দেওয়া হয়েছে; কারণ জপ চালিয়ে গেলে ধীরে ধীরে তারা নিরপরাধে জপ করতে পারবে। শুরুতে অপরাধ হলেও বারবার জপ করার মাধ্যমেই সে অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

ভক্তি, কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণভক্তগণের অনুকম্পার মাধ্যমেই নামাপরাধী নামাপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই নিষ্ঠাভরে এঁদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

নামাপরাধের সুফল

পঞ্চবিধ পাপ (যেমন গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি) কোটিগুণ বৃদ্ধি করলেও নামাপরাধের তুল্য হয় না। এ থেকে নামাপরাধের মারাত্মক ফল সম্বন্ধে সহজেই বোঝা যায়। নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করে নামোচ্চারণ করে, নাম তাকে সেরূপ ফলই দিয়ে থাকেন। ব্রহ্মা ও শিবের পদসহ জড়-জাগতিক সর্বোচ্চ ফলও অপরাধযুক্ত নামের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কখনোই প্রেমফল লাভ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধের ফলও নামগ্রহণকারীকে ভোগ করতে হয়। নামাপরাধী শঠতা সহকারে যে নাম করে, তার ফল এরূপ–

অনেক সময় নামাপরাধী শঠতা সহকারে নাম উচ্চারণ করে, সেই নামের ফলে তার সুকৃতি হয়, ক্রমে ক্রমে সেই সুকৃতি পুষ্ট হলে শুদ্ধ নামপরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয়; তখন নামাপরাধী অবিশ্রান্তভাবে নাম গ্রহণ করলে নামাপরাধ থেকে মুক্তি লাভ করে।
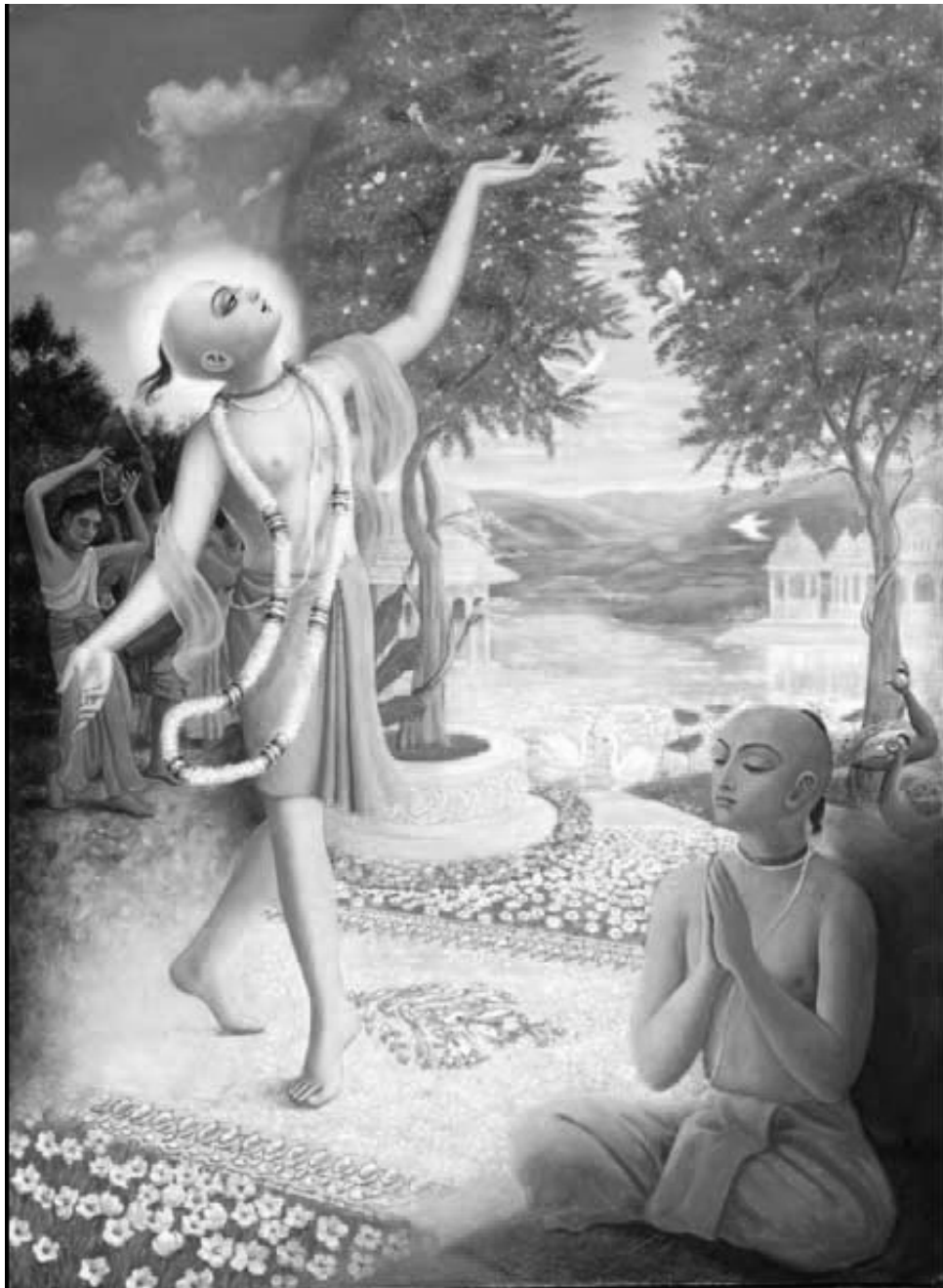
প্রথম নামাপরাধ

সাধুনিন্দা

সতাং নিন্দানাম্নঃ পরমাপরাধ বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্ ॥

“যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের দিব্য নাম প্রচার করার জন্য নিজেদের সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নিন্দা করা।”

দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে সর্বপ্রধান হওয়ায় এ অপরাধকে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেইসাথে এও বিবেচ্য যে, সাধুনিন্দাই যখন সর্বপ্রধান অপরাধ, তখন সেই সাধুর প্রতি দ্বেষ-দ্রোহে যে কী পরিমাণ অপরাধ হতে পারে, সে কথা বলা বাহুল্য। মহাত্মা বিদুরের প্রতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সশ্রদ্ধ উক্তি থেকে জানা যায়–

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতা স্বয়ং বিভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থাণি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥

অর্থ : হে বিভো, ভবাদৃশ ভাগবৎগণ স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ। বিশেষ করে স্বীয় হৃদয়ে গদাধর শ্রীহরি অবস্থান করায়, আপনারা তীর্থসমূহকেও পবিত্র করে থাকেন। অর্থাৎ তীর্থস্বরূপ আপনাদের নিজ প্রয়োজনে তীর্থভ্রমণ নয়, সংসারী মানুষের সংসর্গে মলিন তীর্থসমূহকে পুনরায় পবিত্রতা দান করার জন্যই আপনাদের তীর্থভ্রমণ।

সাধু নিন্দায় নামাপরাধ হয় কেন?

“*তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, / গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ।*” বৈষ্ণবের হৃদয়ে সর্বদাই নামী শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ বিরাজ করেন। এ জগতে নাম ও নামীর মাহাত্ম্য প্রচার করেন এই সাধু-বৈষ্ণবগণই। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম অভিন্ন হওয়ায়, নাম গ্রহণ ও স্মরণের মাধ্যমে সাধুগণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা ধারণ করেন। নাম ও নামী যে অভিন্ন, তা প্রমাণের জন্য দুটি দৃষ্টান্ত : হনুমানজি একবার প্রভু রামের নামজপ শুনতে পেয়ে উদগ্রীব হয়ে খুঁজতে লাগলেন– কে রামনাম জপ করছে। খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি মলত্যাগ করতে করতে রামনাম করছে! এমন অপবিত্র অবস্থায় রামনাম গ্রহণ করতে দেখে রেগে গিয়ে তিনি তাকে এক চড় বসিয়ে দিলেন। তারপর প্রভু রামের কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন তিনি মুখ ভার করে বসে আছেন। হনুমানজি প্রভুকে ওভাবে বসে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে প্রভু রামচন্দ্র বললেন– ‘আমার নাম আর আমি অভিন্ন। যেভাবেই হোক না কেন, সেই ব্যক্তি যখন আমার নাম করছিল, তখন স্বয়ং আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু তুমি তা না বুঝেই তার গালে চড় বসিয়ে দিলে!” হনুমানজি তা শুনে আঁতকে উঠলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, হরিনাম করার অপরাধে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ বাজারে প্রহার করা হলে নিরন্তর নামগ্রহণকারী হরিদাস ঠাকুরের প্রত্যেকটি প্রহার নামী মহাপ্রভু স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন; কারণ তাঁর নাম আর তিনি তো অভিন্ন।

তদুপরি সাধুগণই ভগবান ও তাঁর নামের মহিমা সারা জগতে প্রকাশ ও প্রচার করে থাকেন। এমন সাধুগণের নিন্দা ভগবানের অভিন্নস্বরূপ শ্রীনাম কীভাবে সহ্য করতে পারেন? এ কারণেই এ অপরাধকে সকল নামাপরাধের শীর্ষে স্থান দিয়ে একে মহাপরাধ বলেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তবে যারা নশ্বর জড় দেহকে আত্মা বলে মনে

করে, যাদের অনেক অনর্থ, তারা কখনোই সাধুকে চিনতে পারে না। যে পর্যন্ত অনর্থ-স্পৃহা প্রবল থাকে, সে পর্যন্ত সাধু চেনা যায় না। হরিনামের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং ভজনের সাথে সাথে ক্রমেই ভক্তিলতাটি বাড়তে থাকে। ভক্তিলতার সেবা করার সময় যদি কোনো বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়, তবে ভক্তিলতার পাতা শুকিয়ে যায়। এ জন্য এ অপরাধকে মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা মুহূর্তের মধ্যে ভক্তের ভক্তিলতাকে তছনছ করে দিতে পারে–

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপারে বা ছিণ্ডে লতা, শুকি যায় পাতা ॥ *(চৈ. চ. ২/১৯/১৩৩)*

সাধু কে?

প্রথমেই জানতে হবে সাধু কে? দাড়ি-গোফ কিংবা বেশ দেখেই কি সাধু চেনা যায়? না। সাধুকে চেনার জন্য তাঁর গুণ বা লক্ষণ সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। সাধুর গুণ বা লক্ষণ দুই প্রকার; যথা : স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণই প্রধান লক্ষণ, তার আশ্রয়েই তটস্থ লক্ষণসমূহ উদিত হয়।

কৃষ্ণৈকশরণ হয় স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে অন্য গুণের গণন ॥

– শ্রীহরিনামচিন্তামণি

সাধুর প্রধান বা স্বরূপ লক্ষণ হলো তিনি **কৃষ্ণৈকশরণ,** অর্থাৎ সর্বতোভাবে তিনি কৃষ্ণের শরণাগত। কৃষ্ণের শরণাগত ব্যক্তি যে-ই হোন না কেন, তাঁকে সাধু বলে জানতে হবে (এমনকি দুরাচারী হলেও)। কৃষ্ণের প্রতি শরণাগত ভক্তের মধ্যে তটস্থ বা অন্য গুণসমূহ এমনিতেই প্রকাশিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেসব গুণের উল্লেখ করেছেন :
"(১) কৃপালু, (২) অকৃতদ্রোহ, (৩) সত্যসার, (৪) সমদর্শী, (৫) নির্দোষ, (৬) বদান্য, (৭) মৃদু, (৮) শুচি, (৯) অকিঞ্চন, (১০) সকলের উপকারক, (১১) শান্ত, (১২) কৃষ্ণৈকশরণ (স্বরূপগুণ), (১৩) অকাম, (১৪) নিরীহ, (১৫) স্থির, (১৬) বিজিত ষড়্‌গুণ, (১৭) মিতভুক, (১৮) অপ্রমত্ত, (১৯) মানদ, (২০) অমানী, (২১) গম্ভীর, (২২) করুণ, (২৩) মৈত্র, (২৪) কবি, (২৫) দক্ষ, (২৬) মৌনী।"

"অনন্য কৃষ্ণৈকশরণই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। সে লক্ষণ যাঁর হয়, তাঁর তটস্থ লক্ষণগুলো অবশ্যই হবে। কিন্তু কোনো অনন্য কৃষ্ণৈকশরণ ব্যক্তির যদি কোনো অংশে তটস্থ লক্ষণ পূর্ণরূপে উদিত না হওয়ায় দুরাচার লক্ষিত হয়, তবুও তিনি সাধু।"

– শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

স্বল্পাক্ষরে সাধু নির্ণয়

যে বলিবে আমি দীন, কৃষ্ণৈকশরণ। / কৃষ্ণনাম যাঁর মুখে সাধু সেই জন ॥
তৃণ হৈতে হীন বলি আপনাকে জানে। / সহিষ্ণু তরুর ন্যায় আপনাকে মানে ॥
নিজেত অমানী আর সকলে মানদ। / তাঁর মুখে কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরতিপ্রদ ॥

(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

সাধু নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম। / সেই ত বৈষ্ণব তাঁরে করহ সম্মান ॥ *(চৈ.চ. ৫/১১১)*
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। / সেই সে বৈষ্ণব, ভজ তাঁহার চরণে ॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। / তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান ॥" (চৈ.চ.১৬/৭২-৭৫)

সুতরাং কৃষ্ণনাম গ্রহণই সাধুর মুখ্য বৈশিষ্ট্য, হরিনাম গ্রহণের ওপরই সাধুর সাধুত্ব, বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা নির্ধারিত হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণনাম গ্রহণের ওপর ভিত্তি করেই সাধুবৈষ্ণবের প্রকারভেদ করেছেন।

বৈষ্ণবের চার ধরনের দোষ ধরা অপরাধ

(১) **জাতি-দোষ :** বৈষ্ণবের জাত বা সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে নিন্দা বা সমালোচনা।
(২) **কদাচিতক দোষ :** বৈষ্ণবের প্রমাদবশত, অনিচ্ছাকৃত দোষ।
(৩) **নষ্টপ্রায় অবশিষ্ট দোষ :** প্রায় নষ্ট হয়েছে এমন দোষ।
(৪) **পূর্ব-দোষ :** বৈষ্ণবের পূর্বাচরিত কোনো দোষ।

* যিনি শুদ্ধ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব। উক্ত চার প্রকার দোষ তাঁর মধ্যে কদাচিৎ দেখা যেতে পারে; কিন্তু অন্য কোনো দোষের সম্ভাবনা নেই। সৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত যেকোনো জীবের দোষ আলোচনা করা উচিত নয়। বৈষ্ণব-নিন্দা অপরাধ আর অন্য জীবনিন্দা পাপ। বৈষ্ণবের পাপেও রুচি হয় না। তবে তিন প্রকার সৎ-উদ্দেশ্যে ব্যক্তির দোষ আলোচনা (সমালোচনা নয়) শাস্ত্রে নিন্দিত হয়নি; যথা :

১. দোষী ব্যক্তির কল্যাণের উদ্দেশ্যে,
২. জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং
৩. নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য।

তিন ধরনের বৈষ্ণবের সাথে আচরণ

(১) **উত্তম অধিকারী বৈষ্ণব :** উত্তম বৈষ্ণব সর্বত্র কৃষ্ণদর্শন করেন এবং জানেন যে, সবকিছু কৃষ্ণে অবস্থিত। তিনি সর্বতোভাবে হরিনামের আশ্রয়ে থাকেন এবং তাতে অমৃত আস্বাদন করেন। এ ধরনের বৈষ্ণবের সেবা এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

(২) **মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণব :** তিনি সাধুসঙ্গের গুরুত্ব বোঝেন এবং সর্বদা ভক্তসঙ্গ লাভের প্রয়াস করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব এবং জীবের নিত্য দাসত্ব সম্বন্ধে অবগত। তিনি অজ্ঞদের প্রতি করুণা করেন এবং ভগবৎবিরোধী ও নাস্তিকদের পরিত্যাগ করেন। এ ধরনের ভক্তের সঙ্গ করা উচিত।

(৩) **কনিষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণব :** তিনি বৈষ্ণবাভাস বা বৈষ্ণবপ্রায়, যার বিশ্বাস সুদৃঢ় নয়। ভগবানের বিগ্রহসেবা করলেও বৈষবসেবায় নিয়োজিত নন। এ ধরনের বৈষ্ণব নামাভাসের স্তরে অবস্থিত এবং তাদের মনে মনে প্রণাম জানানো উচিত।

সাধুসঙ্গের গুরুত্ব

সাধু ব্যক্তির কৃপা ব্যতীত জীবের মোহ দূরীভূত হওয়ার এবং স্বরূপজ্ঞান লাভ করে ভক্তি সাধনে সমর্থ হওয়ার কোনো উপায় নেই। সামান্য কিছু শিখতে হলেও তো সৎসঙ্গ, সৎ আদর্শ ও সদুপদেশ প্রয়োজন হয়। সৎ আদর্শকে নিজের চোখের সামনে সর্বদা স্থাপনপূর্বক নিত্যস্বরূপ লাভে ভক্তি-শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সাধুগণ এ সংসারে থেকে সংসারী জীবদের প্রতি করুণাবশত আদর্শ চরিত্র ও বাক্যের মাধ্যমে জীবের মোহনিদ্রা নাশপূর্বক ভক্তিশিক্ষা দেওয়ার প্রয়াস করেন। আর ভক্তি স্বয়ং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তিসহ কেবল ভক্তের হৃদয়েই প্রকাশিত হন। সুতরাং নিজের প্রকৃত কল্যাণকামী জীবের সর্বদা সাধুসঙ্গ করা উচিত।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। / ভক্তিফল ‘প্রেম’ হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়। / কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥”

(চৈ. চ. মধ্য ২২/৩১-৩২)

এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "সম্পূর্ণ জড়কলুষমুক্ত আচার্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যে কেউ তাঁদের সঙ্গ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আচার্যদের নির্দেশ অনুসরণ করলে সর্বদাই জড়কলুষ থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং এভাবে জীবন সফল করে পরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।"

ভক্তি লাভের জন্য সহায়ক তিনটি বিষয় হলো (১) **ভক্তোচ্ছিষ্ট,** (২) **ভক্তপদ-জল** এবং (৩) **ভক্তপদ-ধূলি,** যা ভক্তগণের সাক্ষাৎ সঙ্গের মাধ্যমে লাভ করা যায়। কেউ যদি এ তিনটি বস্তুকে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সাথে হৃদয়ে ধারণ করেন, তবে অবশ্যই ভক্তি তার হৃদয়ে প্রকাশিত হবেন।

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। / ভক্তভুক্ত-অবশেষ– তিন মহাবল ॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। / পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥
তাতে বার বার কহি– শুন ভক্তগণ। / বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন সেবন ॥

(চৈ. চ. অন্ত. ৬০-৬২)

বৈষ্ণব অপরাধের কারণ

বৈষ্ণব অপরাধের প্রধান কারণ অসৎসঙ্গ। বিষয়াসক্ত মানুষের সঙ্গের প্রভাবে চিত্ত কলুষিত হওয়ায় ভক্তদের প্রতি ঈর্ষা বা মাৎসর্যের উদয় হয়। জড়বুদ্ধিতে বিচার করায় তাঁদের দোষ-ত্রুটি চোখে পড়ে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করে বলেছেন–

অসৎসঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ *(চৈ. চ. মধ্য ২২/৮৭)*

অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি আসক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিহীন (কৃষ্ণ-অভক্ত) ব্যক্তিরাই অসাধু। এদের সঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণব আচার।

স্ত্রী-সঙ্গী : ইন্দ্রিয় তর্পণের মানসিকতা নিয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গ করা (স্ত্রীদের ক্ষেত্রে কামুক পুরুষের সঙ্গ করা)। যারা স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এমন স্ত্রী-সঙ্গীদেরও সঙ্গ করা উচিত নয়।

কৃষ্ণাভক্ত (কৃষ্ণ+অভক্ত) চার ধরনের; যথা :

(১) **মায়াবাদী–** যারা নিজেদের ভগবান বলে মনে করে পরিণামে ব্রহ্মরূপ ভগবানের সাথে এক বা লীন হয়ে যেতে চায়। ভগবানের রূপকে অস্বীকার করায় এরা ভগবানের চরণে অপরাধী।
(২) **নাস্তিক–** এরা মনে করে ভগবান বা সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই।
(৩) **বিষয়ী–** ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য লালায়িত, ঈর্ষাপরায়ণ এবং কলহপ্রিয় এবং
(৪) **ধর্মধ্বজী ভণ্ড–** স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের বেশ ধারণ করে (প্রাকৃত ভক্ত বা সহজিয়া)।

বিষয়ী-সঙ্গের বিষয়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে কাত্যায়ণ-সংহিতা থেকে একটি শ্লোক উল্লেখ করা হয়েছে–

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজন সংবাসবৈশ্যসম্ ॥

অর্থ : জ্বলন্ত অগ্নিশিখাময় লোহার পিঞ্জরে অবস্থান করাও বরং ভালো, তবু যেন কৃষ্ণবিমুখ বিষয়াসক্ত মানুষের সঙ্গে বাস করতে না হয়। সেটি অত্যন্ত ক্লেশদায়ক।

ভগবদ্বিমুখ পুণ্যবান ও পাপী উভয়ই বিষয়ী। দেবোপাসকেরাও বিষয়ীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সম্বন্ধে বিষ্ণুরহস্যে বলা হয়েছে–

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যাল-ব্যাঘ্র-জলৌকসাম্।
ন সঙ্গঃ সল্য যুক্তানাং নানা দেবৈকসেবিনাম্ ॥

অর্থ : বরং সর্প, ব্যাঘ্র অথবা কুমিরকেও আলিঙ্গন করা ভালো, তবু জড়-বাসনা পূরণে আকাঙ্ক্ষী দেবোপাসকদের সঙ্গ করা উচিত নয়।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য দেবোপাসকদের সঙ্গ করার ব্যাপারে তাঁর শিষ্যদের কঠিন উপদেশ দিয়েছিলেন :

> **"যদি তুমি দেখো যে অগ্নিগ্রাসে তোমার মৃত্যু আসন্ন, কিন্তু নিকটস্থ কোনো মন্দিরে আশ্রয় নিলে তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারবে– যেখানে মানুষ দেব-দেবীর আরাধনা করছে, তবে সেখানে না গিয়ে তোমার বরং অগ্নিতেই মৃত্যুবরণ করা উচিত। দেবতাপূজকদের মন্দিরে প্রবেশের চেয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেওয়া শ্রেয়।"**

বাঘ, বন্য জন্তু বা দাবাগ্নি ভক্তি নষ্ট করতে পারে না, কিন্তু কামুক পুরুষ বা নারী, ইন্দ্রিয়ভোগী দেবোপাসকদের মারাত্মক সঙ্গ এবং যশ, সম্পদ ও অন্যান্য জড়-বিষয় লাভের লালসা হৃদয়স্থিত ভক্তিভাব ধ্বংস করে দিতে পারে। পক্ষান্তরে, শ্রীরামানুজাচার্যের চরম উপদেশ হলো :

> **"যদি তুমি নিজেকে কোনো চেষ্টায় শুদ্ধ করতে না পারো, তবে বৈষ্ণবগণের কাছে গিয়ে বসে থাকো, তাহলে তোমার সর্বমঙ্গল হবে।"**

বৈষ্ণব অপরাধের ধরন

তিনভাবে অপরাধ সাধিত হয়; যথা : (১) **কায়িক,** (২) **মানসিক** ও (৩) **বাচিক**। সাধারণত মানসিক অপরাধই কার্যে পরিণত হয়। প্রথমে কেউ ভাবে, তারপর সে সম্পর্কে বলে এবং সবশেষে তা কার্যে পরিণত করে। শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবতের এক তাৎপর্যে বলেছেন যে, কলিযুগে মানসিক পাপকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

বৈষ্ণব অপরাধের ক্ষেত্রে শরীর, মন, বাক্য ও চিত্তের ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণবকে দর্শন করে উল্লসিত না হওয়া অপরাধ এবং হৃদয় ঈর্ষা-মৎসরতায় কলুষিত থাকার লক্ষণ এটি। মৎসরতাপূর্ণ চিত্তই এ অপরাধের উৎস-স্থল। স্কন্দপুরাণে এমন ছয় ধরনের অপরাধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে :

হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুদ্ধতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

অর্থ : (১) যে ভক্তকে হত্যা করে, (২) যে ভক্তের নিন্দা করে, (৩) যে ভক্তকে দ্বেষ বা হিংসা করে, (৪) যে বৈষ্ণবকে দর্শন করে অভিনন্দন (প্রণাম, পূজা) করে না, (৫) যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে এবং (৬) ভক্তদর্শনে যে আনন্দিত হয় না। এই ছয় ধরনের বৈষ্ণবদ্বেষী মূঢ় ব্যক্তি তাদের বহু বহু প্রজন্মের পিতৃপুরুষগণসহ মহারৌরব নামক নরকে অধঃপতিত হয়।

তাদের সঙ্গও বর্জন করা উচিত, যারা ভক্তদের এই অভক্তসঙ্গ বর্জনের সমালোচনা করে। কিন্তু মন্দিরের বাইরের ভক্তদের ক্ষেত্রেও কি এ নিয়ম প্রযোজ্য? উত্তর হলো :

শাস্ত্র এত গোড়া নয়, বরং অত্যন্ত বাস্তবানুগ। এ ব্যাপারে তিন ধরনের সঙ্গের কথা বলা হয়েছে :

১. **সঙ্গ দান :** সমাজের অন্য ব্যক্তিকে সঙ্গ দানের অর্থ হলো তাকে পরমার্থ সম্বন্ধে বলা।
২. **সঙ্গ গ্রহণ :** সঙ্গ দান করা সম্ভব না হলে পারমার্থিক স্থিতি বজায় রেখে প্রয়োজনে সঙ্গ গ্রহণ করা।
৩. **সামাজিকতা রক্ষা :** বাহ্যে না করলেই নয় এমন সামাজিক আচরণ করা; কিন্তু অন্তরে অবশ্যই পারমার্থিক স্থিতি বজায় রাখতে হবে।

অসৎসঙ্গ করার ফলে ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হয়। শ্রদ্ধা নষ্ট হলে সহজেই ভক্তের চরণে অপরাধ হয়, যা ভক্তের ভক্তি লতাকে সমূলে বিনষ্ট করে। জন্মের পর শিশুর মধ্যে খুব বেশি কলুষ থাকে না। কিন্তু অসৎসঙ্গের কারণে ধীরে ধীরে তার ভেতর বিভিন্ন ধরনের কলুষ, অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি ও কুঅভ্যাস প্রবেশ করে।

বৈষ্ণব-অপরাধের দৃষ্টান্ত

শচীমাতার অপরাধ

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের মায়ের আদর্শ প্রদর্শন করে সকলকেই নামাপরাধ থেকে, বিশেষ করে নামাপরাধ থেকে সাবধান করেছেন। এ এক অদ্ভুত কাহিনী। তা শ্রবণ করলেও তার ফলে বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে যায়।

একদিন বিষ্ণুখট্টায় উঠে মহাপ্রভু নিজের মূর্তি ধারণপূর্বক শিলাসমূহকে কোলে নিয়ে মহাপ্রকাশ-লীলা প্রদর্শন করার সময় বলতে লাগলেন, "আমিই কৃষ্ণ, আমিই নারায়ণ, আমিই রামরূপে সাগর বন্ধন করেছিলাম। আমি ক্ষীর সাগরে শুয়েছিলাম, নাড়ার (অদ্বৈতাচার্য) হুঙ্কারে আমার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি এসেছি। ওহে নাড়া, ওহে শ্রীনিবাস, তোমাদের যার যা বাঞ্ছা আছে আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান তাঁর ভক্তগণকে প্রেম বিলাতে লাগলেন। কেউ তাঁর পিতার জন্য, কেউ গুরুর জন্য, কেউ শিষ্যের জন্য, কেউ বা পুত্র বা পত্নীর জন্য ভগবদ্ভক্তি প্রার্থনা করলে প্রভু বিশ্বম্ভর হাসতে হাসতে সবাইকে প্রেমভক্তি প্রদান করলেন। সকলকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করতে দেখে ভক্তগণের মুখপাত্র হিসেবে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে তাঁর নিজের জননীর কাছে প্রেম বিতরণের জন্য প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু মহাপ্রভু বললেন, "তিনি বৈষ্ণব-অপরাধিনী, তাই তাঁর প্রেমভক্তি উদয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই।" তা শুনে শ্রীবাস বললেন, প্রভু, তোমার এ কথা তো আমাদের সকলের জন্য মৃত্যুতুল্য! তোমার মতো পুত্রকে যিনি গর্ভে ধারণ করেছেন, আমাদের সবার যিনি জীবনস্বরূপ, সাক্ষাৎ জগৎমাতা সেই আই'র (মাতার) প্রেমে অধিকার নেই! বঞ্চনা করো না প্রভু, আইকে প্রেমভক্তি প্রদান করো। তুমি যাঁর পুত্র, সেই জগজ্জননীর পুত্রস্থানে কী অপরাধ থাকতে পারে? যদি বা থেকেই থাকে, তবে তা খণ্ডিয়ে তাঁকে কৃপা করো, প্রভু।" তা শুনে মহাপ্রভু বললেন, "আমি ভক্ত পরাধীন। ভক্ত আমার হৃদয়, ভক্তেরও হৃদয় আমি। ভক্ত আমাকে ছাড়া কাউকে জানে না, আমিও ভক্ত ছাড়া কাউকে জানি না।" এমন ভক্তের চরণে অপরাধ কি ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান কিছুতে ক্ষমা করতে পারেন? একমাত্র উপায়, যে ভক্তের কাছে অপরাধ, তাঁর চরণে নিষ্কপটে শরণাগত হলে ভক্তের ক্ষমাগুণে গুণগ্রাহী ভগবান সেই অপরাধীর প্রতি প্রসন্ন হন। তাই মহাপ্রভু বললেন, "অদ্বৈতচরণে মায়ের অপরাধ হয়েছে, মা তাঁর চরণধূলি মাথায় নিলে তাঁর প্রসন্নতায় আমার প্রসন্নতা হবে এবং মায়ের প্রেমভক্তি লাভ হবে।" এ কথা শুনে অদ্বৈতাচার্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে গেলেন। এ সুযোগে শচীমাতা এসে আচার্যের চরণধূলি মাথায় ধারণ করামাত্র প্রেম লাভ করে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলেন।

শচীমাতা যে অপরাধ করেছেন, বস্তুবিচারে স্বয়ং মহাপ্রভুর বিরহবিহ্বলা জননীর পক্ষে তা অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। তবুও মহাবদান্যাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু তা অপরাধরূপে গণ্য করে মাতাকে প্রেমভক্তি প্রদান করা থেকে বিরত থাকলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের সঙ্গ প্রভাবে শচীমাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান বিশ্বরূপ সংসার-বিরক্ত হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। কনিষ্ঠ সন্তান নিমাইয়েরও সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য দেখে শোকাভিভূতা শচীমাতার মনে হয়েছিল, তাঁর এ ছেলেকেও বুঝি আচার্য আর ঘরে থাকতে দেবেন না। তাই মনের দুঃখে ও ক্ষোভে তিনি অদ্বৈত আচার্যকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'ইনি অন্যের কাছে অদ্বৈত হলেও আমার কাছে দ্বৈত', অর্থাৎ মায়া।

আমরা যে তার চেয়ে কত ভীষণ ভীষণ অপরাধ বেপরোয়াভাবে করে থাকি, তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে? তাই বৈষ্ণবমহাজন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন–

শূলপানিসম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে। / তথাপিহ নাশ পায়, কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥
ইহা না জানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে। / জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে ॥
অন্যের কি দায়, গৌর-সিংহের জননী। / তাঁহারেও বৈষ্ণবাপরাধ করি গণি ॥"

(চৈ. ভা. ২২/৫২)

বৈষ্ণবপ্রধান শিবের চরণে প্রজাপতি দক্ষের অপরাধ

শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে দেখা যায়– ব্রহ্মার পুত্র এবং বিষ্ণুর সেবক হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণবরাজ শিবের নিন্দক প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞে শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং গমন করেননি। পরমা বৈষ্ণবীশক্তি সতীদেবী নিজের পিতার মুখে পতির নিন্দা শ্রবণ করে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পিতা দক্ষকে তীব্র ভর্ৎসনা করতে করতে সর্বসমক্ষে যোগবলে নিজের প্রাণ ত্যাগ করেন। সে কথা শুনে শিব নিজের জটা উৎপাটনপূর্বক ভীষণকায় বীরভদ্রকে সৃষ্টি করেন যে দক্ষের সমস্ত যজ্ঞ ধ্বংস করে দক্ষের মস্তক ছেদন করে। শুধু তাই নয়, বৈষ্ণবাপরাধী দক্ষের পক্ষ অবলম্বনকারী দেবতা, প্রজাপতি ও মুনিদেরও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা ছিল না। যাই হোক, আশুতোষ শিব ব্রহ্মাদি দেবতার স্তবে তুষ্ট হয়ে ছাগলের মাথা যুক্ত করে দক্ষকে পুনরায় জীবিত করেন। তারপর ব্রহ্মাদি দেবতাসহ তিনি দক্ষের যজ্ঞস্থলে এলে তাঁর কৃপায় দক্ষ মোহমুক্ত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং পুনরায় যজ্ঞ করলে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি সে যজ্ঞে এসে যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণবাপরাধ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এ থেকে সাবধান না হলে কোটি কোটি জন্ম নামভজন করেও কেউ নামের কৃপা লাভে সমর্থ হতে পারে না। ছাগমুণ্ড লাভ করার পর স্তুতির দ্বারা শিবকে প্রসন্ন করে দক্ষ পুনর্জন্ম লাভ করলেও অপরাধ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়নি। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে কৃত অপরাধের ফল তাকে চাক্ষুষ মন্বন্তরেও ভোগ করতে হয়েছিল।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে রামচন্দ্র খানের অপরাধ

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে ভ্রষ্ট করার জন্য লক্ষহীরা নামক বেশ্যাকে পাঠিয়ে প্রথমে শ্রীল হরিদাসের চরণে অপরাধ করার ফলে রামচন্দ্র খানের অসুরস্বভাব আরো বেড়ে যায়। এরপর একদিন ভগবান নিত্যানন্দ সপার্ষদ রামচন্দ্র খানের দুর্গামণ্ডপে এলে সে নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করার পরিবর্তে লোক পাঠিয়ে তাঁকে অবজ্ঞা করে। নিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধভরে তখন সেই মহাপাষণ্ডের স্থান পরিত্যাগ করেন। ফল ফলতে বেশি দেরি হয় না, কয়েকদিনের মধ্যেই কর ফাঁকি ও লুটের অভিযোগে সম্রাটের লোক এসে স্ত্রী-পুত্রসহ রামচন্দ্রকে বেঁধে দুর্গামণ্ডপে অমেধ্য রন্ধনসহ সমস্ত গ্রাম লুটপাট করে। এর ফলে খানের জাতি-ধন-জন সব ধ্বংস হয়– গ্রাম উজাড় হয়ে পড়ে বহুদিন পর্যন্ত।

মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।
একজনার দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥

(চৈ.চ. আ. ১৬৩)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কাছে গোপাল চক্রবর্তীর অপরাধ

একবার এক সভায় গোপাল চক্রবর্তী নামক একজন পেয়াদা প্রধান শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে 'নামাভাসে মুক্তি হয়'– কথাটি শুনে ঠাকুরকে ভাবুক বলে তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করে, ক্রোধভরে তাঁকে অবজ্ঞাও করে। কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের মতো বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা করার কঠিন ফল অচিরেই ফলে যায়–

তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাশা তার গলিয়া পড়িল ॥
চম্পককলিসম হস্ত পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি ॥

(চৈ. চ. আ. ২০৬-২০৮)

গরুড়দেবের চরণে সৌভরি মুনির অপরাধ

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে– মহাযোগী সৌভরি ঋষি যে যোগভ্রষ্ট হয়ে সম্রাট মান্ধাতার পঞ্চাশ কন্যাকে বিবাহ করে জড়সুখ উপভোগে মত্ত হয়ে পড়েন, তার কারণ তিনি ভগবানের পরম ভক্ত গরুড়দেবের

চরণে অপরাধ করেছিলেন। জলচর প্রাণীদের প্রতি কৃপা দেখাতে গিয়ে তিনি প্রাণীদের কেবল মহাকালের করাল কবলেই ফেলেননি, নিজেও গরুড়ের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও অভিশাপ প্রদানের মতো মহাঅপরাধ করে বসেন। এর ফলে মহাবিষধর কালিয় নাগ প্রবেশ করায় সেই হ্রদের যাবতীয় জলচর প্রাণী তীব্র বিষের জ্বালায় ছট্ফট্ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করে। সে অপরাধের ফলেই সৌভরি মুনি মৎস্যসঙ্গ দর্শন করে নিজের চিরসঞ্চিত তপবলে সৃষ্ট যৌবনের দ্বারা কামিনীদের ক্রয় করে তাদের সাথে বহুকাল নরকতুল্য জড়-সুখভোগানন্দে নিমজ্জিত হয়েছিলেন।

মহারাজ অম্বরীষের চরণে ঋষি দুর্বাসার অপরাধ

দ্বাদশীব্রত পালনের পর পারণের পূর্বমুহূর্তে অতিথি হিসেবে দুর্বাসা মুনি উপস্থিত হলে মহারাজ অম্বরীষ তাঁকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। দুর্বাসা মুনি মহারাজের আতিথ্য স্বীকার করে স্নানের উদ্দেশ্যে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হন। এদিকে মহারাজের পারণের সময় প্রায় অতিক্রম হলে তিনি জল গ্রহণ করে ব্রত রক্ষা করেন। কিন্তু যোগবলে দুর্বাসা তা জানতে পেরে মহারাজের প্রতি অত্যধিক ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর জটা থেকে এক জ্বলন্ত কৃত্যা সৃষ্টি করে অম্বরীষ মহারাজকে নাশ করার জন্য প্রেরণ করে মহাঅপরাধ করে বসেন। মহারাজ অম্বরীষের রক্ষায় নিয়োজিত সুদর্শন চক্র সেই কৃত্যাকে বিনাশ করে দুর্বাসার প্রতি ধাবিত হতে থাকে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও গিয়ে তিনি রক্ষা পাননি। শ্রীবিষ্ণু নিজেও তাকে রক্ষা করেননি। শেষ পর্যন্ত মহারাজ অম্বরীষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করার পরই কেবল তিনি নিজের প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হন।

দুর্বাসার ন্যায় সাক্ষাৎ রুদ্রাংশ মহাতপা ঋষিও বৈষ্ণবরাজ অম্বরীষের চরণে অপরাধ করে ব্রহ্মলোক, রুদ্রলোকসহ ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও, কারো কাছে গিয়ে রক্ষা পাননি। ভগবানের ভক্তের চরণে অপরাধ করে ভগবানের শরণাগত হলেও ভগবান তাকে রক্ষা করেন না। যেহেতু তিনি সর্বস্বতন্ত্র হয়েও ভক্তপ্রেমাধীন। দুর্বাসার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ভগবান আমাদের ভক্তচরণে অপরাধের ব্যাপারে সাবধান করে দিলেন।

চতুষ্কুমারের প্রতি জয়-বিজয়ের অপরাধ

একবার চতুষ্কুমারেরা বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হলে দ্বাররক্ষী জয় ও বিজয় তাঁদের বাধা প্রদান করে। চতুষ্কুমার একাধিকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও জয়-বিজয় তাদের কিছুতেই প্রবেশানুমতি তো দেয়ইনি, বরং তাঁদের প্রতিহত করে ভূমিতে ফেলে দেয়। এরূপ অবস্থায় চতুষ্কুমার জয়-বিজয়কে অভিশাপ প্রদান করেন, যাতে তারা মর্তে এসে অসুরযোনী প্রাপ্ত হয়।

খঞ্জকৃষ্ণ দাসের প্রতি রূপ গোস্বামীপাদের অপরাধ

একসময় শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা স্মরণে রত ছিলেন। তিনি দেখছিলেন, রাধারাণী একটি কদম্ববৃক্ষের শাখা থেকে ফুল তুলছেন আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেই শাখাটিকে নিচের দিকে টেনে ধরে রেখেছেন। কিন্তু পরিহাস ছলে হঠাৎ কৃষ্ণ শাখটি ছেড়ে দিলে রাধারাণীসহ তা উপরে উঠে যায়। তখন রাধারাণী তাতে ঝুলতে ঝুলতে ভয়ে চিৎকার করতে থাকেন। আর কৃষ্ণসহ অন্য সবাই তা দেখে হাসতে থাকেন। সে দৃশ্য দেখে রূপ গোস্বামীও তাঁর হাসি সংবরণ করতে পারলেন না। ঠিক সেই মুহূর্তে রূপ গোস্বামীর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন খঞ্জকৃষ্ণ দাস, যার শরীরের গঠন ছিল অষ্টাবক্র ঋষির মতো। তিনি ভেবেছিলেন, তাকে দেখেই রূপ গোস্বামী হেসেছেন। তাই তিনি খুব কষ্ট পেলেন। এর ফলে সাথে সাথেই রূপ গোস্বামীপাদের লীলাস্ফূর্তি বন্ধ হয়ে গেল। শত চেষ্টা করেও তিনি আর লীলাস্মরণ করতে পারলেন না। তাই দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন গোস্বামীর কাছে গিয়ে তাঁর দুঃখের কথা জানালেন। সনাতন গোস্বামীপাদ তাঁকে বৈষ্ণবসেবার আয়োজন করতে বললেন। বৈষ্ণবসেবার আয়োজন হলো, কিন্তু খঞ্জকৃষ্ণ দাস সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন না। রূপ ও সনাতন গোস্বামী তখন বুঝতে পারলেন যে, খঞ্জকৃষ্ণের চরণেই রূপ গোস্বামীর অপরাধ হয়েছে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ খঞ্জকৃ

ষ্ণের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে অপরাধের কারণ জানতে চাইলেন। খঞ্জকৃষ্ণ দাস তাঁকে দেখে রূপ গোস্বামীর হাসির কথা উল্লেখ করলে রূপ গোস্বামীপাদ সব বুঝতে পেরে তাঁর হাসির কারণ ব্যাখ্যা করলেন। এভাবে উভয়েই উভয়ের প্রতি প্রীতি লাভ করলেন।

শিবের প্রতি চিত্রকেতুর অপরাধ

একবার কৈলাসে শিবজি যখন ঋষিপরিবৃত হয়ে পার্বতীকে কোলে নিয়ে ভগবৎকথা বলছিলেন, তখন চিত্রকেতু তাঁর দিব্যবিমানে করে আকাশমার্গে ভ্রমণ করছিলেন। কৈলাসের দৃশ্য দেখে তিনি শিবের নিন্দা করেন। কিন্তু শিব কিছু মনে না করলেও পার্বতী তাঁকে অসুরযোনী প্রাপ্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। শিবের অপ্রাকৃত স্থিতি না বুঝে শিবের নিন্দা করা চিত্রকেতুর অপরাধই বটে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন, "অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীব আমার নিত্য সেবক। সে জন্য যে জীব অপর জীবকে অসম্মান করে, তার সর্বনাশ হয়। কোনো সন্ন্যাসীও যদি কোনো নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে অপমান করে, তবে সেই সন্ন্যাসীর পতন হয়, তাঁর সব পুণ্য ক্ষয় হয়ে যায়।" তাই অন্যের নিন্দা পরিত্যাগ করে কীর্তন করো :

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সূচ ও চালুনির গল্প

শ্রীল গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ প্রথম নামাপরাধের এক অত্যুজ্জ্বল চিত্র প্রদান করেছেন

বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করলে ভক্তিদেবী তার কাছ থেকে চলে যান। ভয় ও মৎসরতাবশত ভক্তগণের নিন্দা, ছিদ্রান্বেষণ, সমালোচনা ও দোষ কীর্তন করার ফলে বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে থাকে। বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করায় অপরাধী বৈষ্ণবের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ভয়ও পেতে থাকে, যেহেতু তিনি একজন শক্তিশালী বৈষ্ণব। এজন্য বৈষ্ণব সম্পর্কে অপরাধী সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে, এমনকি তাঁর সম্বন্ধে নানা গুজবও রটাতে থাকে। এভাবে সহস্র ছিদ্রে পূর্ণ চালুনি নিজের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সূচকে উপহাস করে বলে, "ওহে সূচ, লক্ষ্য করেছ, তোমার পেছনে কত বড় এক ছিদ্র !

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, "উত্তম ব্যক্তিগণ সর্বদাই অন্যদের চেয়ে নিজেদের অধম, হীন বিবেচনা করেন। নিজের আচার-আচরণ বিচার না করে অন্যের দোষ অন্বেষণের চেষ্টা কেন? বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়। আপাতদৃষ্টিতে যা প্রতীয়মান হয়, তার দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। আপাত প্রতীয়মান দৃশ্যের ওপর নির্ভর করার ফলে বহু মানুষ পাথরকে মুক্তা, সাপকে দড়ি, মন্দকে ভালো বলে ভুল করে মোহ-বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। যখন অন্যের দোষ-ত্রুটি তোমাকে বিপথে পরিচালিত করে, বিভ্রান্ত করে, তখন তোমার উচিত ধৈর্য অবলম্বন করে চিন্তাশীল হওয়া, অনুসন্ধান করা– নিজের দোষ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা। জেনে রাখো যে, তুমি যদি নিজের ক্ষতি না করো, তবে কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।"

– শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা

এখন কথা হলো, সাধু যদি সত্যি সত্যিই দোষী হন, তবে তাঁর দোষ সংশোধনের কি প্রয়োজন নেই? উত্তর হলো, দোষ সংশোধন তাঁর গুরুদেব বা অন্যান্য যোগ্য অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিগণের কাজ, সাধারণ সাধকের কাজ নয়। অন্যের কাছে কারো দোষ-ত্রুটি ব্যাখ্যা, নিন্দাবাদে নিয়োজিত হওয়ার ফলে কেবল অপরাধ সঞ্চয় হয়। এ প্রসঙ্গে বাইবেলে একটি সুন্দর কথা বলা হয়েছে, "বিচার কোরো না, যদি না তোমার বিচার হয়।"

প্রতিকার

১. প্রমাদগ্রস্ত অবস্থায় কেউ বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করে থাকলে তাকে অবশ্যই এর জন্য অনুতাপ করা উচিত। যে ভক্তের চরণে অপরাধ হয়েছে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। ভগদ্ভক্ত স্বভাবতই করুণাময়। তাই তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেবেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "ঐকান্তিকভাবে প্রণাম করার মাধ্যমে যে কারো হৃদয় জয় করা যায়। ঐকান্তিক প্রণাম নিবেদনের ক্ষমতা এমনিই।"

২. সাধু ক্ষমার মূর্তি বলে তিনি অপরাধীকে সান্ত্বনা দিয়ে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু তাতেও নিরস্ত না হয়ে অপরাধীর উচিত দৈন্য ও আর্তির সঙ্গে সেই ভক্তের চরণরেণুর দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে তার বন্দনা করা। কারণ মহৎজন ক্ষমা করলেও বৈষ্ণবের চরণরেণু সকল অপরাধ সহ্য করতে না পেরে উত্তপ্ত অবস্থায় অপরাধীকে সমুচিত ফল প্রদান করে। তাই অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা উচিত নয়।

৩. যদি কোনো প্রকার অনবধানতাবশতও কখনো নামাপরাধ হয়ে থাকে, তবে একান্তভাবে শ্রীনামের শরণাপন্ন হয়ে নিরন্তর নামকীর্তন করা আবশ্যক। তবে বৈষ্ণবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকে কষ্টসাধ্য মনে করে কৃত অপরাধের জন্য যদি কেউ গৃহে বসে কেবল নামকীর্তন করতে চায়, তবে এর দ্বারা অপরাধ খণ্ডন না হয়ে 'নাম বলে পাপ আচরণের' মতো আরেকটি অপরাধ হয়ে থাকে। সুতরাং এমন কুবুদ্ধি কখনোই পোষণ না করে যাঁর চরণে অপরাধ, তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক। তবে যদি সেই সাধুর কোনো সন্ধান না পাওয়া যায়, অথবা তিনি যদি অপ্রকট হয়ে থাকেন কিংবা কোন সাধুর কাছে কীভাবে অপরাধ হয়েছে, তা যদি বুঝতে পারা না যায়, তবেই অনন্যগতি শ্রীনামের শরণাগত হয়ে কৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ সহকারে একান্তভাবে নিরন্তর কেবল নামকীর্তন করা উচিত।

অনুতাপ

মাধুর্যকাদম্বিনী গ্রন্থে দশবিধ নামাপরাধের অধিকাংশই মোচনের জন্য খেদ সহকারে অনুতাপ করার অভ্যাসকে প্রতিরোধমূলক পন্থা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু নামাপরাধের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলেও অনুতাপ সব সময়ই প্রয়োজন। যদি নামাপরাধ করার পর ভক্ত আন্তরিকভাবে অনুতাপ করেন, "আমার এটি করা উচিত হয়নি; কিন্তু আমি এমন মূর্খ যে তা করে ফেলেছি", তবে তাঁর অকৃত্রিম অনুতাপের জন্য শ্রীনাম প্রভু তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

অনুতাপ কী?

অভিধান অনুসারে অনুতাপ অর্থ কৃতকর্মের জন্য গভীর দুঃখ অনুভব করা, এমনটি না করলেই ভালো হতো– এমন বোধ করা এবং ভবিষ্যতে যেন আর এমন না হয়, সে জন্য সংকল্প করা। এর সমার্থক শব্দসমূহ হলো– অনুশোচনা, দুঃখ, পরিতাপ, পাপবোধ, কাতরতা, খেদ, দৈন্য ও আক্ষেপ। এ আক্ষেপ-আকুলতার ভাব ভক্তের হৃদয়কে আর্দ্র ও কোমল করে তোলে। অনুতাপরূপ অগ্নি প্রজ্বলনের পর অশ্রুবিসর্জনরূপ বর্ষণ হয়, যা হৃদয়কে আরো বিশুদ্ধ ও নির্মল করে তোলে।

অনুতাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত

শ্রীপুণ্ডরিক বিদ্যানিধির পারমার্থিক স্থিতির ব্যাপারে সন্দেহ করার পর গদাধর পণ্ডিত যখন পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির সুতীব্র প্রেমাবেশ ও অতি উন্নত অবস্থা দর্শন করলেন, তখন বিস্ময়ে হতবাক এবং অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর মুকুন্দকে বললেন, "আমি কত বড় অপরাধী ! আপনার কৃপায় আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির কাছে দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল আমি আমার অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারব।"

– ভক্তিরত্নাকর, দ্বাদশ তরঙ্গ, গদ্যার্থ

জগাই ও মাধাইয়ের আন্তরিক অনুতাপ ও দুঃখপূর্ণ দৈন্যোক্তি শ্রবণ করে শ্রীগৌরচন্দ্র বললেন, "আমি তোমাদের কৃপা করছি।"

– চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ড, গীত– ১৪

নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ব্রহ্মা নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ তাঁকে অনুতাপ ও স্তব-স্তুতি করতে দিলেন, তারপর তিনি ব্রহ্মার প্রতি প্রীত হলেন। ব্রহ্মা কিন্তু নিজেকে ক্ষমা করতে পারলেন না। তিনি স্থির করলেন যে, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সহায়তা এবং তাঁর কৃপা-কটাক্ষ ব্যতীত তাঁর অপরাধ মোচন সম্ভব নয়।

– ভক্তিরত্নাকর, দ্বাদশ তরঙ্গ, গদ্যার্থ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত কল্যাণ-কল্পতরুর প্রথম অধ্যায়ে অনুতাপ ও দৈন্যোক্তিপূর্ণ পাঁচটি গীতের একটি এমন, "ধিক্ আমার এ জীবনে! ধিক্ আমার ধন-জন-বৈভবে! ধিক্ আমার জাত্যভিমান, কুলগর্বে! ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যে! শাস্ত্রাধ্যয়নে! যেহেতু মুকুন্দ-পাদপদ্মে আমার এখনো ভক্তি লাভ হলো না!"

– তৃতীয় গীত

"সৎ ব্যক্তির মন ভুল করামাত্রই অনুতপ্ত হয়।"

– ভা. ১/১৮/৩১, তাৎপর্য

নির্দোষ ও তেজস্বী ব্রাহ্মণের প্রতি আকস্মিক অভদ্র আচরণের জন্য পুণ্যবান রাজা পরীক্ষিৎ অনুশোচনা করেছিলেন। তাঁর মতো উত্তম ব্যক্তির পক্ষে এমন অনুশোচনা স্বাভাবিক। ভগবদ্ভক্তকে তা সর্বপ্রকার আকস্মিক অপরাধ থেকে উদ্ধার করে। ভক্তরা স্বভাবতই নিষ্পাপ। যদি আকস্মিকভাবে কোনো অপরাধ হয়েই যায়, তবে ভক্ত সে জন্য ঐকান্তিকভাবে অনুশোচনা করেন এবং ভগবানের কৃপায় তাঁদের অনিচ্ছাকৃত সমস্ত পাপ অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে যায়।

– ভা. ১/১৯/১ তাৎপর্য

"পাপাত্মা ও নিঃস্বগণ কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করুণা-প্রভাবেই ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য উপলব্ধি করতে পারে। যদি তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে শুরু করে এবং ভগবানের পদকমলের শরণাগত হয়, তবেই তারা রক্ষা পায়। অচিরেই শুদ্ধতা লাভ করে এবং সাধুসুলভ গুণসমূহ তাদের মধ্যে প্রকাশিত হতে থাকে।"

– বৈরাগ্যবিদ্যা, দ্বিতীয় অধ্যায়

"তোমার দৈন্যপূর্ণ অনুতাপ তোমার মতো একজন বৈষ্ণব শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্তই বটে। তাই এর জন্য আমি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

– শ্রীল প্রভুপাদ পত্রাবলি, ১২/১২/৭৪

কোনো কোনো খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারককে কখনো কখনো প্ল্যাকার্ড বহন করতে দেখা যায়, যাতে লেখা থাকে, "পাপীগণ, অনুতাপ করো, নতুবা নরকের আগুনে দগ্ধ হতে হবে।"

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করুন

দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য নিচের চারটি সূত্র জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করুন

১. গুণ অন্বেষণের অভ্যাস গড়ে তুলুন। এর মাধ্যমে ছিদ্রান্বেষণের প্রবণতা কমে যাবে। রাজহংস যেমন জল থেকে শুধু দুধটুকু গ্রহণ করে, আপনিও তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির গুণ খুঁজে বের করে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করুন। সজ্জন ব্যক্তি তা-ই করে থাকেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এ জগতে কোনো দুর্জন ব্যক্তি খুঁজে পাননি, অথচ দুর্যোধন ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সে জগতে কোনো ভালো ব্যক্তি খুঁজে পায়নি।

২. যে কারো সম্বন্ধে বিচার করার আগে অবশ্যই ভাবা উচিত– সাধুর যেমন অতীত আছে (বাল্মীকি, মৃগারি), পাপীরও তেমনি ভবিষ্যৎ আছে (অজামিল, জগাই-মাধাই)। দুর্জন চিরকালের জন্য দুর্জন থাকে না। সবচেয়ে দুষ্ট লোকটিও তো ভবিষ্যতে সাধু হতে পারে। তাই পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা করার নীতি গ্রহণ করুন।

৩. পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম মঙ্গলময়। তিনি সবকিছুর মধ্যে বর্তমান এবং সবকিছুই তাঁর মধ্যে অবস্থিত। তাই সবকিছুর মধ্যেই তাঁর মঙ্গলময় উপস্থিতি বিদ্যমান। সর্বত্র কৃষ্ণদর্শনের মাধ্যমে তাঁর ওপর নির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা নিন।

৪. মনকে মন্দের দিক থেকে ভালোর দিকে, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ফিরিয়ে নিন। সবকিছুকে প্রেমময় দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করুন, তবে আপনিও সর্বত্র প্রেমের উপস্থিতি অনুভব করতে পারবেন। শক্তিশালী মনকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যেই মানুষের শান্তি ও আনন্দলাভ নির্ভর করছে। মনকে বশীভূত ও নিয়ন্ত্রণ না করা পর্যন্ত তা আপনার শত্রু হিসেবে আচরণ করবেই। তাই তাকে শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবদ্ধ করে বন্ধু বানান।

মহাপ্রভুর শিক্ষা

মাৎসর্য দূর করে বৈষ্ণব অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য মহাপ্রভু সর্বদা ভক্তসেবা এবং নিজেকে ভগবানের 'দাসের দাসের অনুদাসের দাস' বলে চিন্তা করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করার পর সর্বক্ষণ কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনে নিমগ্ন থেকে অকৃত্রিম বিনয় প্রদর্শন করে সবাইকে বিমুগ্ধ করেছিলেন। কীভাবে ভক্তের সেবা এবং ভক্তকে নমস্কারাদি করতে হয়, তা নিজেই করে দেখিয়েছেন :

এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর। / আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর ॥
কোন্ কর্ম সেবকের প্রভু নাহি করে ? / সেবকের লাগি নিজ ধর্ম পরিহরে ॥
কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ। / সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস ॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে। / বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে ॥

(চৈতন্য ভাগবত)

শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকেই তিনি সাধন-প্রণালির কথা বলেছেন; যথা :

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি ॥

অর্থাৎ যিনি নিজেকে পদদলিত তৃণের চেয়েও ক্ষুদ্র বলে মনে করেন, বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু হন এবং মানশূন্য হয়ে অন্য সকলকে সম্মান করেন, তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনের অধিকারী। এ কথা অবশ্যই মনেপ্রাণে ধারণ করতে হবে। মহাপ্রভু একে সর্বদা কণ্ঠে ধারণ করার কথা বলেছেন। শ্রীহরিনাম কীর্তন করার এটিই যোগ্যতা। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এ শ্লোকের পদ্যানুবাদ নিম্নরূপে করেছেন–

উত্তম হৈয়া আপনাকে মানে 'তৃণাধম'। / দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। / শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন। / ঘর্মবৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। / জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥
এইমত হৈয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়। / কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥

(চৈ.চ. অন্ত. ২০/১৭-২১)

কীর্তনীয় সদাহরি

এই শ্লোকে যে লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা রতির স্তরকে নির্দেশ করা হয়েছে। রতির লক্ষণ হলো ক্ষান্তি, মানশূন্যতা, নামগানে সদা রুচি ইত্যাদি (ভ.র.সি. ১/৩/২৫-২৬)। সাঁতার শেখার জন্য যেমন জলে নামতেই হয়, না নামলে সাঁতার শেখা যায় না, তেমনি উক্ত ভাবসমূহ গ্রহণের জন্য সচেষ্ট থেকে যথাসম্ভব বেশি সময় ধরে নামকীর্তন

করা অবশ্যই প্রয়োজন। তখন এ ভাবসমূহ চিত্তে দৃঢ় হতে থাকে এবং সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় হলে হরিকীর্তন সর্বদা চলে আর এক কৃষ্ণনামেই তখন কৃষ্ণপদে প্রেমোদয় হয়। রতির স্তরে ভক্তচিত্তে 'তৃণাদপি সুনীচেন' ভাব স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় নামমাধুর্য এত আস্বাদন হতে থাকে যে ভক্ত নামকীর্তন ছাড়া একমুহূর্তও থাকতে পারেন না। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সকল অবস্থায় শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামরসিকের রসনা নামকীর্তনে সর্বদা চঞ্চল থাকে। জল ছাড়া মাছের মতো অনুক্ষণ নামকীর্তন না হলে তাঁর প্রাণ বাঁচে না।

তৃণাদপি সুনীচেন

এ শ্লোকে বিশেষ করে তৃণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তৃণকে সবাই পদদলিত করে, কিন্তু সে কখনোই তার প্রতিবাদ করে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এ সম্বন্ধে লিখেছেন যে, তৃণেরও কিছু মূল্য আছে, কিন্তু আমার তা নেই। শ্রীনামের করুণায় তৃণাদপি সুনীচেন ভাব গাঢ় হয়ে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। উত্তম দৈন্য কৃষ্ণপ্রেমের গাঢ় অবস্থায় প্রাদুর্ভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গেলে বিরহে শ্রীরাধারাণী ও গোপীদের যে দৈন্যদশা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেরূপ। প্রেমের তারতম্যে আবার দৈন্যেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে।

তরোরিব সহিষ্ণুনা

বৃক্ষের মতো সহিষ্ণুতা। তা কেমন? বৃক্ষকে ছেদন করলেও সে প্রতিবাদ করে না, বরং ছেদনকারীকে পরিশ্রান্ত দেখে নিজের শাখা-পল্লবাদির দ্বারা ছায়া প্রদানপূর্বক ব্যজন করে থাকে। জলের অভাবে শুকিয়ে মৃতপ্রায় হলেও কেবল আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, অন্য কারো কাছে জল প্রার্থনা করে না। অন্যের সেবার জন্য ফলভার বহন করে– যে চায় তাকেই নিজ ধন প্রদান করে, কাউকে বিমুখ করে না। নিজে রোদ-বৃষ্টি সহ্য করেও অতিথিকে আশ্রয় প্রদান করে। বৃক্ষের মতো এমন অচিন্ত্যনীয় গুণসম্পদের অধিকারী যিনি, তাঁকেই তরোরিব সহিষ্ণু বলা যেতে পারে। আর এর প্রতিফল হয় একমাত্র সাধু মহাত্মাগণের ক্ষেত্রেই– নির্দয়ভাবে পীড়িত হলেও ভক্তের চিত্তে পীড়নকারীর প্রতি কোনো বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয় না। নিজের ভরণপোষণের জন্য ভক্ত কারো দ্বারস্থ হন না। ভক্তের এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, তাঁর যা কিছু প্রয়োজন তা তাঁর প্রভুর কাছ থেকে যথাসময়েই আসবে। শুধু তাই নয়, বৃক্ষ যেমন যাচককে অকাতরে আপন ধন ফুল-ফল ইত্যাদি দান করে, ভক্তও তেমনি যেকোনো যাচককে নিজের জাগতিক বস্তু তো বটেই, জীবের পরম মঙ্গলরূপ ভক্তিও দান করেন।

অমানী

আসক্তির স্তরেই সংসারের কারণ অবিদ্যা নিঃশেষ হয়, কাজেই রতির স্তরে ভক্তের জড়বিদ্যা, প্রাকৃত ধন, গৃহ, কুল প্রভৃতিতে অহঙ্কার থাকে না; বরং জড় অভিমানশূন্য হয়ে নিরন্তর নামসংকীর্তনে তন্ময় থাকেন। দেহাত্মবুদ্ধিরূপ মায়ারচিত ভ্রান্তির উপরই জীবের দেহ ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে অভিমান প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই দেহাভিমান থাকা পর্যন্ত অমানীত্ব-ভাব স্থির হয় না। সাধন স্তরে চিত্তের এ অবস্থা 'আনুকূল্যস্য সংকল্প' হিসেবে গ্রহণ করে যত্নের সাথে নামসংকীর্তন করতে থাকলে শ্রীনামপ্রভু ক্রমেই চিত্তকে অমানী করে তুলবেন।

মানদ

জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান। বৃক্ষলতা থেকে শুরু করে স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জীবের ভেতরেই আংশিক প্রকাশ পরমাত্মারূপে ভগবান অছেন। এর মধ্যে সাধুই বিশিষ্টজন, যাঁর ভেতরে শ্রীভগবান শুধু পরমাত্মারূপে নন, পূর্ণ মাধুর্যমণ্ডিত শ্রীগোবিন্দরূপেই বিশ্রাম করেন।

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন– মম বৈষ্ণব পরাণ ॥

– শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর

সাধারণত সাধারণ জীবের প্রতি যে মানদান, সেখানে সেই জীবের প্রতি কোনো অভিনিবেশ থাকে না, থাকে জীবের ভেতরে অবস্থিত পরমাত্মায়। ওই জীব সম্বন্ধে ভালো-মন্দ বিচার যেমন নেই, তেমনি কোনো আদান-প্রদানও নেই। কিন্তু ভক্তের সাথে ব্যবহারে চিত্তের অভিনিবেশ থাকবে, থাকবে আদান-প্রদান ও প্রীতির কথাও; যাঁর বাক্যে কৃষ্ণনাম শোনা যায়, তাঁকে মনে মনে আদর করবেন, যিনি দীক্ষিত হয়ে কৃষ্ণকীর্তনে রত, তাঁকে বারবার প্রণতিপূর্বক আদর করবেন, ভজনবিজ্ঞ, নামে একনিষ্ঠ, নিন্দাশূন্য সাধুর সঙ্গলাভ করে তাঁর সেবা করবেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্তৃক তৃণাদপি শ্লোকের ব্যাখ্যা

জীবের সমস্ত ক্লেশই মাৎসর্যের অন্তর্গত। অবিদ্যা, পাপবাসনা ও পাপ, পুণ্যবাসনা ও পুণ্য সমস্তই মাৎসর্যের অন্তর্গত। জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণবসেবারূপ বৈষ্ণবধর্ম একদিকে এবং মাৎসর্য আরেকদিকে অবস্থিত। যিনি পর সুখে দুঃখী, তিনি কখনোই জীবে দয়া করেন না। ভগবানের প্রতিও তার সরস ভাবের উদয় হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি তার প্রকৃতিগত ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকে। যিনি মাৎসর্যশূন্য, তিনিই তৃণাদপি শ্লোকের তাৎপর্য অঙ্গীকার করেছেন। মাৎসর্যশূন্য ব্যক্তির ধনমদ, রূপমদ, জাতিমদ, বিদ্যামদ ও বলমদ থাকে না; তাই তিনি নিজেকে তৃণ অপেক্ষা হীন বলে জানেন। মাৎসর্যশূন্য ব্যক্তির ক্রোধতীব্রতা ও পরহিংসা থাকে না; অতএব তিনিই বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু, অর্থাৎ দয়ালু। জাতি-বিদ্যামদাদি-রহিত নির্মৎসর পুরুষ সমস্ত গুণসম্পন্ন হয়েও প্রতিষ্ঠাশাশূন্য; অতএব তিনি অমানী। নির্মৎসর পুরুষ পরসুখে সুখী এবং পরদুঃখে দুঃখী; অতএব তিনিই সকল জীবে যথাযোগ্য মান বিধান করে থাকেন। সাধারণত দয়ার দ্বারা সমস্ত জীবে সম্মান, সম্মানের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় ভদ্রজীবে তর্পণ এবং চরণপূজার দ্বারা বৈষ্ণবসেবা করে থাকেন। (প্রবন্ধাবলি)

দৈন্যাধিক্যে কৃপাধিক্য

সাধক নিজেকে অত্যন্ত দীনহীন কাঙাল জ্ঞান করে শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিজজন মহতের কৃপা লাভের জন্য যতই চোখের জলে বুক ভাসাতে পারবেন, ততোই মহৎকৃপার অধিকারী হতে পারবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু থেকে শুরু করে তদনুগ প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যই জগজ্জীবকে এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যিনি নিজ হৃদয়কে যত দীন করতে পারবেন, তাঁর হৃদয়ে প্রেমভক্তির বারি তত অধিক পরিমাণে পূর্ণ থাকবে।

অন্যের দোষদর্শন বর্জনীয়

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীগুরুদেবসহ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সবাই অদোষদর্শী। সুতরাং দোষদর্শীর প্রতি তাঁদের কৃপা কীভাবে হবে। যিনি অনিন্দুক হয়ে কৃষ্ণনাম কীর্তন করবেন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে উদ্ধার করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন–

বাহু তুলি জগতেরে বোলে গৌরধাম।
অনিন্দক হৈয়া সবে বোল কৃষ্ণনাম ॥
অনিন্দক হৈয়া যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বোলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিমু হেলে ॥

(চৈ.ভা. মধ্য. ১৭/২১৩-২১৪)

কেউ কারো দুঃখের কারণ নয়। অবশীভূত মনই সুখ-দুঃখ ও শত্রু-মিত্রের কল্পনা করে থাকে। এই মনের বশীভূত হয়েই মানুষ বিপথগামী হয়। সেজন্য কারো দোষদর্শন না করে ভগবানের অধিষ্ঠান জেনে সকল প্রাণীকে যথাযোগ্য সম্মানদানপূর্বক সর্বদা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করলে মন সংযত হয়ে ভগবদ্ভজনে রত হবে।

অন্যের দোষদর্শন হয় কেন ?

জীব অনাদিকাল থেকে ভগবানকে ভুলে মায়াগ্রস্ত হয়েছে এবং মায়াপ্রদত্ত এ জড়দেহের প্রতি তার আত্মবোধ হয়েছে। দেহ এবং দেহ সম্পর্কিত স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়সম্পত্তি থেকে সুখ পাওয়ার আশায় সে এসব অনাত্ম-বস্তুর প্রতি

আসক্ত হয়ে পড়েছে। তার এ আসক্তি পূরণে কেউ প্রতিবন্ধক হলে সে তাকে শত্রু মনে করে এবং তার দোষদর্শনে প্রবৃত্ত হয়। এটিই জীবের মোহ।

দোষদর্শনের কুফল

প্রকৃতির গুণের দ্বারা তাড়িত জীব স্বভাবতই অন্যের দোষদর্শন করে সত্য, কিন্তু সে দোষদর্শন তার পক্ষে হিতকর না হয়ে সমূহ ক্ষতির কারণ হয়। এ সম্বন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ (ভা. ১১/২৮/১-২) নিম্নরূপ–

পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥
পরস্বভাবকর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥

অর্থ : প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট এ নিখিল বিশ্বকে একাত্মক (এক অন্তর্যামী পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) জেনে অপরের স্বভাব ও কর্মসমূহের প্রশংসা ও নিন্দা করবে না। যে অন্যের স্বভাব ও কর্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করে, অসৎবস্তুতে অভিনিবেশের কারণে সে সত্বর স্বার্থ হতে বিচ্যুত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের এ উপদেশের মর্ম হলো– বিশ্বের স্রষ্টা ভগবান জীব সৃষ্টি করে প্রত্যেক জীবের ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির চালকরূপে তাঁর হৃদয়ে অবস্থান করছেন। জীব নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে এবং উক্ত কর্মফল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আরও নতুন কর্ম করছে। ভগবান তাতে নির্লিপ্ত থেকে সাক্ষীরূপে সেসব দেখছেন এবং কর্মানুসারে ফলভোগের ব্যবস্থাও করছেন। এটি না বুঝতে পেরে যে নিজের কোনো অনিষ্টকারীর প্রতি দোষারোপ করে, সে নিতান্ত নির্বোধ। অন্যের দোষদর্শন করলে কোনো লাভ তো হয়ই না, বরং ক্ষতিই হয়ে থাকে। কারণ সে যার দোষ দেখে, তার দোষের কথা সর্বক্ষণ চিন্তা করতে করতে তাতেই অভিনিবিষ্ট হয় এবং পরিণামে সেও সেই দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

স্বদোষদর্শী না হলে অদোষদর্শী হওয়া যায় না

স্বদোষদর্শনে যার প্রবৃত্তি নেই, সে কখনোই অদোষদর্শী বা অপরের গুণগ্রাহী হতে পারে না। নিজের আচরণে কোথায় ত্রুটি আছে, যার জন্য সাধনে উন্নতি হচ্ছে না, যার দৃষ্টি সর্বক্ষণ সেদিকে, তার হৃদয়ে সর্বদা আত্মধিক্কার জন্মে তাকে দৈন্যসমুদ্রে নিমজ্জিত করবেই করবে। সে অবস্থায় অন্যের দোষদর্শন করার সময় তার আসবে কোত্থেকে? এমনকি সে তার বিদ্বেষী ও প্রাণঘাতীর পর্যন্ত দোষদর্শন না করে তারা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা চালিত হয়ে এরূপ আচরণ করছে বলে বিচার করবে। সুতরাং এটি তার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিধান জেনে কৃষ্ণস্মরণপূর্বক সে প্রাণঘাতীর ছুরির সামনে হাসতে হাসতে বুক পেতে দেবে, বিষধর সর্পের দংশনে বিন্দুমাত্রও ভয়ে ভীত না হয়ে ধীরস্থিরভাবে কৃষ্ণস্মরণপূর্বক তাকে বরণ করে নেবে। আমার পূর্বকর্ম অনুসারে যদি এর দ্বারা আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তবে আত্মরক্ষার জন্য বৃথা চেষ্টা করে দেহের চিন্তায় মৃত্যুবরণের চেয়ে কৃষ্ণস্মৃতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়স্কর। এ স্থলে বৃথা ভীত হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টায় দুঃখ বরণ করা মূর্খতা ছাড়া আর কী হতে পারে?

এ সম্বন্ধে শ্রীরামানুজাচার্যের শিষ্য শ্রীকুরেশাচার্যের আদর্শ আচরণ সবার চোখ খুলে দেবে। তিনি তার অনিষ্টকারী কৃমিকণ্ঠের নৃশংস, চক্ষু-উৎপাটনকারী ও প্রাণঘাতী অনুচরগণের দোষদর্শন না করে তাদের বলেছিলেন, "তোমরা আমার যথার্থ বান্ধব। কারণ যে চক্ষু দুটি সর্বদা আমাকে জড়রূপ দর্শনজনিত মোহে প্রলুব্ধ করে শ্রীগুরুপদনখের সৌন্দর্যদর্শন থেকে বিক্ষিপ্ত করত, আমার মাংসদর্শনকারী সেই চক্ষু দুটিকে নষ্ট করে তোমরা আমার মহোপকার সাধন করেছ। শ্রীবিষ্ণু তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।" বাস্তবে চক্ষু উৎপাটিত হলেও নির্যাতনকারীর প্রতি এরূপ বিচার ও স্বদোষদর্শন যে কত তৃণাদপি সুনীচতা ও তরোরিব সহিষ্ণুতার পরিচায়ক, তা রজোস্তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত পরদোষদর্শী জীবের পক্ষে বোঝা দুষ্কর।

কর্ণাটদেশীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হয়ে সম্রাট হুসেন শাহের খাজাঞ্চি ও প্রধানমন্ত্রীরূপে উচ্চপদে আসীন থেকেও শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর হৃদয়ে দম্ভের লেশমাত্রও ছিল না। তার পরিবর্তে নিজেদের স্বভাবসুলভ দৈন্যপূর্ণ প্রার্থনার দ্বারা তাঁরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়কে জয় করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর অসীম কৃপাভাজনও হয়েছিলেন। এর সবই অনুভূতির কথা, সভামঞ্চের বক্তৃতা কিংবা লেখনীর দ্বারা প্রদর্শিত লোকদেখানো উচ্ছ্বাস নয়। মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ভক্তিসাধকেরই তা স্বভাবসুলভ ভাব।

এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি–

শ্রীকৃষ্ণকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করা উচিত এবং শুদ্ধভক্তের সেবা করার মাধ্যমেই তা কেবল কেউ করতে পারে। আমাদের প্রথম কর্তব্য হলো আমাদের গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করা, যিনি ভগবানের কৃপা লাভের ব্যবস্থা করেছেন। সাধারণ মানুষমাত্রই তাই অবশ্যই প্রথমে গুরু অথবা ভক্তের সেবা শুরু করবে। তাঁদের কৃপায় ভগবান তুষ্ট হবেন। ভক্তের চরণধুলি মস্তকে ধারণ না করা পর্যন্ত উন্নতির কোনো সম্ভাবনাই নেই। শুদ্ধভক্তের সান্নিধ্যে না যাওয়া পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানকে কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

ভক্ত যদিও অপমানকারীকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু কৃষ্ণ এ ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি ভক্তের প্রতি সংঘটিত যেকোনো অপমান কখনো সহ্য বা ক্ষমা করেন না। তাই যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে চাই, তবে অবশ্যই ভক্তদের কখনো অপমান করা যাবে না।
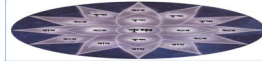
দ্বিতীয় নামাপরাধ

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং ।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥

শিব, ব্রহ্মাদি দেবতাদের নাম ভগবানের নামের সমান বা তা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা।

দার্শনিক আলোচনা

কোনো বস্তু থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র অন্য কোনো বস্তু পরস্পর সমান হতে পারে। কিন্তু কোনো বস্তু থেকে উৎপন্ন কোনো বস্তু সে বস্তু থেকে যেমন ভিন্ন বা স্বতন্ত্র হতে পারে না, তেমনি পরস্পর সমানও হতে পারে না। যেমন দুধ থেকে উৎপন্ন দই, দুধ থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়, আবার উভয়ে সমানও নয়। দুধ থেকে দই হয়, কিন্তু দই থেকে দুধ হয় না। দুধ কারণ, আর দই কার্য। সুতরাং উভয়ে অভিন্ন হলেও সমান নয়। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ থেকে শিব, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কেউই যেমন শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নন, তেমনি কেউই শ্রীকৃষ্ণের সমান নন।
অতএব শিব, ব্রহ্মাদি দেবতাকে শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র মনে করা এবং উভয়কে ভিন্ন বোধের ফলে সমান মনে করা– উভয় প্রকার বুদ্ধিই পরস্পর কার্যকারণরূপে নামাপরাধ সংঘটক।

শ্রীকৃষ্ণই নিখিল সৃষ্টির মূল, সবকিছুর আদি কারণ (*সর্বকারণকারণম্*)। শ্রীকৃষ্ণই '*একমেবাদ্বিতীয়ম্*'। তিনি এক এবং দ্বিতীয়রহিত তত্ত্ব। সুতরাং তিনিই সর্ববীজস্বরূপ। যেমন : কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল– সবই 'অঙ্গী' বৃক্ষের অঙ্গ এবং তা অঙ্গীকে আশ্রয় করে থাকে। অঙ্গী অঙ্গের আশ্রয়ে থাকে না। আবার হাত-পা, চোখ-কান ইত্যাদি অঙ্গ যেমন দেহের আশ্রয়ে থাকে, দেহ হাত কিংবা অন্য কোনো অঙ্গের আশ্রয়ে থাকে না। তেমনি সবই কৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকে, কিন্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ কারও আশ্রয়ে থাকেন না। কৃষ্ণই সর্বাশ্রয়– সকলেই কৃষ্ণাশ্রিত। কৃষ্ণই সর্বকারণ– সকলেই তাঁর কার্য।

আবার বৃক্ষ থেকে যেমন তার শাখা-প্রশাখাদি ভিন্ন নয়, তেমনি শাখা-প্রশাখাদি বৃক্ষের সমানও নয়। একইভাবে কৃষ্ণ থেকে যেমন দেবতাদি ভিন্ন নন, তেমনি কেউ সমানও নন। সেজন্যই শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রকাশিত শিব, ব্রহ্মাদি দেবতা বা অন্য কোনো কিছুকে কৃষ্ণের সমান মনে করা অপরাধ। শুধু তা-ই নয়, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা আরাধ্য হওয়ায় অন্যান্য দেবতা-আরাধনার অবকাশ থাকে না। বৃক্ষের মূলে জল সেচন করলে যেমন শাখা-প্রশাখা সকল অঙ্গেরই পুষ্টি সাধিত হয়, তেমনি এক কৃষ্ণের আরাধনায় সবার আরাধনাই সিদ্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং ভুলে গেলে চলবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণু থেকে শিব-ব্রহ্মা আদি কোনো দেবতাই ভিন্ন নন, এমনকি সমানও নন।

মূল-কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প নিয়েই বৃক্ষ। এর কোনোটি ছাড়া যেমন বৃক্ষ হতে পারে না, তেমনি এর কোনোটিই বৃক্ষের সমান বা তা থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না।

সুতরাং ব্রহ্মে উক্ত ত্রিবিধ ভেদের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য না থাকায় একমাত্র ব্রহ্মই '*একমেবাদ্বিতীয়ম্*'। অর্থাৎ–

(১) ব্রহ্মের সমান স্বতন্ত্র দ্বিতীয় কোনো বস্তু না থাকায় ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়।
(২) ব্রহ্ম থেকে পৃথক স্বতন্ত্র দ্বিতীয় কোনো বস্তু না থাকায় ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়।
(৩) ব্রহ্মের অন্তর্গত স্বতন্ত্র দ্বিতীয় কোনো বস্তু না থাকায় ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়।

ব্রহ্মের অন্তর্গত স্বতন্ত্র বস্তুজনিত কোনো ভেদ না থাকায় ব্রহ্ম ভেদশূন্য এক ও অদ্বিতীয় বস্তু। বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল সকলের মধ্যে ভেদ থাকলেও বৃক্ষ থেকে তারা স্বতন্ত্র নয় বলে এই ভেদকে ভেদ বা দ্বিতীয় বস্তুর সমাবেশ বলা যায় না। বৃক্ষের অন্তর্গত সবই বৃক্ষাধীন, অর্থাৎ বৃক্ষের ওপর নির্ভর করে বা বৃক্ষ সত্তাতে সত্তাবান হওয়ায় এ ভেদকে ভেদ বলে গণনা করা যায় না– তার সবই এক বৃক্ষেরই কার্য মাত্র। পৃথিবীর যেকোনো দেশ পৃথিবীর মধ্যেই অবস্থিত; কোনো দেশই পৃথিবীর সমান নয়, আবার পৃথিবী থেকে পৃথকও নয়। কিন্তু সব দেশ নিয়েই পৃথিবী গঠিত। মানবমূর্তি হতে হলে মাথা, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব থাকতেই হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়েই অঙ্গীর সত্তা এবং শক্তি নিয়েই শক্তিমানের সত্তা। অঙ্গহীন অঙ্গী এবং শক্তিহীন শক্তিমান আকাশকুসুম কল্পনামাত্র।

তাই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে শাস্ত্রে স্বতঃসিদ্ধ– সজাতীয় ভেদহীন, বিজাতীয় ভেদহীন এবং স্বগতভেদহীন তত্ত্ব বা *একমেবাদ্বিতীয়ম* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তিনি **সজাতীয় ভেদহীন :** চিৎশক্তি ও চিৎধামসহ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, কলা অবতার ও নিত্য পরিকরগণ কেউই তাঁর থেকে আলাদা নন। **বিজাতীয় ভেদহীন :** জড় ব্রহ্মাসমূহ অচিৎ হওয়ায় বিজাতীয়, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে আছে– *আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি* (২/১/২৮), অর্থাৎ নিজেকে (শক্তির মাধ্যমে) জগৎরূপে পরিণত করেও পরমব্রহ্ম অবিকারী থাকেন। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াই জড় ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান। আর শক্তি ও শক্তিমান সর্বদাই অভেদ। **স্বগত ভেদহীন :** দেহ ও দেহীর মধ্যে ভেদকেই স্বগত ভেদ বলে। জীবের ক্ষেত্রে দেহ ও দেহী ভিন্ন তো বটেই পঞ্চভূতের দ্বারা তৈরি দেহের সর্বত্র সব উপাদান সমভাবে না থ াকায় এর ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যেও ভেদ থাকে; এজন্য এক অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে না। যেমন : চোখের কাজ কান বা কানের কাজ চোখ করতে পারে না। কিন্তু পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দেহ থেকে অভিন্ন, অর্থাৎ তাঁর স্বগত ভেদ নেই; যেকোনো অঙ্গ যেকোনো অঙ্গের কাজ করতে পারে– *অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি... (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩২)*। দুটি বস্তু স্বতন্ত্র, স্বতঃসিদ্ধ ও নিরপেক্ষ হলেই কেবল তারা পরস্পর ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু এক শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বস্তু নেই– তাই তিনি *একমেবাদ্বিতীয়ম*।

মোটকথা, শ্রীকৃষ্ণই সর্বকারণের কারণ, সর্বমূল, সকল অভিব্যক্তির বীজ– একমেবাদ্বিতীয়ম্-তত্ত্ব, তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয়, সাক্ষাৎ বিষ্ণু বা নারায়ণ এবং রাম-নৃসিংহাদি নিখিল ভগবৎস্বরূপের অবতারী, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি সকল দেবতা তাঁরই বিভূতি; স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির মূল শক্তিমান তিনিই; তিনিই নিজ শক্তির দ্বারা বাইরে সকল বস্তুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে বিরাজ করে ভক্তজনের মন ও নয়নসমক্ষে সর্বশ্রীসমন্বিত ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ অনন্ত মহিমা ও মাধুর্যময় নরবপুস্বরূপে প্রকাশিত। তাঁর এ তত্ত্ব তাঁর অনন্য ও একান্ত ভক্তজন ভিন্ন অন্য কেউই অবগত হতে পারে না। এজন্যই দেবোপাসকগণ তাঁকে সকল দেবতার অন্তর্যামী মূল কারণরূপে অবগত না হওয়ায়, তাঁর থেকে স্বতন্ত্রবোধে দেবতাদের সকাম উপাসনাতেই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে থাকে। এর ফলে অনিত্য বিষয়সমূহ ভোগ করে বারবার জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার আবর্তে ঘুরতে থাকে।

এ জন্য বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদজ্ঞান করা দোষের। শিবাদি দেবতা শ্রীবিষ্ণু থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করলে ভেদজ্ঞান হয়। শ্রীবিষ্ণু একজন ঈশ্বর, শিবাদি দেবতাগণও এক একজন ঈশ্বর– এরূপ মনে করলে বহু ঈশ্বর মানার অপরাধ হয়ে পড়ে। তবে সেসব দেবতাকে শ্রীবিষ্ণুর গুণাবতার বা অধিকৃত দাস বলে জানলে বা পূজা করলে কোনো অপরাধ হয় না।

সংসারবদ্ধ জীব নিজ অধিকারভেদে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে, সেটাই সনাতন ধর্মের রীতি। পুণ্যভূমি ভারতে এ বর্ণাশ্রমধর্ম পুরো সমাজবিজ্ঞানে উদিত হয়েছে এবং ঋষিগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যতদিন বৈধজীবনের প্রয়োজন, ততদিন বর্ণাশ্রমধর্মে স্থিত হয়ে ভজন করতে করতে জীবের স্বভাব এতো সুন্দর হয় যে বিধির প্রেরণা ছাড়াই বৈধজীবনের উচ্চতা সে লাভ করে।

সংকীর্ণ মায়াবাদীরা জড়জগতের বিশেষ বৈচিত্র্য দেখে মনে করে যে, চিৎতত্ত্বে এমন বৈচিত্র্য নেই। এই অসম্পূর্ণ বিশ্বাস থেকেই সে নীরস হয়ে শুষ্ক কল্পিত ব্রহ্মকে চিন্তা করে। ব্রহ্মের স্বরূপগত নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্বীকার করতে পারে না। তা স্বীকার করলে ব্রহ্মই বিষ্ণুরূপে পরিজ্ঞাত হন। এ জন্যই মায়াবাদ জীবের জন্য দুর্ভাগ্য। সর্বদেবার্চিত শ্রীবিষ্ণুর চরণ ছেড়ে তারা খণ্ডবুদ্ধিতে এক কল্পিত ব্রহ্মে আবদ্ধ হয়ে হিতাহিত বুঝতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারলে কেবল নির্বিশেষবাদই দূর হয় না, সমস্ত তর্কগত বিরোধও দূর হয়।

তাই অনুধাবন করুন–

সকল দেবতার উপাসনার মধ্যে পঞ্চদেবতার উপাসনার প্রাধান্য থাকায় বেদে ‘পঞ্চসূক্ত’ হিসেবে পাঁচ প্রধান উপাসক ও সম্প্রদায়ের উপাসনা বিহিত হয়েছে; যথা :

১। **‘শিবসূক্ত’ :** শিবের উপাসনা, শৈব সম্প্রদায়ের জন্য।
২। **‘দেবীসূক্ত’ :** শক্তির উপাসনা, শাক্ত সম্প্রদায়ের জন্য।
৩। **‘বিনায়কসূক্ত’ :** গণেশের উপাসনা, গাণপত্য সম্প্রদায়ের জন্য।
৪। **‘সূর্যসূক্ত’ :** সূর্যের উপাসনা, সৌর সম্প্রদায়ের জন্য।
৫। **‘পুরুষসূক্ত’ :** শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য।

এ থেকে পৃথকভাবে পঞ্চ সম্প্রদায়ের পঞ্চ উপাসনার ব্যবস্থাই প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু একটু স্থিরভাবে চিন্তা করলেই সহজে বোঝা যায় যে, পৃথকভাবে প্রথমে চার উপাসনা ও উপাসক সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করা হয়েছে। সে অনুসারে পঞ্চমটির নাম ‘বিষ্ণুসূক্ত’ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুই যে সর্বব্যাপক ও সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা, তা বোঝানোর জন্যই ‘বিষ্ণুসূক্ত’ না বলে ‘পুরুষসূক্ত’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু ‘পুরুষ’ অর্থে ‘পুরীতে’ ইতি ‘পুরুষ’; অর্থাৎ যিনি সর্বজীবের দেহরূপ পুরমধ্যে শায়ি ... ভেদে দ্বিবিধ। পরমাত্মাই আশ্রয় ও শক্তিমান, জীবাত্মা তাঁর ... পরমাত্মা। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ মূল পরমাত্মা।

সুতরাং পঞ্চম সূক্তকে ‘পুরুষসূক্ত’ নামে উল্লেখ করায় এ ... বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ যে পুরুষ সর্বভূতের অন্তর্যামী, তিনি ... বিদ্যমান থেকে তাঁদের প্রেরণা দিচ্ছেন এবং তাঁদের আত্মার ... পুরুষ বা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।

সারকথা হলো, আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণে সাপেক্ষ এবং অন্য দেবতা ... বা অনাদর নিষিদ্ধ।

তুলসী বৃক্ষ

দৃষ্টান্তস্বরূপ, তুলসী বৃক্ষ আমাদের আরাধ্য হওয়ায় এর শাখাসহ কোনো অঙ্গই অনাদরণীয় নয়। যেকোনো অংশকে অবজ্ঞা করা হলে তার দ্বারা পাতাসহ সমস্ত বৃক্ষেরই অনাদর বা অবজ্ঞা করা হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ থেকে নিখিল দেবতার উৎপত্তি হওয়ায় যেকোনো দেবতার প্রতি অবজ্ঞা করা হলে শ্রীকৃষ্ণেরই অবজ্ঞা হয়। এ জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, “*অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা*
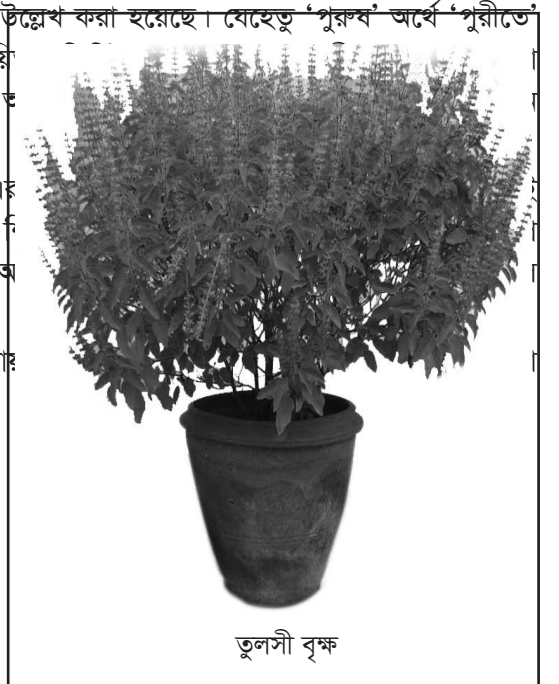
না করিব।" (২/২২/৬৫) দেবতাগণ সবাই ভগবানেরই বিভূতি বা শক্তি। তাঁরাও কৃষ্ণভক্ত; এ জন্য তাঁদের নিন্দায় দোষ হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণেরই পরিবারভুক্ত। ঠিক যেমন স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র সেব্য হলেও স্বামীর পরিবারভুক্ত শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, ননদ-দেবর, ভাশুর-জাসহ স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়ও যথাযোগ্য সেবা পাওয়ার যোগ্য হয়ে থাকেন, নতুবা স্বামী সন্তুষ্ট হতে পারেন না এবং স্ত্রীর পাতিব্রত্যধর্মেও দোষ পড়ে। তেমনি বৈষ্ণবের কাছে শ্রীকৃষ্ণই (শ্রীমন্মহাপ্রভুই) একমাত্র সেব্য হলেও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত এবং তাঁর বিভূতিস্বরূপ দেবতাদিও যথাযোগ্যভাবে বন্দনীয় বা অবজ্ঞার বিষয় নন। তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা করলে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হতে পারেন না।

শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, কুকুর, অশ্ব, গর্দভ আদিও যখন বৈষ্ণবের কাছে প্রণম্য, তৃণগুল্মাদি সমস্ত জীবই যখন ভগবদধিষ্ঠান বলে বৈষ্ণবের কাছে সম্মানের পাত্র, তখন ভগবৎবিভূতি বা শক্তিরূপ দেবতাদির নিন্দা যে একান্ত অমঙ্গলজনক, তা সহজেই অনুমেয়। যথা : "*প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচণ্ডালগোখরম্*" (ভা. ১১/২৯/৮)। মূল দেবতাগণ সকলেই কৃষ্ণভক্ত। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"। গোলোকেই সকলের মূল সমাবেশ। প্রাকৃত স্বর্গাদি লোকের দেবতাগণ মূল দেবতাগণেরই 'অংশ-আবেশ'। প্রাকৃত দেবতাগণ মায়ামুগ্ধ হয়ে জীবের ন্যায় সর্বদা কৃষ্ণস্মৃতি না থাকলেও মূল দেবতাগণ সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের দাস-দাসীভাবযুক্ত ও কৃষ্ণভক্ত। তাঁদের মধ্যে শিব আবার পরম বৈষ্ণব। তাই বলা হয়, "*বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*"।

কৃষ্ণভক্তগণ অন্য দেবে ও অন্য শাস্ত্রের নিন্দা করেন না। কারণ তিনি শুষ্ক তর্ক থেকে দূরে থাকেন। অন্যশাস্ত্রে দেবতাদের ঈশ্বর বলা হলেও তা কেবল জীবের অধিকারসম্মত এক একটি পথমাত্র। সকল শাস্ত্রই স্ব-স্ব অধিকারীকে চরমে কৃষ্ণভক্ত করার চেষ্টা করে। এ জন্য দেবতা ও শাস্ত্রের নিন্দা কখনোই করা উচিত নয়। তা করা অপরাধ। অন্য দেবতা ও শাস্ত্রের প্রতি নিন্দা পরিত্যাগ করলে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তের কৃপা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের নামকে অন্যান্য দেব-দেবী, এমনকি ভগবানের অন্যান্য প্রকাশবিগ্রহের নামের সঙ্গে সমান মনে করাও দ্বিতীয় অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের নাম পরম শ্রেষ্ঠ। যখন কৃষ্ণনামের পরিবর্তে ভগবানের অন্য নাম ব্যবহার করা হয়, তখন ভগবদুপলব্ধির তারতম্য ঘটে। 'কৃষ্ণ' নাম প্রেমের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিস্বরূপ। কারণ তিনিই অখিল প্রেমরসের অসীম নিলয়। এ জন্য অন্য ভগবৎস্বরূপকে নয়, কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই বলা হয় 'রসরাজ'। শ্রীকৃষ্ণ ৬৪ গুণের অধিকারী, নারায়ণসহ তিন শ্রেণির পুরুষাবতারগণ ৬০ গুণের অধিকারী, শিব ৫৫ গুণের অধিকারী এবং জীব কমবেশি ৫০ গুণের অধিকারী হতে পারে। কৃষ্ণনামের সাথে দেবতাদের নামের আরেকটি পার্থক্য হলো, কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন; কিন্তু দেবতাদের ক্ষেত্রে তেমনটি কখনোই সম্ভব নয়।

দেবারাধনা সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রোক্তি

মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ এবং স্বাংশ ভগবৎস্বরূপসহ দেবতাদের মধ্যে সমতাচিন্তন নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ (পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি ব্রহ্মা ও শিবকে ভগবান নারায়ণের সমতুল্য বলে মনে করে, সে অপরাধী ও পাষণ্ডী।

স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে–

বাসুদেবং পরিত্যাজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরম্ পরিত্যাজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥

অর্থ : যিনি ভগবান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তিনি সেই ব্যক্তির মতো আচরণ করেন যে তার নিজের মাকে পরিত্যাগ করে একজন পিশাচির আশ্রয় গ্রহণ করে।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙক্তে হলাহলং বিষম্ ॥ (স্কন্দ পুরাণ)

অর্থ : বাসুদেবকে পরিত্যাগপূর্বক যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, সেই মূঢ়াত্মা অমৃত ত্যাগ করে হলাহল বিষ পান করে থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ (৯/২৩)

অর্থ : হে কৌন্তেয়, যাঁরা অন্য দেবতাদের ভক্ত এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পূজা করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন।

অন্যদেবসহ সম বিষ্ণুকে যে মানে।
সে বড় অজ্ঞান ঈশতত্ত্ব নাহি জানে ॥
এ জড়-জগতে বিষ্ণু পরম ঈশ্বর।
গিরিশাদি যত দেব তাঁর কিঙ্কর ॥
বাসুদেব ছাড়ি' যেই অন্যদেবে ভজে।
ঈশ্বর ছাড়িয়া সেই সংসারেতে মজে ॥

(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

ক্ষমতা, পদ আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য লালায়িত জড় বিষয়কামী অভক্ত তপস্বীর দ্বারা পদ হারানোর ভয়ে ইন্দ্র আদি দেবতাগণ অনেক সময় তাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করলেও দেবতাগণের অধিকাংশই কৃষ্ণভক্তি অভিলাষী সাধকের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ও সদয় হন এবং নানাভাবে তাঁদের সহায়তা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য দেবী কাত্যায়ণীর (দুর্গাদেবী) পূজা করতেন। শিব অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। জড়দেহকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করাকে বলা হয় মিথ্যা অহঙ্কার। এ মিথ্যা অহঙ্কার অপসৃত হলেই জীব স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। শিবের আরাধনা করে অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে জীব নির্মল হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে। (ভা. ৩/২৬/৬১, তাৎপর্য)

দ্বিতীয় অপরাধের প্রতিকার

ঐকান্তিক অনুতাপের সাথে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ এবং আর কখনোই এ অপরাধ না করার মাধ্যমে এ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কৃষ্ণের সাথে আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান পরিবর্ধিত হওয়ার সাথে সাথে নিরন্তর কৃষ্ণনাম স্মরণ ও কীর্তনের মাধ্যমে এ অপরাধ ক্রমে ক্রমে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

প্রমাদে যদ্যপি হয় অন্যে বিষ্ণুজ্ঞান।
তবে অনুতাপে করি বিষ্ণুতত্ত্বধ্যান ॥
শ্রীবিষ্ণু স্মরিয়া করি অপরাধ ক্ষয়।
যত্নে দেখি, আর না সে অপরাধ হয় ॥

বহুদেবসেবিসঙ্গ করিব বর্জ্জন।
একেশ্বর বৈষ্ণবের করিব পূজন ॥

(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

শ্রীবিষ্ণুস্মরণ
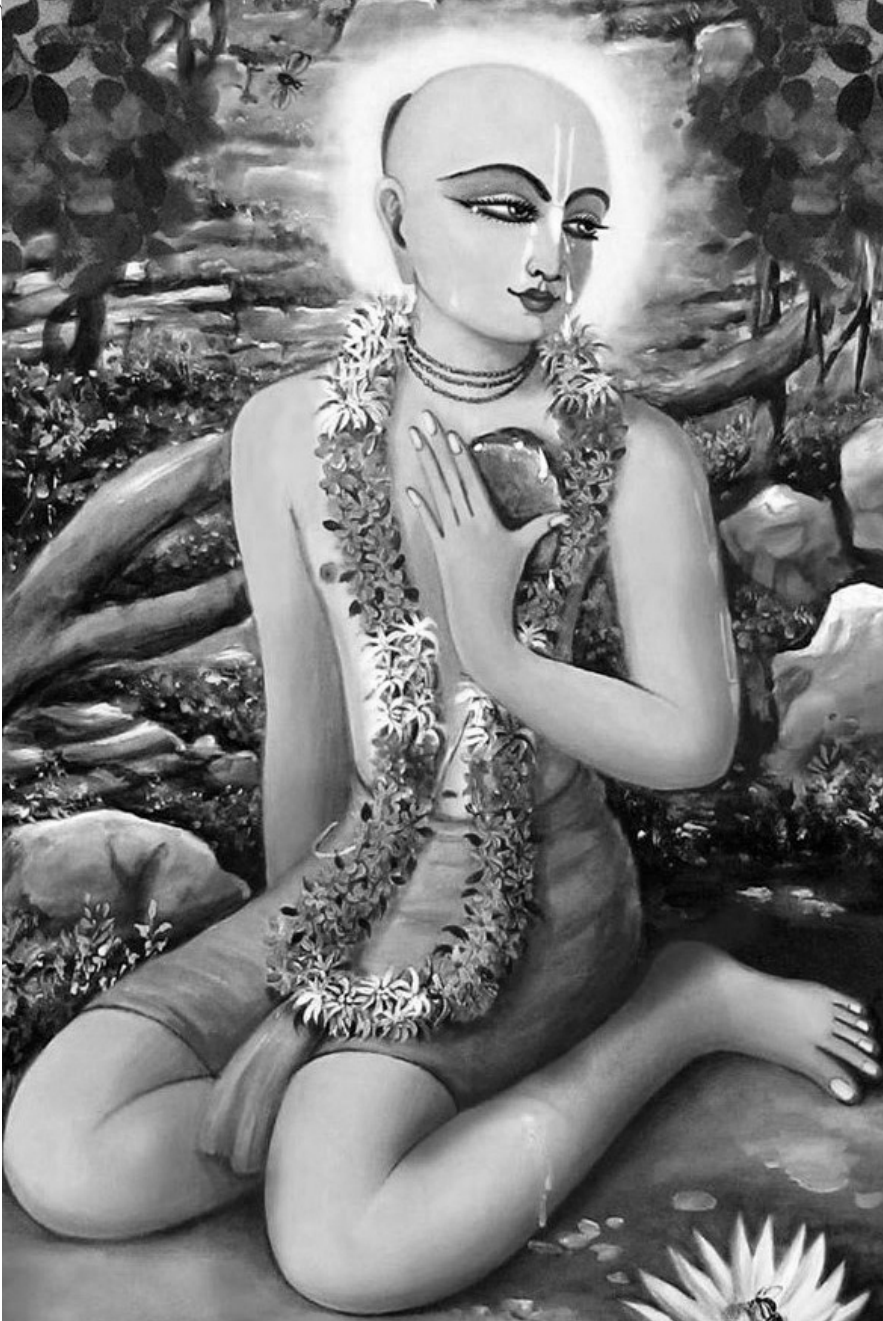
তৃতীয় নামাপরাধ

শ্রীগুরুদেবকে অবজ্ঞা করা : "*গুরোরবজ্ঞা*" অর্থাৎ নামতত্ত্ববিদ শ্রীগুরুদেবের আদেশের অবজ্ঞা করা।

এ ভবসমুদ্রে পতিত জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করে এ থেকে উদ্ধারের জন্য শ্রীগুরুই একমাত্র কর্ণধার। যেসব ব্যক্তি গুরুগ্রহণ না করে নিজের বুদ্ধি ও সামর্থ্যের জোরে ভবসমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা করে, তারা বড়ই নির্বোধ। জগতের কোনো বিষয়ই যখন গুরু-উপদেশ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না, তখন সকল বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে পরমার্থ, তা কৃতকর্মা গুরুর উপদেশ ছাড়া কীভাবে সিদ্ধ হতে পারে? এ জগতে যিনি যে বিষয়ে বিজ্ঞ, তিনি সে বিষয়ে গুরু হওয়ার যোগ্য হন। তাই এ অনিত্য দুঃখময় জগৎ থেকে উদ্ধারের জন্যও পরমার্থ বিষয়ে যিনি কৃতকর্মা, তিনিই গুরু হওয়ার উপযুক্ত। জড়বন্ধনমুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিই গুরু হওয়ার যোগ্য।

এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "প্রথম জন্ম মাতা-পিতার কাছ থেকে হলেও প্রকৃত জন্ম ও প্রকৃত জীবন শুরু হয় সদগুরু গ্রহণ করে তাঁর সেবা করার মাধ্যমে। পূর্ণজ্ঞানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও সান্নিধ্যে নিত্য আনন্দ লাভের জন্য ভগবদ্ধামে যাওয়ার পথটি তখন উন্মুক্ত হয়ে যায়।"

শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা কীভাবে হয়, তা বোঝার আগে গুরুদেবের স্বরূপ ও কার্য সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। নিচে অতি সংক্ষেপে গুরুতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হলো :

গুরুতত্ত্ব

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

(শ্রীগৌতমীয়তন্ত্র ৭ম অধ্যায়)

অজ্ঞানাদিরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবের অন্ধকার নাশ করে আলোকরূপ জ্ঞান প্রদান করেন যিনি, তিনিই গুরু এবং

জীবের অবিদ্যারূপ অজ্ঞানান্ধকার নাশ করে জ্ঞানালোক প্রদান করাই গুরুদেবের কার্য বা মহিমা।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ (গী ৭/২৬)

অর্থাৎ হে অর্জুন, আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্থাবর-জঙ্গম সবকিছু সম্বন্ধে জানি, কিন্তু কেউই আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানে না।

হ্যাঁ, এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বজ্ঞ, তিনি ত্রিকালের সমস্ত কিছুই অবগত, কিন্তু কেউই তাঁকে পূর্ণরূপে জানেন না। শুধু তাই নয়, তাঁকে লাভ করার জন্য সাধ্য ও সাধন বিষয়েও তিনি ছাড়া পূর্ণরূপে অন্য কেউই জানেন না। সুতরাং, এক শ্রীকৃষ্ণই তাঁর বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান-প্রদাতা গুরুতত্ত্বরূপে সর্বদা বিদ্যমান থেকে সমস্ত জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করার জন্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি প্রদানের জন্য ব্যাষ্টিগুরুরূপে তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তগণকে আশ্রয় করে জীবকে সংসার থেকে উদ্ধার করে নিজের চরণে স্থান দিয়ে থাকেন। এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সব গৃহের আলোই যেমন সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত এক অখণ্ড আলোরই আংশিক প্রকাশ, তেমনি সকল শিষ্যের সকল ব্যাষ্টিগুরুই এক সমষ্টিগুরুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজনানুরূপ আংশিক প্রকাশ।

শ্রীকৃষ্ণই সমষ্টি-গুরুতত্ত্ব বলে তাঁকে জগৎগুরু নামেও শাস্ত্রে কীর্তিত হতে দেখা যায়– "*গোপীরতো রুরুনখধারী হারী জগদ্গুরুঃ।*" (*গোপাল সহস্রনাম, ৯৯*) শ্রীমদ্ভাগবতেও বহু স্থানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'পরমগুরু', 'গুরু' ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

শ্রীমধ্বাচার্যকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্যেও (১০/২৯/১৫) উল্লেখ করা হয়ে

গুরুঃ শ্রীব্রহ্মণো বিষ্ণুঃ সুরাণাঞ্চ গুরে
মূলভূতো গুরুঃ সর্ব্বজনানাং পুরুষো

অর্থাৎ, শ্রীবিষ্ণু শ্রীব্রহ্মার গুরু এবং দেবতাগণের গুরুর গুরু। অতএব, পুরু
তাই তো, শ্রীচৈতন্যকে জগৎগুরুরূপে চিনতে পেরে ঈশ্বরপুরীপাদ বলেছে

তুমি সে জগৎগুরু জানিল নিশ্চয়। / তোমার গুরুর যো
তবু তুমি লোকশিক্ষা নিমিত্ত কারণে। / করিয়া আমারে

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানো হলো :

ঘটে যেমন দেবতাদের আবির্ভাব হয়, ভক্তাশ্রয়েও তেমনি ভগবানের ব্যাষ্টিগুরুরূপের আবির্ভাব সূচিত হয় বলে বুঝতে হবে। দেবতার আবির্ভাব জ্ঞান হওয়ায় উপাসকের কাছে ঘট ও দেবতা পৃথকভাবে অনুভূত হয় না, বরং একরূপেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ঘটের ঘটজ্ঞান থাকাই স্বাভাবিক। তেমনি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক গুরুতে ব্যাষ্টিগুরুরূপে ভগবানের আবির্ভাব হলেও এবং শিষ্যের কাছে গুরুদেব ভগবানের প্রকাশ বলে বিবেচিত হলেও, ব্যাষ্টিগুরু অবশ্যই নিজেকে ভগবা-নের ভক্ত বলে মনে করবেন, কখনোই ভগবান বলে নয়। কিন্তু তিনি তাঁর গুরুকে ভগবানের প্রকাশরূপেই দেখবেন। ব্যাষ্টিগুরু শিষ্যকে উদ্ধার করার জন্য কেবল শিষ্যের কাছেই ভগবানের প্রকাশ বা

প্রতিনিধিরূপে গ্রাহ্য হন; কিন্তু অন্যের কাছে ভক্তরূপে দৃষ্ট হন।
কিন্তু সমষ্টিগুরু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষে সবার কাছেই
ভগবান বলে বিবেচিত হন। এটাই পার্থক্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ (১/১২৬)

এর অর্থ হলো, যদিও গুরুদেব নিজেকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাস বলে মনে করেন, তবু শিষ্য তাঁকে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ বলে জানবেন। এ জন্যই গুরু ও গোবিন্দে সমভাবেই ভক্তি করার কথা শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ *(শ্বেতাশ্বতর ৫/২৩)*

অর্থাৎ, যাঁর শ্রীহরিতে উত্তমা ভক্তি আছে, আবার শ্রীহরিতে যেরূপ শ্রীগুরুদেবের প্রতিও সেরূপ পরাভক্তি বিদ্যমান, সেই মহাত্মার নিকটই শ্রুত্যুক্ত রহস্য সব প্রকাশিত হয়।

সুতরাং, দীক্ষাগুরু ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন-তত্ত্ব না হলে শাস্ত্র উভয় স্থলে সমভক্তি করার উপদেশ কখনোই দিত না। ঘটে দেবতার অধিষ্ঠানের মতোই যে ভক্তের আশ্রয়ে গুরুতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত হয়ে শিষ্যকে দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা প্রদান করেন, সেই অধিষ্ঠান বা ভক্তরূপ গুরুদেব এবং অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ শিষ্যের কাছে একরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় তার কাছে দীক্ষাগুরুকে কৃষ্ণ থেকে ভিন্ন বোধ হয় না।

তবে নিজ গুরুকে অন্যের কাছে শ্রীকৃষ্ণ বলে প্রচার করে কৃষ্ণ-বুদ্ধিতে ভজন করার জন্য কাউকে প্ররোচিত করা অপরাধ। এজন্যই সব শিষ্যের কাছে নিজ নিজ গুরুদেব ছাড়া অন্যের গুরুকে ভগবানের ভক্তরূপেই দেখা কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্নজ্ঞানে সৎশিষ্যই সৎগুরুকে দর্শন করবেন এবং গুরুদেবও ভক্তিমান শিষ্যের কাছেই অনুভূত হবেন। তেমনি কেবল ভক্তিমান শিষ্যের পক্ষেই এ কথা অনুভূত হবে–

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥ *(ভক্তিসন্দর্ভ)*

অর্থ : শ্রীহরি রুষ্ট হলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হলে কেউই রক্ষা করতে পারেন না। অতএব সর্বপ্রযত্নে শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করতে সচেষ্ট হবে।

ঠিক সেভাবেই গুরুদেবের প্রতি ভক্তিমান শিষ্যের কাছেই গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র, গুরু ও মন্ত্রের দেবতা শ্রীহরি– এ তিন তত্ত্ব এক হয়ে শিষ্যের কাছে মূর্তিমান গুরুরূপেই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

গুরুতত্ত্ব বিষয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর–

দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু দুঁহে কৃষ্ণদাস। / দুঁহে ব্রজজন, কৃষ্ণশক্তির প্রকাশ ॥
গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু। / গুরু কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রভু ॥
(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

শ্রীগুরুদেবকে যেমন সামান্য জীববুদ্ধি করা যাবে না, তেমনি গুরুদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মনে করা উচিত নয়, কারণ তা মায়াবাদীদের মত, শুদ্ধবৈষ্ণবের মত নয়। গুরুদেব কৃষ্ণের প্রেষ্ঠজন; তাঁর মাধ্যমেই কৃষ্ণের কৃপাশক্তির প্রকাশ হয়।

এর পূর্বে গুরুদেবকে ভগবৎদৃষ্টিতে দেখার কথা বলা হয়েছে, যা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্ত কথার সাথে মিলে না। সে বিষয়টিই নিম্নোক্ত আলোচনায় পরিষ্কার করা হলো :

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে লিখেছেন– '*অন্যদা স্বগুরৌ কর্মিভিরপি ভগবদ্দৃষ্টি কর্তব্য।*'– কর্মিগণের পক্ষেও গুরুদেবে ভগবৎদৃষ্টি করা কর্তব্য। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি ভাগবত (১১/১৭/২৭) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন– যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন, "আচার্যকে আমার থেকে অভিন্ন (ভগবৎবুদ্ধিতে দেখা) বলে জানবে; কখনোই তাঁকে অবমাননা করবে না। তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ মনে করে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হবে না, কেননা গুরু সর্বদেবময়।" শ্রীজীবপাদই আবার শাস্ত্র প্রমাণ দেখিয়ে বলেছেন, "শুদ্ধভক্তগণ গুরুদেবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্ত বলে মনে করেন।" তাহলে অভিমত দুটি পরস্পর ভিন্ন হলো নাকি? না, বরং একটি অন্যটির পরিণাম। শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত বা প্রেষ্ঠজন এ জন্যই ভগবানের সাথে তাঁর অভেদদৃষ্টির কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে অভেদদর্শন এ জগতেও বিরল নয়। গুরু ও ভগবান এবং শিব ও ভগবানের মধ্যে অভেদদৃষ্টির কথা শাস্ত্রে থাকলেও গুরু ও শিবকে ভগবানের প্রিয় বলে মনে করাই প্রসিদ্ধ শুদ্ধ ভক্তগণের মত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ বলেছেন যে, শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানকে অভেদজ্ঞান করলে তা সম্বন্ধ-অনুরাগা ভক্তির প্রতিকূল হয়ে পড়ে। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও তাঁর বৃহৎভাগবতামৃতে গুরুদেবকে ভগবানের পরমপ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন (২/২/২৩৬), যেখানে শ্রীভগবান গোপকুমারকে বলেছেন, "সেই ব্রজভূমিতে আমার পরমপ্রেষ্ঠকে তুমি তোমার গুরুরূপে পুনরায় প্রাপ্ত হবে এবং তাঁর কৃপায় স্বয়ং সমস্ত বিষয় সম্যকভাবে জানতে পারবে।"

প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি গুরুদেব জীবতত্ত্বের অন্তর্গত? কিন্তু কৃষ্ণ বলেছেন– 'মর্তজ্ঞান করে গুরুদেবের প্রতি ঈর্ষা করবে না।' মর্ত শব্দের অর্থ জন্ম-মৃত্যুর কবলে পতিত সাধারণ মায়ামুগ্ধ জীব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, গুরুদেব হলেন পরমব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভবসম্পন্ন জীবন্মুক্ত ব্যক্তি; তাই তিনি সাধারণ মানুষের মতো জন্ম-মৃত্যুর অধীন নন এবং দেহত্যাগের পর তাঁকে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তাঁর মিথ্যা অহঙ্কার নেই, দেহাত্মবুদ্ধিও নেই; তাই তাঁর বন্ধন নেই এবং দোষও নেই। আর গুরুদেবকে ঈর্ষা করার অর্থ হলো তাঁর বাস্তবিক গুণকেও দোষ বলে মনে করা।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হলো, শ্রীকৃষ্ণই গুরুশক্তির মূল– সমষ্টিগুরু। ভজনার্থী শিষ্যের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণই তাঁর প্রিয়তম ভক্তের মধ্যে গুরুশক্তি অর্পণ করেন এবং সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে গুরুদেব ভজনার্থী শিষ্যকে কৃতার্থ করেন। প্রিয়ত্বের কারণেই গুরু ও কৃষ্ণকে অভেদজ্ঞান করা হয় আর শ্রীগুরুদেবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুরুশক্তি প্রকাশিত হয় বলে গুরুদেবকে ভগবানের প্রকাশ বা ভগবৎশক্তির প্রকাশ বলা হয়। এ জন্যই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গেয়েছেন– "*সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ...*" অর্থাৎ গুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীহরি, কিন্তু তিনি নিজ প্রভুর অতিশয় প্রিয়।

এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, শিষ্যের সাথে গুরুর সম্পর্ক ভগবানের সাথে ভক্তের সম্পর্কের মতোই উত্তম। একজন সদগুরু সর্বদা নিজেকে ভগবানের একজন বিনীত সেবক মনে করেন, কিন্তু শিষ্য তাঁকে অবশ্যই ভগবানের প্রতিনিধিরূপে দেখবে।

শ্রীগুরুদেব স্নিগ্ধ শিষ্যের হৃদয়েশ্বর

গুরুদেব শব্দে গুরুত্ব ও দেবত্বের, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি ও ঈশ্বরত্বের যুগপৎ প্রকাশক। তিনি কেমন ঈশ্বর? তিনি স্নিগ্ধ, অর্থাৎ হৃদয়বান শিষ্যের হৃদয়েশ্বর, মস্তিষ্কের ঈশ্বর নন। হৃদয়েশ্বর হওয়ায় তিনি শিষ্যের প্রীতির আস্পদ। যে শিষ্যের হৃদয় যত সরল, সে তাঁকে তত বেশি অনুভব করতে পারবে এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিয়োগ করে তাঁর হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করতে সমর্থ হবে। শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে যখন যে ভাবের স্ফুরণ হয়, কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্যের হৃদয়েও সে সে ভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এজন্য সাধক স্বাধীন চিন্তা না করে শ্রীগুরুচিন্তার ভেতর দিয়ে নিজের চিন্তা এবং তাঁর আনুগত্যেই ভগবৎ-লীলারস আস্বাদন করবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার করে গুরুদেবকে জানতে চায়, সে তাঁকে মানুষমাত্র জ্ঞান করে অধিকতর মায়াগ্রস্তই হয়ে থাকে।

এ পর্যন্ত দীক্ষাগুরুর তত্ত্ব ও মহিমার কথা বলা হলো নিচে শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

শিক্ষাগুরু

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে–

শিক্ষা-গুরুকেতো জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ– এই দুই রূপ ॥ *(১/১/২৮)*

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে –

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষোহপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোহন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ *(১১/২৯/৬)*

অর্থাৎ, হে ঈশ্বর, তুমি বাইরে আচার্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে দেহধারী জীবের অশুভ, অর্থাৎ ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়-বাসনা নাশ করে তার গতি প্রদান করো। অতএব, তোমাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তিরূপ পরমানন্দে নিমগ্ন হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কবিগণ কল্পান্তকাল তোমার সেবায় নিযুক্ত থেকেও তোমার উপকারের কথা স্মরণ করে কিছুতেই ঋণমুক্ত হতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোনো ভাগ্যবানে।
গুরু, অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে ॥ (২/২২/৩০)

এখানে গুরু শব্দে শিক্ষাগুরুকেই নির্দেশ করা হয়েছে। যেহেতু শিক্ষার কথাই এ শ্লোকের অভিপ্রায়। তা ছাড়া অন্তর্যামীরূপ শিক্ষাগুরুর কথাও বলা হয়েছে। পরের শ্লোকে তা আরও স্পষ্ট করা হয়েছে–

জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ– মহান্ত স্বরূপে ॥

সুতরাং বোঝা গেল যে, অন্তর্যামী গুরুর সাথে বাহ্যত সাক্ষাৎ হয় না; তিনি অন্তরে থেকে কেবল প্রেরণার দ্বারাই জীবকে শিক্ষা দেন। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 'মহান্তস্বরূপে', অর্থাৎ সাধু-সজ্জন বা ভক্তগণের দ্বারা শিক্ষা দিয়ে থাকেন প্রকারান্তরে কৃষ্ণই।

তবে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করলেও, সে অবস্থায় তিনি কেবল জীবের কর্মের সাক্ষীমাত্র। জীবের শুভাশুভ কোনো কিছুতেই লিপ্ত হন না। সুতরাং হৃদয়স্থিত পরমাত্মা জীবের অন্তর্যামী হলেও শিক্ষাদাতা নন। চিন্তনকেন্দ্র 'চিত্ত' থেকেই জীবের সকল কর্মের প্রেরণা আসে। এই অন্তর্যামীকে 'চৈত্ত্যগুরু' বলে স্পষ্টত নির্দেশ করায়, একে চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ দেব 'বাসুদেব' বলে বুঝতে হবে। যথা :

"সংকল্প-বিকল্পাত্মকং মনঃ, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ, অহংকর্ত্তা– অহংকার; চিন্তনকর্ত্তা– 'চিত্তম্'।" এবং এদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হলেন– "মনোদেবতা– চন্দ্রমা; বুদ্ধের্ব্রহ্মা; অহঙ্কারস্য– রুদ্র; চিত্তস্য– বাসুদেবঃ ॥" (তত্ত্ববোধ)

সুতরাং জীবের অন্তর্যামী চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ দেব বাসুদেবরূপ শ্রীকৃষ্ণই ভবসংসার থেকে মুক্তিলাভের জন্য ইচ্ছুক জীবকে তার উপায় শিক্ষা দান করেন। আর এ চৈত্ত্যগুরুর প্রেরণার কথাই গীতায় স্বয়ং ভগবান বলেছেন–

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" (১০/১০)

অতএব, বাসুদেব স্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণ চৈত্ত্যগুরুরূপে জীবকে শিক্ষাদান করেন। জীব চৈত্ত্যগুরুর প্রেরণা উপলব্ধি করতে অক্ষম হলে কিংবা তার চেয়ে অধিক জানার দরকার হলে বাইরে থেকে তিনিই মহান্ত, অর্থাৎ সাধুগণের দ্বারা ভজন বিষয়ে শিক্ষা বা উপদেশ দান করেন। সাধুগণ জীব বা ভক্ততত্ত্ব হলেও তাঁদের অন্তর শ্রীকৃষ্ণের সতত বিশ্রামস্থল হওয়ায় তাঁদের হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্বক্ষণ বিশ্রাম করেন; এভাবে মহান্তগণের উপদেশও প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণই

দিয়ে থাকেন।

গুরুর প্রকারভেদ

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তিন প্রকার গুরুর কথা তাঁর ভক্তিসন্দর্ভে উল্লেখ করেছেন, যথা : শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। যাঁর কাছে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ করা হয়, তিনিই শ্রবণগুরু। দীক্ষাগুরু একজনই হয়ে থাকেন। যিনি মন্ত্র বা নাম প্রদান করেন, তিনিই মন্ত্রগুরু, নামগুরু বা দীক্ষাগুরু। মন্ত্রই নাম। মন্ত্র থেকে নামকে পৃথক করলে মন্ত্রের মন্ত্রত্বই থাকে না। আবার চৈত্ত্যগুরুরূপে শিক্ষাগুরু একজন হলেও মহান্তস্বরূপে শিক্ষাগুরু বহু হতে পারেন। সাধু-মহান্ত ছাড়াও ভাগবতে (১১/৭/৩২-৩৫) চব্বিশ প্রকার শিক্ষাগুরুর উল্লেখ করা হয়েছে, যথা : পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মৌমাছি, হাতি, মধুচোর, হরিণ, মাছ, পিঙ্গলা বারনারী, কুরর (ঈগল), শিশু, কুমারী, বালিকা, তীরন্দাজ, সাপ, মাকড়সা ও ভ্রমর। তবে এসব গুরুর আচরণকৃত দৃষ্টান্ত থেকেই শিক্ষালাভ করতে হয়; যেমন, পৃথিবীর কাছ থেকে ধৈর্য ও ক্ষমা; বায়ুর কাছ থেকে ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না করে প্রাণবৃত্তিতেই সন্তুষ্ট থাকা এবং অনাসক্ত হয়ে বিষয় গ্রহণ; আকাশের কাছ থেকে আত্মার পৃথকত্ব ও অবিচ্ছেদ্যত্ব ইত্যাদি (বাকি শিক্ষাসমূহ সম্বন্ধে জানার জন্য ভাগবত ১১/৭/৩২-৩৫ দেখুন)। তবে তা চৈত্ত্যগুরুর প্রেরণায় যথাকালে সংঘটিত হয় বলে বুঝতে হবে। তাই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে চৈত্ত্যগুরুকেই কারণ বলে জানা প্রয়োজন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত তা সকলের পক্ষে ফলপ্রসূ হয় না বলেই সেসব দৃষ্টান্ত থেকে সকলেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। এ সম্বন্ধে লালাবাবুর জীবনের গল্পটি পড়ুন :

একদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সময় প্রাসাদের কাছাকাছি কোনো এক ধোপার ঘর থেকে ধোপার কণ্ঠ শোনা গেল– "দিন শেষ হলো বাসনাগুলো (কলাগাছের শুকনো পাতা বা বাকল) জ্বালিয়ে দে।" এ কথা শুনেই লালাবাবু তার সব বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে বিরাগী হয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে ভজন করতে গেলেন। এ কথা তো অন্য অনেকেই শুনেছে, এমনকি লালাবাবু নিজেও এর আগে অনেকবার শুনেছেন; কিন্তু চৈত্ত্যগুরুর প্রেরণা লাভ না করার কারণেই তাতে কোনো ফলোদয় হয়নি। তাই লালাবাবুর ক্ষেত্রে এখন যে ক্রিয়াশীলতা, তা চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ দেব বাসুদেবেরই যথাকালে প্রেরণামূলক শিক্ষাদান বুঝতে হবে।

কোনো সৎ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্যও সে সম্প্রদায়ের সকল ভক্তের শিক্ষাগুরু, যিনি সে সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করে মৌলিক বিধিসমূহ প্রণয়নপূর্বক সম্প্রদায়ের গতিশীলতা বৃদ্ধি করেছেন। এ জন্যই তাঁকে পরবর্তী প্রজন্মের প্রধান শিক্ষাগুরু হিসেবে গণ্য করা হয়। তাছাড়া সে সম্প্রদায়ের পূর্ব ও বর্তমান গুরুবর্গও শিক্ষাগুরু হিসেবে বিবেচিত হবেন।

গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ স্থাপন

জীবের অনাদি অবিদ্যারূপ অজ্ঞানান্ধকার নাশ করে প্রকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করাই শ্রীগুরুদেবের কার্য। জীবের সেই সংসার মোচনকাল উপস্থিত হলেই সমষ্টিগুরু শ্রীকৃষ্ণ ব্যাষ্টিগুরুরূপে তাঁর ভক্তের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃষ্ট শিষ্যরূপ সেই জীবকে উদ্ধার করেন।

কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কোথাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই; ভক্তসঙ্গ বা ভক্তকৃপা ব্যতীত ভক্তিলাভেরও অন্য উপায় নেই। "*কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ*।" (চৈ. চ. ২/২২/৪৮) কোনো ভাগ্যে অহৈতুকী ও সুদুর্লভ সাধুসঙ্গ এবং তাঁর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য হলে অনাদি বহির্মুখ জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণোন্মুখতা ও ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখনই কেবল তাকে উদ্ধারের জন্য গুরুতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে। তার পূর্বে তা সিদ্ধ হয় না।

তবে যথাসময়ে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক শুরুর আগে গুরুকে বুঝে নিতে হবে শিষ্যের প্রকৃষ্ট কৃষ্ণোন্মুখতা ও শ্রদ্ধা উদয়ের পাশাপাশি শিক্ষাগুরুর সঙ্গ ও উপদেশের সুফল লাভ হয়েছে কি না; ভক্তিপ্রাপ্তির বাসনা জেগেছে কি না।

অন্যদিকে শিষ্যকেও বুঝে নিতে হবে সেই গুরু কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, পরমার্থবিদ শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত কি না, নাকি তাঁর লৌকিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির অভিসন্ধি আছে। যদি উভয়ে উভয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তবেই গুরু-শিষ্যের সুমঙ্গল সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে বলে শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে বিহিত হয়েছে।

এজন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দীক্ষার পূর্বে গুরু-শিষ্যকে এক বছরকাল একত্রে বাস করে পরস্পরের স্বভাব ও যোগ্যতা পরিজ্ঞাত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে–

পরীক্ষ্যৈব গুরুঃ শিষ্যং শিষ্যোঽপি গুরুমাব্রজেৎ।
অন্যথা নরকায়ৈব প্রায়শ্চিত্তং গুরোস্তথা ॥

(ভাগবত-তাৎপর্য ১১/৩/৪৮)

অর্থাৎ, শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে পরীক্ষা করেই মন্ত্রদান করবেন এবং শিষ্যও শ্রীগুরুদেবকে পরীক্ষা করেই তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করবেন। নতুবা শিষ্য নরকাদি ভোগসহ অধোগতি প্রাপ্ত হবে এবং গুরুকেও সে জন্য প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে।

তবে এ যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত হরিনাম-সংকীর্তনের প্রভাবে জীবের চিত্তশুদ্ধি হওয়ায় যে কেউ নামসংকীর্তনে অংশগ্রহণ করে সাধুসঙ্গ ও ভাগবতী শ্রদ্ধা লাভ করে দীক্ষার উপযোগী হতে পারে।

কখন কীভাবে গুরু-অবজ্ঞা হয়?

শিষ্য যথেষ্ট পরিমাণে শুদ্ধ ও শ্রদ্ধাযুক্ত না হলে এবং নামাশ্রয় না করে তার পূর্বেই দীক্ষা গ্রহণ করলে গুরু সম্বন্ধে মনুষ্যবুদ্ধিসহ বিভিন্ন দোষদর্শন হওয়ায় গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন ও গুরু-অবজ্ঞারূপ নামাপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। নামতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দানপূর্বক যিনি নাম প্রদান করেন, তিনি নামগুরু বা দীক্ষাগুরু। তাঁর প্রতি অচলা ভক্তি রাখা কর্তব্য। কিন্তু কেউ যদি তাঁর প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করে বলে যে তিনি তো শুধু নামতত্ত্ব সম্বন্ধেই অবগত, যাঁরা বেদান্ত-দর্শনাদি সম্বন্ধে অধিক জানেন তাঁরা শাস্ত্রার্থ অধিক অবগত, তাহলে সে নামাপরাধী। বস্তুত নামতত্ত্ববিদ গুরুর চেয়ে উচ্চ-উত্তম গুরু আর নেই। তাঁকে লঘু জ্ঞান করলে নামাপরাধ হয়।

শ্রীগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা কীরূপ হওয়া উচিত?

গুরুতে অবজ্ঞা যার তার অপরাধ।
সে অপরাধে তার হয় ভক্তিবাধ ॥
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবেতে সমভক্তি করি।
নামাশ্রয়ে শুদ্ধভক্তি শীঘ্র যায় তরি ॥
গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা করে যেই জন।
শুদ্ধনামবলে সেই পায় প্রেমধন ॥

(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

তাই অবশ্যই–

১. গুরুদেবকে সামান্য মানুষ বা জীববুদ্ধি করবেন না। তাঁকে জাত-কুলাদির ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিপুষ্ট কৃষ্ণপরিকর মনে করে ভক্তি করবেন।

২. শ্রীগুরুদেবকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, বস্ত্র ও আভরণ দিয়ে পূজা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে যুগল পূজা করবেন। তারপর প্রথমে গুরুকে প্রসাদ, পানীয় নিবেদন করে অন্য বৈষ্ণব ও দেবাদিকে অর্পণ করবেন।

৩. গুরুদেবের ব্যবহৃত বিছানা, আসন, পাদুকা, যান, স্নানের জল ও চিত্রপটকে যথাযোগ্য সম্মান করা উচিত। তাঁর উচ্ছিষ্ট প্রসাদরূপে গ্রহণ করা উচিত।

৪. গুরুদেবকে আপন প্রভু ও আশ্রয় মনে করে তাঁর প্রত্যেকটি বাক্য নিষ্ঠার সাথে পালন করা উচিত, তাঁর আদেশ অমান্য ও ছায়া লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

৫. যেকোনো স্থানে গুরুদেবকে দর্শন করামাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁর জয়ধ্বনি করা উচিত।

৬. শ্রীগুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক নিত্য। পরস্পর যোগ্যতা যতদিন থাকবে, ততদিন সম্বন্ধ থাকবে। গুরু দুষ্ট হলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করবে এবং শিষ্য দুষ্ট হলে গুরুও সে সম্বন্ধ ত্যাগ করবেন। নতুবা উভয়ের পতন অবশ্যম্ভাবী।

৭. গুরুবরণের পূর্বেই গুরু-শিষ্যের পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সব ধরনের জিনিস সংগ্রহের সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, তবে জীবনের পরমবন্ধু গুরুদেবের ক্ষেত্রে যদি কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যত্ন না করে, তবে সে নিতান্ত দুর্ভাগা।

৮. কুলগুরু অযোগ্য হলে সাধুগুরু বা সদ্‌গুরু খুঁজে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। অযোগ্য কুলগুরুকে তার প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সদ্‌গুরু অন্বেষণ করতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "আত্মনিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে সুশৃঙ্খল এবং পূর্ণরূপে অনুগত না হলে কেউ সদগুরুর নির্দেশসমূহ পালনে সফল হতে পারে না এবং তা না হলে কেউ ভগবদ্ধামেও ফিরে যেতে পারে না।"

প্রতিকার

অসৎসঙ্গ ও অসৎসাহিত্যের এ ... বজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা হয়, তবে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক শ্রীগু ... করুণা ভিক্ষা করতে হবে। করুণাময় শ্রীগুরুদেব করুণাদ্র ... রবেন। তাঁর আশ্রয়ে শিষ্য পুনরায় হরিনাম সাধন করে উ ... পরাধ না করে গুরুদেবের অনুগত হয়ে তাঁর করুণার ওপ ... রার মাধ্যমে অনায়াসে রজ ও তমোগুণকে জয় করে প্রথমে ... রম লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

একবার শ্রীল প্রভুপাদকে এ ... কোনটি?" শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলেছিলেন, "সবচে ... গুরুকে অবজ্ঞা করো। তাহলে বোঝ, তোমার স্থি ... র গুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছ যে ... করছ না। এই কারণে ভক্ত তো দূরের কথা, তুমি
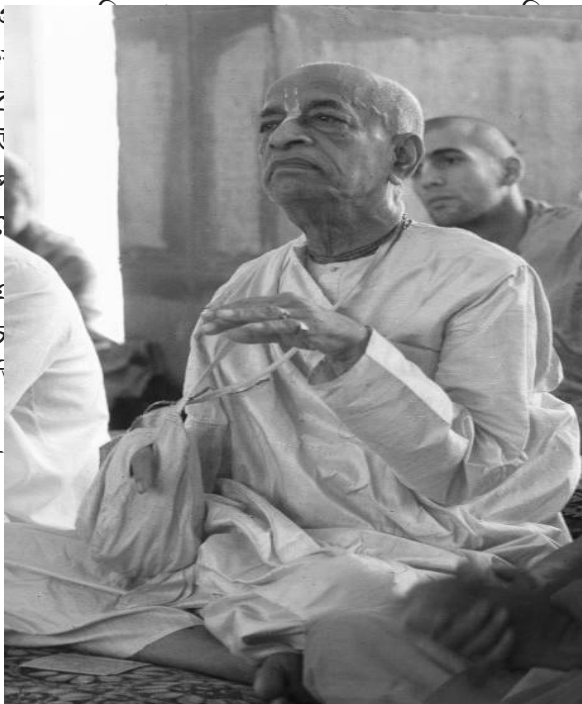
চতুর্থ নামাপরাধ

শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দম্ : **বৈদিকশাস্ত্র অথবা বৈদিকশাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা।**

'শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দন' বলতে শাস্ত্রনিন্দার পাশাপাশি শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রকাশক প্রতিকূল আচরণ করাকে বোঝায়। এ অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য শাস্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। তবে সে বিষয়ে আলোনার পূর্বে এখন সাধু ও শাস্ত্রনিন্দা এবং গুরু-অবজ্ঞা বিষয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা হলো, যাতে এ তিন বিষয়েই আমাদের ধারণা ও শ্রদ্ধা গভীর হয় সেজন্যই :

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে–

দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥
এক ভাগবত বড়– ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত– ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র ॥ (১/১৫৭)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দুই ভাগবত দ্বারা জগতে জগন্মঙ্গল নিজতত্ত্ব– নাম-যশ-মহিমাদি প্রচার করেন। এক ভাগবত হলেন ভাগবতাদি শাস্ত্র এবং আরেক ভাগবত হলেন কৃষ্ণভক্তি-রসপাত্র বা ভক্ত-সাধুজন।

সুতরাং সাধুনিন্দা ও শাস্ত্রনিন্দা এক ভাগবতনিন্দারূপ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পৃথকভাবে উপস্থাপনের কারণ কী? উত্তর হলো : এ জগতের বিদ্যাও যেমন প্রথমে শিক্ষাগুরুর মুখ থেকে শুনে অধ্যয়নপূর্বক শিখতে হয়। তারপর বিদ্বান হলে নিজেও স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যানুশীলন ও বিদ্যাদানের অধিকার লাভ করে, শাস্ত্র অনুশীলনের ক্ষেত্রেও তেমনি সাধুগুরুর মুখ থেকেই প্রথমে শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করতে হয়। তারপর স্বতন্ত্রভাবে সাধু ও শাস্ত্র সেবনের যোগ্য হওয়া যায়। এজন্যই ঠাকুর শ্রীনরোত্তমদাস বলেছেন–

সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে ॥
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

এ থেকে বোঝা যায়, শাস্ত্রবাক্যের মধ্যস্থতায় যে সাধুবাক্য বা গুরুবাক্য, তা-ই গ্রহণীয়, তার মাধ্যমেই সতত প্রেমার্ণব মাঝে ভাসার যোগ্য হওয়া যায়। যে বাক্য শাস্ত্রানুমোদিত নয়, স্বকল্পিত, তা সাধন জগতে আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই তিনি অন্যত্র বলেছেন–

বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ ॥ *(প্রার্থনা)*

তাই এ স্থলে সাধু ও শাস্ত্র উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য প্রতীয়মান হওয়ায় সাধুনিন্দা ও শাস্ত্রনিন্দাকে পৃথক নামাপরাধ বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আবার গুরুদেব ভক্ত বা সাধুর অন্তর্ভুক্ত হলেও ভক্তের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত হয়ে গুরুরূপে শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন। এ স্বাতন্ত্র্যের জন্যই সাধুনিন্দা ও গুরু-অবজ্ঞাকে পৃথক নামাপরাধ বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

শাস্ত্রতত্ত্ব

জগৎ সৃষ্টির সাথে সাথে জগৎকে পরিচালনার জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন অনিবার্য। ঠিক যেমন এ জগতেও কোনো একটি রাজ্য স্থাপন করতে হলে রাজ্য স্থাপনের সাথে সাথে রাজ্যের অধিপতি কর্তৃক বিধি-নিষেধরূপ আইনের প্রবর্তন করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাজার আইন ভিন্ন কোনো রাজ্যেরই নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকতে পারে না এবং নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন কোনো দেশকে রাজ্য নামে অভিহিত করাও সঙ্গত নয়। ঠিক একই কারণে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশ্বাধিপতি পরমেশ্বর ভগবানও শাস্ত্রাদি প্রকাশ করেছেন। পরমেশ্বরের দ্বারা প্রণিত এসব শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলতে পারলে জগতে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য লৌকিক কোনো আইন প্রণয়নের প্রয়োজনই থাকে না।

বেদ ও বেদের অনুগামী শাস্ত্রে নির্দেশিত ধর্মই সনাতন ধর্ম বা নিত্য ধর্ম। সূর্যের ন্যায় এর উদয়-অস্ত হলেও কখনোই বিলীন হয় না। জড় জগতের অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের সাথে সনাতন ধর্মশাস্ত্রের পার্থক্য হলো– অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র 'আধুনিক' অর্থাৎ কোনো বিশেষ সময়ে বিশেষ কোনো শক্তিশালী পুরুষ বা মহামানব কর্তৃক প্রবর্তিত বা রচিত। মানুষ বা পুরুষ কর্তৃক রচিত বলে এসব ধর্মকে বলা হয় পৌরুষেয়। কিন্তু 'যজ্জন্যং তদনিত্যং' – যা জন্মে তা অনিত্য; তার মানে যা ছিল না, তা হয়েছে এবং তা থাকবেও না– এটাই সুনিশ্চিত।

পক্ষান্তরে, বেদাদি সনাতন ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অথবা কোনো মানুষের দ্বারা হয়নি। বিশ্বসৃষ্টির সাথে সাথে শ্রীভগবানের নিঃশ্বাস থেকে এই বেদাদি শাস্ত্রের অবলীলাক্রমে আবির্ভাবের কথা বেদসমূহেই বলা হয়েছে–

অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্
যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবোহথর্ব্বা
জিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণম্ ॥" *(বৃদারণ্যক ২/৪/১০)*

অর্থাৎ, **ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ সেই ব্যাপক ও পূজ্য পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস থেকে অবলীলাক্রমে প্রাদুর্ভূত হয়েছে।**

শ্রীভগবানের কাছ থেকে প্রথম প্রাদুর্ভূত সেই অস্পষ্ট বেদাদি শাস্ত্র পরে দেবতা ও ঋষিগণের মাধ্যমে যথাসময়ে

সুস্পষ্টরূপে জগতে প্রকাশ হয়ে থাকে। এ কারণে শিবাদি দেব ও ঋষিগণ শাস্ত্রের প্রণেতা নন, সকলেই স্মারক, অর্থাৎ পূর্বশ্রুত শাস্ত্র স্মরণ করে থাকেন– এ কথা শাস্ত্র থেকে স্পষ্ট জানা যায়। কেবল বেদান্তই নয়, প্রলয়কালে অপ্রচিত হওয়া বেদকে সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাকে যে ভগবান স্বয়ং উপদেশ দান করেন, তা তিনি নিজেই বলেছেন–

কালের নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥

(ভা. ১১/১৪/৩)

অর্থ : 'মদাত্ম' অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে যে যে ধর্ম আমি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে উপদেশ করেছিলাম, সেই বেদরূপা বাণী প্রলয়কালে কালধর্মে বিলুপ্ত হয়েছে।

একমাত্র ভগবান ও আত্মাই সনাতন বা নিত্য। তাঁর কাছ থেকে প্রসূত সনাতন ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রও তদ্রূপ নিত্য। তাই বিদ্যাপতি বলেছেন–

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
নাহি তুয়া আদি অবসান ॥

তবে পৃথিবীর অবস্থাভেদে সূর্যের উদয়-অস্ত, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ইত্যাদি অবস্থাভেদ থাকলেও সূর্য যেমন একই অবস্থায় থাকে, তেমনি সনাতন ধর্ম একই অবস্থায় থাকলেও পৃথিবীতে কখনো প্রকট, কখনো অপ্রকটদশা প্রাপ্ত হয়। এ কলিযুগেও কলির প্রভাবে সনাতন ধর্মশাস্ত্রের স্থলে বিভিন্ন প্রকার স্বকল্পিত ধর্মশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং অধিকাংশ লোক তা আগ্রহের সাথে গ্রহণও করছে। এ জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে–

নিশামুখেষু খদ্যোতাঃ তমসা ভন্তি ন গ্রহাঃ।
যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥ (১০/২০/৮)

অর্থ : বর্ষাকালে অন্ধকারে যেমন জোনাকী পোকা আলো দেয়, গ্রহগণ আলো দেয় না, তেমনি কলিযুগে পাষণ্ড দ্বারা রচিত শাস্ত্রাদি প্রকাশ পায়, বেদাদি শাস্ত্র প্রকাশ পায় না।

বৈদিকশাস্ত্র ও বৈদিকশাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্র কী?

বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। যার উৎস ভগবান স্বয়ং। বৈদিকশাস্ত্র প্রায় একশত কোটি শ্লোক সমন্বিত জ্ঞানের এক বিপুল ভাণ্ডার। বৈদিকশাস্ত্রেই এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে–

ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরাসায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যাভিধীয়তে ॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোহন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ ॥ (স্কান্দে)

ভবিষ্যপুরাণ মতে, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, মহাভারত (যার মধ্যে ভগবদ্গীতা অন্তর্ভুক্ত), পঞ্চরাত্র, মূল রামায়ণসহ পুরাণসমূহ সবই বৈদিকশাস্ত্রের অন্তর্গত এবং এদের অনুকূল সকল গ্রন্থও শাস্ত্র নামেই পরিগণিত হবে। কিন্তু যেসব শাস্ত্র অনুকূল নয়, তা শাস্ত্র নয়– 'কুবর্ত্ম' (কুপথ)।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭/১/৪) পুরাণ ও ইতিহাসসমূহকে পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে। মুখ্য আঠারোটি পুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণকে বেদান্তসূত্রের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ভাষ্য বলে গণ্য করা হয়। আর বেদের নিগূঢ় অর্থ বোঝার জন্য পুরাণে অধিক সুযোগ থাকায় বেদের চেয়ে পুরাণের কথাই শাস্ত্রে অধিক কীর্তিত হয়েছে।

বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণর্থিং বরাননে।

বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয় ॥

(শ্রীনারদীয় পুরাণ)

অর্থ : হে বরাননে, বেদের অর্থ পুরাণসমূহের মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়েছে, এটা সুনিশ্চিত। এ কারণে পুরাণকে বেদের চেয়েও অধিক বলা যায়। (বেদের পূরণ)

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এ কথা ধ্বনিত হয়েছে–

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥

(শ্রীচৈ. চ. ২/৬/১৩৯)

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর প্রতিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর একই নির্দেশ–

"সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন ॥"

তদুপরি, বেদ ও ভাগবত যে অভিন্ন তার প্রমাণও শ্রুতিতে পাওয়া যায়– ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃজন করে তাঁকে বেদ উপদেশ দান করেন– "*যো ব্রহ্মাণ্ড বিদধাতি পূর্ব্বং / যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ॥*" (শ্বেতাশ্ব. উ. ৬/১৮)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার উদ্ধবকে বলেছেন–

পুরাণ ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে পদ্মে নিষন্ন
জ্ঞানং পয়ং মন্মহিমাবভাসং যৎ সূরয়ো ভা

অর্থ : সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্ম থেকে সৃষ্ট ব্রহ্মাকে আমার মহিমা বা
যাকে সাধুগণ 'ভাগবত' বলে কীর্তন করেন।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে ভগবান কি ব্রহ্মাকে পৃথকভাবে দু'বার বেদ ও
না। যেহেতু ব্রহ্মাকে উপদিষ্ট প্রথম জ্ঞানকেই সাধুগণ ভাগবত বলে থা
বেদ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উভয় গ্রন্থ তাহলে আক্ষরিকভাবে দো
পরোক্ষবাদের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভাগবত প্রত্যক্ষভাবে কথিত। তাই
উভয়ের মধ্যে সমতা আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তা পরিষ্কার করা হয়েছে–

প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ 'চতুঃশ্লোকী' বিবরিয়া কয় ॥ (২/২৫)

তাৎপর্য : পদ্মকোরকের প্রস্ফুটিত পদ্মে পরিণত হওয়ার ন্যায়। প্রণব পদ্মকোরক সদৃশ। গায়ত্রী কিঞ্চিৎ স্ফুট এবং গায়ত্রীর চেয়ে বিকশিত চতুঃশ্লোকী হলো প্রস্ফুটিত পদ্মের চারটি পাপড়ি। ভগবান স্বয়ং যা ব্রহ্মাকে প্রথম উপদেশ করেন। পরোক্ষভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত সেই চতুঃশ্লোকীর পূর্বের অবস্থাই শৈবালরূপ চতুর্বেদ এবং ভাগবতরূপ শৈবালমুক্ত প্রস্ফুটিত পদ্মই চতুঃশ্লোকীর প্রত্যক্ষ প্রকাশ। এ কারণে বেদ ও ভাগবত একই পরম জ্ঞানের আচ্ছাদিত ও অনাচ্ছাদিত রূপ। তবুও অস্পষ্ট বেদের সুস্পষ্ট ও সুমিষ্ট প্রকাশ বলে বেদের চেয়েও শ্রীমদ্ভাগবত অধিক গৌরবোজ্জ্বল।

বেদ শ্রবণের অধিকার না থাকায় এবং বেদের প্রতি বিমুখ হওয়ায় ব্যাসদেব পুনরায় স্ত্রী, শূদ্র ও অধম ব্যক্তিদের

জন্য মহাভারত রচনা করলেন। তারপর তিনি বেদ ও বেদের সারভাগ উপনিষদ বিশ্লেষণ করে এর সার 'ব্রহ্মসূত্র' রচনা করলেন। কিন্তু তবুও চিত্তের প্রসন্নতা তিনি লাভ করতে পারলেন না। তাই চিন্তিত হয়ে তিনি খেদপূর্বক সরস্বতীর তীরে বসে অপ্রসন্নতার কারণ অনুসন্ধানে রত হলে তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত-উপদেশ দান করলেন। এ চতুঃশ্লোকী ভাগবত থেকেই চতুর্বেদ ও ভাগবতের আবির্ভাব হলেও পরোক্ষ ও অপরোক্ষ প্রকাশভেদে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, ধানের ত্বকের ভেতরে চাল থাকে। কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে তা বোঝা যায় না। তবু পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত বেদরূপ ধানের স্তূপে ক্বচিত দু'চারটি সামান্য ত্বকহীন অথবা সম্পূর্ণ ত্বকহীন চাল দেখা যায়। এর দ্বারা সমস্ত ধানই যে চালময়, এ কথা যেমন জানা যায়, তেমনি বেদরূপ ধানের মধ্যেও কোনো কোনো স্থলে ত্বকমুক্ত চালের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণবিষয়ক ভক্তিরূপ ভাগবত-ধর্মের আংশিক অথবা পূর্ণ প্রকাশ দ্বারা সমস্ত বেদই যে কৃষ্ণময় (*বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো*– গীতা ১৫/১৫), তা জানা যায়। আবার ধান থেকে নিষ্কাশিত চাল পৃথক দেখালেও তার মধ্যে থাকা দু'চারটি ধান দেখে বোঝা যায় যে, চাল আসলে ধানেরই ব্যক্তরূপ। এ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদেরই অনাবৃত প্রস্ফুটিত অবস্থা বলে স্থূল দৃষ্টির দ্বারা বোঝা না গেলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে অবশ্যই বোধগম্য হতে পারে। এ কথার সমর্থনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

চারিবেদ উপনিষদ্– যত কিছু হয়। / তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
যেই সূত্রে যেই ঋগ্ বিষয় বচন। / ভাগবতে সেই ঋক– শ্লোক নিবন্ধন ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য – শ্রীভাগবত। / ভাগবত-শ্লোক উপনিষদ্– কহে এক অর্থ ॥

(শ্রীচৈ. চ. ২/২৫/২৭)

শ্রীভগবান, ভক্তি এবং ভক্ত– এই তিন নিত্যযুক্ত; সুতরাং এ তিনই এক এবং একই তিন। কাউকে বাদ দিয়ে কারো সম্বন্ধে আলোচনা করা যায় না। এ তিনের সম্মিলিত ভাবকে 'ভাগবত-ধর্ম' বলা হয়। আর উক্ত ভাগবত-ধর্মের গুরুত্ব না জেনে অথবা সম্বন্ধবিমুখ হয়ে অন্য ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন ও সাধন করলে তার দ্বারা ধর্মশাস্ত্রের মুখ্যফল আত্মার প্রসন্নতা বিধান কিছুতেই লাভ হয় না। এমনকি যদি বেদাদির মতো ধর্মশাস্ত্রও হয়, বেদব্যাসের মতো শাস্ত্রকারও হন, তবু যদি সেই শাস্ত্রে ভাগবত-ধর্মের প্রাধান্য না থাকে, তা অন্যের আদর পেলেও ভগবৎপ্রিয় সাধুগণের কাছে কাকের তীর্থের মতো অপবিত্ররূপে বিবেচিত হয়। ভক্তির স্বচ্ছ-সুনির্মল সলিলবিলাসী সাধুমরালগণের তাতে বসতি হয় না–

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥ *(ভা. ১২/১২/৫১)*

অর্থ : যেসব শাস্ত্র বা পুরাণে হরিভক্তির বিষয় পরিলক্ষিত হয় না, তদ্রূপ শাস্ত্র স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত হলেও তা শোনার বা বলবার উপযুক্ত নয়।

এ কথা জেনেই ত্রিকালদর্শী বেদব্যাস নিজের আচরণের দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য 'নিজ আত্মার অপ্রসন্নতা' লাভের অভিনয় করেছিলেন।

শ্রদ্ধা ব্যতীত কোনো বিষয়ে কারো প্রবৃত্তি জন্মে না। সে কারণে একমাত্র ভাগবত-ধর্মই সমস্ত জীবের আত্মধর্ম হলেও সুদুর্লভ ও অহৈতুকী মহৎসঙ্গ লাভের অভাবে এবং ভক্তির উদয় না হওয়া পর্যন্ত অধোগতি নিরোধক এবং ঊর্ধ্বগতিসাধক পথে জীবকে ধারণ করার জন্য বেদশাস্ত্রে অধিকারভেদে ধর্ম পালনের উপদেশ করা হয়েছে। নিজ নিজ রুচি অনুসারে ধর্মাচরণের দ্বারা জীবের অভীষ্ট পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সর্বসাধনার প্রাণস্বরূপ ভক্তি বিযুক্ত হলে কোনো সাধনাই প্রাণবতী থাকে না। ভাগবত-ধর্মে শ্রদ্ধালু হয়ে ভক্তিপথে চললেই কেবল ভক্তি লাভ করে ধন্যাতিধন্য হওয়া যায়। সুতরাং ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মমত ও পথ অনাবশ্যক বলে কেবল ভাগবত-ধর্মে ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও আদরপূর্বক অন্য ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ থেকে ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা ও বিরোধিতা না করার কথা স্বয়ং

ভগবানই বলেছেন– "*শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেহনিন্দামন্যত্র চাপি হি।*" *(ভা. ১১/৩/২৬)* **অর্থাৎ ভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনিন্দক হবে।**

পূর্বে সাধুনিন্দার বিষয়ে যেমন অন্য ভক্তগণের বিষয়ে নিরপেক্ষ থেকে নিন্দাদি বর্জনপূর্বক কেবল ভক্তিমার্গের স্বজাতীয় সাধুগণের সঙ্গ ও সেবার কথা বলা হয়েছে, শাস্ত্র বিষয়েও তেমনি কর্ম, জ্ঞান ও যোগ অনুশীলনের বিষয়ে নিরপেক্ষ থেকে নিন্দাদি বর্জনপূর্বক কেবল ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রই অনুশীলন করতে হবে।

শাস্ত্র ও নামের মধ্যে সম্বন্ধ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে–

প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
চতুঃশ্লোকী সেই অর্থ বিবরিয়া কয় ॥ (২/২৫)

অর্থাৎ প্রণব (নাম) থেকে গায়ত্রী মন্ত্র এবং গায়ত্রী থেকে এর প্রকৃষ্ট অর্থ শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্ত চতুঃশ্লোকীতে প্রকাশ। আবার–

প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতের উৎপত্তি ॥ *(চৈ. চ. ২/৬/১৫৮)*

নামী ও নাম এবং তদুদ্দিষ্ট ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবাচক প্রণব অভিন্ন হওয়ায় প্রণবরূপ নামবীজ থেকে এক ধারায় বিশ্বসংসারের উৎপত্তি এবং অন্য ধারায় সংসারে আবদ্ধ জীব উদ্ধারের জন্য রজ্জুরূপ বেদাদি শাস্ত্রসমূহের আবির্ভাব। আর সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে বীজরূপে শ্রীনাম নিহিত থাকলেও ভাগবতেই এর সুস্পষ্ট প্রকাশ।

মোটকথা, প্রণব (শ্রীনাম) থেকে গায়ত্রী এবং গায়িত্রীর প্রকৃষ্ট অর্থই চতুঃশ্লোকীতে প্রকাশিত। সেই চতুঃশ্লোকীর পরোক্ষবাদের দ্বারা আচ্ছাদিত রূপই চতুর্বেদ এবং অপরোক্ষ সুস্পষ্টরূপই শ্রীমদ্ভাগবত। বেদে যাঁকে 'ব্রহ্ম' এবং তদ্বাচক ও তদভিন্ন 'প্রণব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরই সুস্পষ্ট অনাচ্ছাদিত রূপ 'কৃষ্ণ' ও 'কৃষ্ণনাম'। এ জন্যই প্রণব থেকে উৎপন্ন হওয়ায় সমস্ত বেদ সেই প্রণবের জয়গানে মুখরিত এবং বেদের বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট প্রকাশ ভাগবত শ্রীনামের মহিমা কীর্তনে সমৃদ্ধ হওয়ায় নামপ্রধান পুরাণরূপে সুপরিচিত; যথা : "ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মস-স্মিতম্।" (ভা. ১/৩/৪০) এবং এর টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখেছেন–

ইদং পুরাণং ভাগবতং নাম = ভাগবত সংজ্ঞং। যথা
নাম-পুরাণং = নাম-প্রধানং পুরাণমিদমিত্যর্থঃ।
সর্ব্বত্রৈব বিশেষতো ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রতিপাদনাৎ ॥

অতএব, সর্বশাস্ত্র-শিরোমণি ভাগবত-ধর্মের সার ভাগবতও নামী শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে শ্রীনামকে অতি সম্মান ও আদরের সাথে বুকে ধারণ করে আছেন। যার আদি, মধ্য ও অন্ত সর্বত্রই শ্রীনামের মহিমা ব্যক্ত হয়েছে। যা বেদে 'প্রণব'রূপে আচ্ছাদিত ও কীর্তিত, তারই সুস্পষ্ট অর্থ ভাগবতে নামরূপে কীর্তিত হয়ে বীজধর্মী শ্রীনামেরই সর্বোপরি বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়েছে। শ্রীনামী স্বয়ং তা ঘোষণা করেছেন– "*...পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনম্।*"

সুতরাং এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, নিখিল সৃষ্টি ও সর্বশাস্ত্রের মূলে বীজরূপে যে নাম নিহিত, তা অবরোহ পন্থায় সর্বশাস্ত্রে অনুসন্ধান করে সর্ববেদের ব্যক্ত ও সুপক্বফলরূপ ভাগবতে অতি আদরের সাথে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। তাই এ ভাগবতকেই সমগ্র বেদের গলিত ফল বলা হয়েছে– "*নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলম্।*" (ভা. ১/১১৩)

উপমা

বীজ থেকে যেমন শাখা, পত্র, পুষ্পের সাথে সাথে ক্রমে ফল উৎপন্ন হয় এবং সেই ফলের মধ্যে পুনরায় বীজকে নিহিত থাকতে দেখা যায়, তেমনি পরোক্ষবাদে আবৃত বেদরূপ বৃক্ষের সুপক্ব ফল নামপ্রধান পুরাণ– ভাগবতে নামবীজের পুনরায় সন্ধান পাওয়া যায়। একই বৃক্ষ থেকে শাখা-পত্রাদি উৎপন্ন হলেও তা থেকে পুনরায় কোনো

বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু বৃক্ষের বীজ থেকে যেমন পুনরায় বৃক্ষের বিকাশ হয়, তেমনি নামী বা নামবীজ থেকেই সবকিছু প্রকাশিত হয়। আরেকটি উপমা হলো, সমগ্র দুধ মন্থন করে যেমন মাখন ও ঘি উৎপন্ন হয়, তেমনি সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করলে ভক্তিরূপ মাখন ও নামরূপ ঘি পাওয়া যায়। সুতরাং সমস্ত শাস্ত্রে যা উপদিষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে ভক্তি ও নামের সমান বা অধিক কিছুই নেই। বৈদিক শাস্ত্র ও শ্রীনামের মধ্যে এমন সম্বন্ধের কারণেই বৈদিক শাস্ত্র ও বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা এক প্রকার নামাপরাধ। তবে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ববেদসার হওয়া সত্ত্বেও যাদের শুভদিনের উদয় হয়নি, তারা এর বিরুদ্ধে নানা কটুবাক্যও প্রয়োগ করে থাকে।

বেদ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি :

ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সমস্ত প্রয়োজন সাধিত হয়, তা বৃহৎ জলাশয় থেকে এমনিতেই সাধিত হয়ে যায়। তেমনি ভগবানের আরাধনার মাধ্যমে যিনি পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করে সবকিছুর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। বেদের কর্মকাণ্ডে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞের বিধান দেওয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে ক্রমশ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে উৎসাহিত করা। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, বেদ অধ্যয়ন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সর্বকারণের পরম কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। এভাবে আমারা দেখতে পাই যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধি করা। গীতার ১৫/৭নং শ্লোকে ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই তার একমাত্র কর্তব্য হলো, ভগবানের সেবা করা– তার অন্তরের শাশ্বত কৃষ্ণভাবনা জাগিয়ে তোলা। এটিই বৈদিক জ্ঞানের চরম সত্য কথা।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে (তাৎপর্য চৈ. চ. আদি ৬৮-৭২) বেদান্ত-দর্শন ও নামকীর্তন বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা হরিনামের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন :

প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন তিনি বেদান্ত পাঠ ও ধ্যান করেন না, তখন মহাপ্রভু নিজেকে মূর্খ বলে উপস্থাপন করেছিলেন। কারণ এ কলিযুগ হলো মূর্খদের যুগ, তাই বেদান্ত দর্শন পাঠ ও ধ্যানের মাধ্যমে এখন পরমার্থ সাধন হয় না। শাস্ত্রে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– "*হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। / কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গথিরন্যথা ॥*" কলহ ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ এ কলিযুগে সংসার থেকে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের নামকীর্তন করা। এ ছাড়া আর অন্য গতি নেই, গতি নেই, গতি নেই। এ কলিযুগের মানুষ এত অধঃপতিত যে তাদের পক্ষে বেদান্তসূত্র অধ্যয়ন করে পরমার্থ সাধন করা সম্ভব নয়। সুতরাং ঐকান্তিকভাবে নিরন্তর ভগবানের নামকীর্তন করতে হবে। যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং সমগ্র জগতের গুরু; তবু তিনি স্বয়ং শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গুরুদেবের নির্দেশানুসারে নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার শিক্ষা আচরণপূর্বক আমাদের দিয়ে গেছেন। তাই সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম হরিনাম কীর্তন করাই শ্রেয়। সে সম্পর্কে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) বলেছেন– "*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যোবেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥*" অর্থাৎ সমস্ত বেদে আমিই কেবল জ্ঞাতব্য। আমিই বেদান্তের প্রণেতা এবং আমিই বেদবেত্তা। বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত অনুগামী ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ, যাঁরা জানেন– পরমেশ্বর ভগবান মহৎ থেকে মহত্তম এবং সমগ্র জগতের পালনকর্তা। যতদিন না মানুষ সীমিতকে সেবা করার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করছে, ততদিন অসীমের কাছে পৌঁছাতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে এ অসীম সম্পর্কিত জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরম জ্ঞান। যেসব মানুষ সকাম কর্ম ও মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রতি আসক্ত থাকে, তারা পূর্ণশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত ও আনন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যে মানুষ পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁকে আর বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করতে হয় না, কেননা তিনি ইতোমধ্যেই তা অধ্যয়ন করেছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা সে সত্যই প্রমাণিত হয়েছে এবং যেসব মনোধর্মী জ্ঞানী ব্যক্তি বেদান্ত অধ্যয়নকে তাদের পেশা বলে গ্রহণ করেছে, তাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। কিন্তু যিনি নিরন্তর ভগবানের নামকীর্তন করেন, তিনি ইতোমধ্যেই অজ্ঞানপারাবার অতিক্রম করেছেন। এমনকি নীচ কুলোদ্ভূত কোনো মানুষও যদি ভগবানের নামকীর্তনে মগ্ন হন, তিনিও বেদান্ত অধ্যয়নের স্তর অতিক্রম করেছেন বলে বুঝতে হবে। বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করার পরও যদি কেউ ভগবানর নামকীর্তন করার পন্থা গ্রহণ না করে, তাহলে বুঝতে হবে সে মায়াবাদীদের চেয়ে কোনো অংশে শ্রেয় নয়। তাই মায়াবাদী হওয়া যেমন উচিত নয়, তেমনি বেদান্ত-দর্শনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাও উচিত নয়। বাস্তবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে আলোচনাচ্ছলে বেদান্তের জ্ঞান প্রদর্শন করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে সম্যকভাবে বেদান্ত-দর্শন জানা, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বেদান্ত অধ্যয়নকে পারমার্থিক অনুশীলনের মূল ভেবে ভগবানের নামকীর্তন থেকে বিরত থাকবে। ভক্তের কর্তব্য বেদান্ত-দর্শন হৃদয়ঙ্গম করে ভগবানের নামকীর্তনের গুরুত্ব অনুধাবন করা। বেদান্ত অধ্যয়নের ফলে কেউ যদি নির্বিশেষবাদী হয়, তবে বুঝতে হবে সে আসলে বেদান্ত-দর্শন উপলব্ধিই করতে পারেনি। সে কথা ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) প্রতিপন্ন করা হয়েছে– বেদান্ত মানে 'সমস্ত জ্ঞানের অন্ত'। সমস্ত জ্ঞানের অন্ত হচ্ছে কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান, যা কৃষ্ণনাম থেকে অভিন্ন।

শাস্ত্রের গুরুত্ব

পেঁচা যেমন দিনে দেখতে পায় না, অথচ রাতের বিষয়সমূহ দেখতে পায়; তেমনি অনাদি বহির্মুখ বদ্ধজীবও মায়ার অবিদ্যা নামক বৃত্তির কারণে অপ্রাকৃত বা পরমার্থ বিষয় দেখতে অসমর্থ হয়ে তদ্বিরুদ্ধ মায়াসৃষ্ট বিষয়সমূহই দেখে থাকে। মায়াজাত অসত্য বিষয়গুলোকেই সত্য বলে মনে করে। শুধু জড়-বস্তুসমূহই দেখতে পায়, জড়াতীত বস্তু তার ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। পরমসত্য কৃষ্ণতত্ত্ব জড়াতীত চিৎবস্তু হওয়ায় জড় ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। সত্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে বদ্ধ জীবের চারটি প্রতিবন্ধক হলো :

১. **ভ্রম :** ভুল করার প্রবণতা (মানুষমাত্রই ভুল করে)।
২. **প্রমাদ :** মোহগ্রস্ত হওয়া (যেমন দেখছি বা ভাবছি আসলটি তেমন নয়)।
৩. **বিপ্রলিপ্সা :** প্রতারণা করার প্রবণতা এবং
৪. **করণাপাটব :** ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়।

এ কারণে পরম সত্যকে দেখতে মানুষ সম্পূর্ণ অক্ষম এবং পরমার্থের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ সে বিষয়ে অন্ধ থাকায় শ্রেয়োলাভের পথ দেখতে পায় না। শাস্ত্র তা চোখের মতো সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়। যেমন অন্ধ এবং পঙ্গু কেউই নিজের সামর্থ্যে গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম নয়। কিন্তু অন্ধ যদি পঙ্গুকে কাঁধে বহন করে, তবে চক্ষুষ্মান পঙ্গুর নির্দেশ মতো পথ চলে তারা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে এবং এভাবে উভয়ই সফলকাম হতে পারে। চক্ষুস্বরূপ শাস্ত্রসমূহ সেই পথে আমাদের অভ্রান্তভাবে পরিচালনা করতে পারে, কিন্তু পঙ্গুর মতো নিজে চলে না। এ কারণে শাস্ত্রশূন্য সাধকের সাধনা যেমন নিরর্থক, তেমনি সাধকশূন্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। সকল সাধনের মধ্যে ভক্তি সর্বোত্তম হলেও সে পথে কেউ শাস্ত্রনির্দেশে পরিচালিত না হলে, তাকে উৎপাত বা অনিষ্টরূপেই দেখা উচিত–

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ (ভ. সি. ১০১)

অর্থ : শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে যেসব বিধি বর্ণিত হয়েছে, তা উল্লঙ্ঘন করে শ্রীহরির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি করলেও তা উৎপাতের নিমিত্তেই হয়ে থাকে; অর্থাৎ তার দ্বারা অনর্থই ঘটে থাকে।

তবে প্রথমাবস্থায় সাধককে অবশ্যই সাধু বা শিক্ষাগুরুর মুখেই শাস্ত্র শ্রবণ করতে হয়। স্বয়ং শাস্ত্র থেকে নয়। স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকালে যেমন বিনা তর্কে শিক্ষাগুরুর কাছে শুনে অ, আ, ক, খ ইত্যাদি পড়তে হয়। সুতরাং শাস্ত্র ব্যতীত অনাদি অজ্ঞান ও অন্ধপ্রায় মানুষের প্রকৃষ্ট মঙ্গল লাভের আর কোনো সহায় নেই। শাস্ত্রের মাহাত্ম্য বুঝতে পারলে সেই শাস্ত্রের নিন্দা করার প্রবৃত্তি জন্মাতে পারে না।

প্রতিকার

প্রমাদে যদ্যপি হয় সে শ্রুতিনিন্দন।
অনুতাপে করি পুনঃ সে শ্রুতি বন্দন ॥
কুসুম তুলসী দিয়া [illegible]
ভাগবতসহ সদা পূজিব যতনে ॥

(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

ভুলবশত যদি কেউ বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দা করে ফেলে, তবে অনুতাপ সহকারে শাস্ত্রকে প্রণাম করা উচিত। তারপর ফুল ও চন্দনলিপ্ত তুলসীমঞ্জরী দিয়ে গ্রন্থের পূজা করা উচিত। শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের অক্ষরাবতার, তাই ভোগপ্রদানসহ ধূপ, ঘৃত, প্রদীপ ও ফুল দিয়ে আরতি করে তাঁকে চারবার প্রদক্ষিণ করতে হবে।

যেকোনো ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা অবশ্য বর্জনপূর্বক নিরপেক্ষ থেকে নিজ নিজ অধিকাররূপ ধর্মশাস্ত্রে এবং ধর্মের প্রাণস্বরূপ ভক্তি ও ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের স্বরূপ জেনে কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রকেই একমাত্র প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। সেইসাথে অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা না করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের কথা বলা হয়েছে–

"মৌমাছি যেভাবে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব ধরনের ফুল থেকেই মধু আহরণ করে থাকে, বুদ্ধিমান মানুষেরও তেমনি সকল ধর্মশাস্ত্র থেকে সারতত্ত্বটুকু সংগ্রহ করা উচত।"

ক্রমরীতিতে বেদের বিভাগ
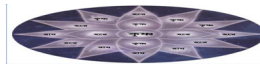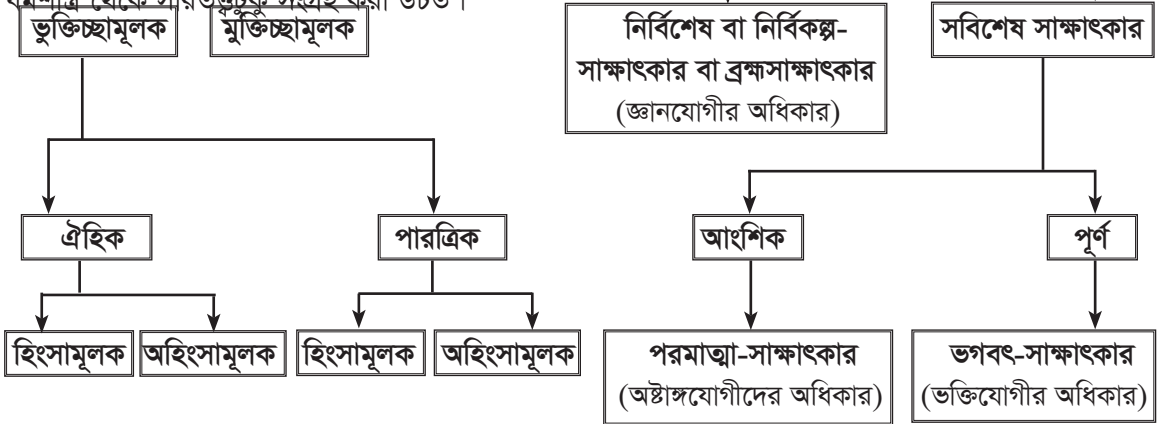
- বেদ
  - কর্মকাণ্ড
    - সকামকর্ম
      - ভুক্তিচ্ছামূলক
        - ঐহিক
          - হিংসামূলক
          - অহিংসামূলক
        - পারত্রিক
          - হিংসামূলক
          - অহিংসামূলক
      - মুক্তিচ্ছামূলক
    - নিষ্কামকর্ম (চিত্তশুদ্ধিকর)
  - দেবতাকাণ্ড
    - সগুণ (আধিকারিক দেব-দেবীর উপাসনা)
    - নির্গুণ (গুণাতীত পরব্রহ্মের উপাসনা)
  - জ্ঞানকাণ্ড
    - পরোক্ষজ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞানমাত্র) অপরাবিদ্যা
    - অপরোক্ষজ্ঞান (তত্ত্বসাক্ষাৎকারাত্মক) পরাবিদ্যা
      - নির্বিশেষ বা নির্বিকল্প-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার (জ্ঞানযোগীর অধিকার)
      - সবিশেষ সাক্ষাৎকার
        - আংশিক
          - পরমাত্মা-সাক্ষাৎকার (অষ্টাঙ্গযোগীদের অধিকার)
        - পূর্ণ
          - ভগবৎ-সাক্ষাৎকার (ভক্তিযোগীর অধিকার)

পঞ্চম নামাপরাধ

হরিনাম্নি কল্পনম্ : **হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাহাত্ম্যকে কাল্পনিক বলে মনে করা।**

ব্যাখ্যা

কল্পনার আভিধানিক অর্থ হলো স্বকল্পিত অবাস্তব বিষয়ের বাস্তবতা সম্বন্ধে চিন্তন বা মনোবিলাস। কল্পনম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামীপাদ লিখেছেন, "*তন্মাহাত্ম্য-গৌণতা-করণায় গত্যন্তরচিন্তনম্।*" (ভক্তিসন্দর্ভ) অর্থাৎ সর্বমুখ্য ভগবৎনামের স্বয়ংসিদ্ধ অসমোর্ধ্ব অনন্ত মহিমা গৌণ হয় এমন স্বকল্পিত উপায় সম্বন্ধে চিন্তন।

মায়াবাদী ও কর্মজড় মানুষ মনে করে যে পরমব্রহ্ম নির্বিকার ও নাম-রূপ-গুণশূন্য, তাঁর রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম কার্যসিদ্ধির জন্য ঋষিগণ কল্পনা করেছেন এবং হরিনাম জপে প্রলুব্ধ করার জন্য এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন, যারা এমন মনে করে তারা নামাপরাধী। নামগ্রহণের বিষয়ে স্বকল্পিত উক্তি বা বিধিনিষেধ আরোপ অর্থাৎ শ্রীনামের নিরঙ্কুশ মুক্ত মহিমাকে স্বকল্পিত কোনো বিধি-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে সংকোচ সাধনের প্রচেষ্টাকে কল্পনা নামক নামাপরাধরূপে গণ্য করা হয়।

ভক্তির সহায়তা ও সঙ্গ ব্যতীত কর্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি কোনো প্রকার শুভক্রিয়া ও সাধনাঙ্গই কখনো সিদ্ধ হয় না– সেই ভক্তিরও অঙ্গী, নববিধাভক্তির উদ্‌গাতা শ্রীহরিনামের মহিমা ও শক্তি প্রকাশের জন্য কর্ম, জ্ঞান ও যোগ আদি সাধনাঙ্গের উপর যে সামান্যও নির্ভর করতে হয় না– সেকথা খুব সহজেই বোঝা যায় এবং তা সর্বশাস্ত্রসম্মতও বটে। এজন্য শ্রীনামকে কর্ম, জ্ঞান, যোগাদির অঙ্গ মনে করা এক মারাত্মক নামাপরাধ। যদি কেউ এমনটি করে

থাকে, তবে তা নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়, যার নাম কল্পনা-নামাপরাধ। নিম্নে কিছু কল্পনার নমুনা এবং সে সম্বন্ধে শাস্ত্রনির্দেশের কথা উল্লেখ করা হলো :

কল্পনা	শাস্ত্রনির্দেশ
(১) হরিনামের বিকল্প উপায়ের কথা চিন্তা করা।	(১) "*অনন্যগতয়ো...*"– অন্য কোনো গতি নেই।
(২) ভোগবাসনাশূন্য হয়ে নাম গ্রহণ করতে হবে।	(২) "*ভোগিনোহপি...*"– বিষয়ভোগরত হয়েও প্রশস্ত।
(৩) জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে নাম গ্রহণ করতে হবে।	(৩) "*জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা..*"– জ্ঞানবৈরাগ্য রহিত হয়েও।
(৪) ব্রহ্মচর্যাদি পালন করে নাম গ্রহণ করতে হবে।	(৪) "*ব্রহ্মচর্যাদি বর্জ্জিতা*"– ব্রহ্মচর্যাদি না থাকলেও।
(৫) ধর্মপরায়ণ হয়ে নাম গ্রহণ করতে হবে।	(৫) "*সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা*"– সর্ব ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত হয়েও।
(৬) সদাচারপরায়ণ হয়ে নাম গ্রহণে নামের ফল হয়, নতুবা হয় না।	(৬) "*স্ত্রীশূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়...*" – স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল এমনকি কোনো অন্তজও যদি ভক্তিভরে হরিনাম কীর্তন করে, তাদের নমস্কার।
(৭) জাগ্রত অবস্থায় নাম গ্রহণে ফল হয়, নচেৎ হয় না।	(৭) "*স্বপ্নেহপি নামস্মৃতিরাদিপুংসঃ...*" – আদি পুরুষ পুরুষোত্তমের নাম যদি স্বপ্নেও স্মরণ হয় তবুও ঐ ব্যক্তির সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়।
(৮) ভক্তির সাথে নাম গ্রহণে ফল হয়, নতুবা হয় না।	(৮) "*গোবিন্দেতি তথা প্রোক্তং...*" – যুগান্তকালীন অগ্নি যেমন বিশ্বসংসার দগ্ধ করে ফেলে, তেমনি ভক্তি বা অভক্তি যেভাবেই হোক গোবিন্দনাম উচ্চারণে সকল পাপ নাশ হয়ে থাকে।
(৯) বিষয়-বাসনা ও মমতাদি ত্যাগ করে নাম গ্রহণে নামের ফল হয়, নতুবা হয় না।	(৯) "*নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাম্...*" – বিষয়াসক্তি ও মমতাবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ হরিনাম গ্রহণ করে, তার সমস্ত পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।
(১০) শুচিপরায়ণ হয়ে নাম গ্রহণে নামের ফল হয়, নতুবা হয় না।	(১০) "*চক্রায়ুধস্য নামানি সদা...*" – শ্রীহরি যখন স্বয়ং পবিত্রকারী, তখন তাঁর নামকীর্তনে অশৌচের আশঙ্কা নেই, সুতরাং সর্বদাই তাঁর নামকীর্তন করা কর্তব্য।
(১১) শুদ্ধাবস্থায় নাম গ্রহণে নামের ফল হয়, নতুবা হয় না।	(১১) "*ন দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধাদি...*" – ভগবানের নামকীর্তনে দেশ, কাল ও অবস্থা যথা : বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য, জাগ্রত, উন্মত্ত, প্রমাদগ্রস্ত কোনো বিষয়েই শুদ্ধির কোনো অপেক্ষা নেই।
(১২) দেশ-কালাদির অপেক্ষা অনুসারে নাম গ্রহণে ফল হয়, নতুবা হয় না।	(১২) "*ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কাল...*" – যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদ– হে রাজন, শ্রীবিষ্ণুর নাম কীর্তনে দেশ-কালের কোনো নিয়মের অপেক্ষা নেই। এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়ো না। সংসারে দান, যজ্ঞ, স্নান এবং মন্ত্রাদির বিষয় কালসাপেক্ষ, কিন্তু শ্রীহরির নামকীর্তনে কালের অপেক্ষা নেই।

উদ্ধৃতি : শ্রীহরিভক্তিবিলাস

এ জন্য শ্রীনামের মুক্ত মহিমা সর্বশাস্ত্রের সার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মুক্তকণ্ঠে কীর্তিত হয়েছে –

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি – সর্বসিদ্ধি

স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে–

ন দেশকালাবস্থাত্মশুদ্ধাদিকমপেক্ষ
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নামকামিতকাম

অর্থ : এ হরিনাম-কীর্তন দেশ, কাল, অবস্থা ও আত্মশুদ্ধি আদির অপেক্ষ
কামপ্রদ। (আরও প্রমাণের জন্য এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট দেখুন)

শ্রীনামের মহিমা প্রকাশের ক্ষেত্রে নামাপরাধ ছাড়া অন্য যেকোনো কাল্পনি
হয়। শ্রীকৃষ্ণ থেকে যেমন নিখিল বিশ্ব ও বেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি, তেমনি
কর্ম আদি সবকিছুর বীজ বা পরম কারণ শ্রীনাম। তাহলে অন্য যেকে
প্রকাশ ও কর্মের প্রচেষ্টা সবই শ্রীনামের অধীন, কিন্তু শ্রীনাম কারোরই অধীন নন, তিনি স্বাধীন ও সর্বাধীশ।

দৃষ্টান্ত

সূর্য থেকেই আগুন, আলো, তাপ ইত্যাদির উৎপত্তি, এরা সূর্যের অধীন ও আশ্রিত; কিন্তু সূর্য এদের অধীন নয়। সে তার অমিত তেজ ও আলোকরশ্মি স্বাধীনভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু যদি কেউ বলে– প্রদীপ জ্বালালে সূর্যালোক প্রকাশিত হবে, নতুবা হবে না, তবে বুঝতে হবে সূর্য ও সূর্যের শক্তি সম্বন্ধে তার অজ্ঞানতা আছে। একইভাবে কেউ যদি কল্পনা করে– হরিনামের শক্তি প্রকাশের জন্য মনোযোগ, ব্রহ্মচর্য, জ্ঞান আদির দরকার, নতুবা এর শক্তি প্রকাশ অসম্ভব, তবে তা কেবল অজ্ঞানতা নয়, নামের স্বতঃসিদ্ধ মহিমাকে গৌণ করায় তা এক নামাপরাধও বটে। কিন্তু **পেঁচা** যেমন সূর্য ও সূর্যালোক দেখতে পায় না, অবিদ্যা ও অজ্ঞানতার কারণে বদ্ধজীবও তেমনি হরিনামের শক্তি ও মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না।

সুতরাং শ্রীনাম স্বমহিমায় প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রাকৃত শুভ বা অশুভ সংযোগ-অসংযোগ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং তা থেকে উৎপন্ন জাগতিক নিখিল গুণদোষ ও অন্য যা কিছু আছে, তার সবই ভগবান এবং ভগবানের নাম থেকে উৎপন্ন হলেও সেসবের সাথে নাম-নামীর কোনোরূপ সংযোগ নেই। 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' নামক চিৎ-বৃত্তি থেকে উদ্ভূত ও প্রাকৃত দোষ-গুণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ায় শাস্ত্রে অপ্রাকৃত শুভ ও সুপবিত্র অনন্ত চিৎগুণসমূহ 'কল্যাণগুণ' নামে কীর্তিত হয়েছে। আর ত্রিগুণাত্মক বিষয়মাত্রই দোষযুক্ত বলে শাস্ত্রে তা 'হেয়গুণ' বলে কথিত হয়েছে।

জাগতিক সত্য, শৌচ, সংযম, দয়া-দাক্ষিণ্য, বিনয়, নম্রতা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সৎকর্ম সবই সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন। এমনকি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গসহ শম, দম, শ্রদ্ধা, তিতিক্ষাদি জ্ঞানের অঙ্গসমূহ সত্ত্বগুণ থেকে উদ্ভূত। আর জাগতিক কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুসমূহ এবং হিংসা, দ্বেষ, অসত্য, অনাচার, অশুচি, তন্দ্রা, আলস্য আদি দোষসমূহ প্রাকৃত রজ ও তমোগুণ সঞ্জাত। কিন্তু প্রাকৃত গুণসমূহের কোনো সংযোগ না থাকায় শ্রীভগবানকে শাস্ত্রে নির্গুণ বলা হয়েছে। তাই ভগবানের নামও সর্বহেয়গুণশূন্য – নিখিল কল্যাণগুণাত্মক।

বিষ্ণুপুরাণে আছে–

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যোঃ পুমান্ আদ্যঃ প্রসীদতুঃ ॥

অর্থ : শ্রীভগবানের মধ্যে প্রাকৃত কোনো গুণ নেই। সমস্ত পবিত্র বস্তু থেকেও পবিত্র, আদি পুরুষ সেই ভগবান প্রসন্ন হোন। অনাদি কর্মবশে মায়াসৃষ্ট ত্রিগুণের সংযোগের ফলেই নির্গুণ জীবাত্মার বারংবার দেহ সংযোগ ও বিয়োগ বা জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার ভ্রমণের বিরাম হচ্ছে না।

সুতরাং প্রাকৃত সত্ত্বগুণজাত সদ্‌গুণ ও সদ্‌কর্মসমূহ যখন জীবের অমঙ্গলকর সংসার-বন্ধনের কারণ হচ্ছে, তখন রজ ও তমোগুণের তো কথাই নেই। যে ত্রিগুণা প্রকৃতির পক্ষে ভগবানের প্রতি দৃষ্টিপাত করারও সামর্থ্য নেই, তা-ই হরিবিমুখ অতিক্ষুদ্র জীবকে অনাদিকাল ধরে সংসারাবদ্ধ করছে। কিন্তু মায়াধীশ পরমেশ্বরের সাথে ত্রিগুণময়ী মায়ার সংযোগ তো দূরের কথা, সংস্পর্শই ঘটতে পারে না। সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে–

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেহমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ (২/৫/১৩)

অর্থ : যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথেও অবস্থান করতে লজ্জিতা, সেই মায়ায় মোহিত দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'আমি' 'আমার' বলে অহমিকা প্রকাশ করে থাকে।

এ অবস্থায় কেবল নামাপরাধমুক্ত থেকে অন্য যেকোনোভাবে বা যেকোনো অবস্থায় কৃষ্ণনামের সংযোগ ঘটলে প্রাকৃত হেয়গুণজাত নিখিল দোষগুণসমূহ বিদূরীত হয় এবং স্বরূপভূত অপ্রাকৃত কল্যাণগুণসমূহের দ্বারা সে স্থান পূর্ণ হয়ে শ্রীনামের মুখ্যফল– শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেমোদয় হয়। শ্রীনামের অঙ্গস্বরূপ হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বরূপা নির্গুণা ভক্তি থেকে উত্থিত অশেষ কল্যাণগুণসমূহ বাহ্যদৃষ্টিতে প্রাকৃত গুণসমূহের মতো হলেও উপাদানের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান।

যেমন শ্রদ্ধা একটি প্রাকৃত সদ্‌গুণ। সত্ত্বগুণজাত হওয়ায় তা আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করে থাকে। নির্গুণাভক্তি থেকে উত্থিত শ্রদ্ধা নাম ও রূপে প্রাকৃত শ্রদ্ধার মতো দেখালেও উপাদানে তা শুদ্ধসত্ত্বজাত, অশেষ কল্যাণগুণের আকর। কিন্তু সত্ত্বগুণজাত শ্রদ্ধা প্রাকৃত, হেয় এবং জড় বন্ধনের কারণ।

মহাপ্রভুর স্বরচিত জগন্মঙ্গলকারী 'তৃণাদপি' শ্লোক বৈষ্ণব হওয়ার পথে জীবের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষা, শুভাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাস্বরূপ হলেও বিপরীত অর্থ বোঝার কারণে অনর্থ ও অপরাধ হওয়ায় বৈষ্ণব হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে জ্ঞাতব্য হলো : যদি কেউ বলে যে, তৃণাদপি শ্লোকে উল্লিখিত গুণগুলো ধারণ না করলে নামের ফল লাভ হয় না, তবে কল্পনা দোষের কারণে নামাপরাধ হয়। তৃণাদপি শ্লোকে উক্ত গুণসমূহ শ্রীনামের কৃপা বা শক্তি ছাড়া জীব নিজের চেষ্টায় লাভ করতে অসমর্থ। তবে তা ভক্তি অনুকূল এবং অপরাধ না হওয়ার পক্ষে সহায়ক হওয়ায় মহৎগণ তা অর্জন করার উপদেশ ও আশীর্বাদ করতেই পারেন। সেইসাথে সাধকেরও সেসব গুণ অর্জন করার সংকল্প থাকা আবশ্যক। সংকল্প করার অধিকার জীবমাত্রেরই আছে। নিরপরাধে নামের আশ্রয়ে থাকলে যথাসময়ে তৃণাদপি শ্লোকে উল্লিখিত অপ্রাকৃত কল্যাণ-গুণসমূহ নামের কৃপায় সাধকের মধ্যে আশ্রয় করে। হরিনাম গ্রহণের ফলেই তা হয়। নামগ্রহণ ব্যতিরেকে কারো মধ্যে সেসব অপ্রাকৃত গুণের মতো কোনো গুণের প্রকাশ দেখা গেলেও বুঝতে হবে তা সত্ত্বগুণজাত, তাই তা প্রাকৃত এবং বন্ধনের কারণ। কিন্তু আগে নাম গ্রহণ না করে, স্বচেষ্টায় তৃণাদপি শ্লোকোক্ত সদগুণগুলো লাভ হতে পারে না, কারণ তা স্বপ্রকাশ, অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। সুতরাং সেরূপ হওয়ার কথা বলা হলে বুঝতে হবে নিরপরাধে নাম গ্রহণের ফলে নামই সাধককে সেসব গুণের অধিকারী করবে। কিন্তু তা না বুঝে প্রথম থেকেই সেরূপ না হয়ে নাম গ্রহণ করা যাবে না– এমনটি মনে করে উপদেশ দিলে 'কল্পনা' নামাপরাধ হবে।

সংখ্যা রেখে নামগ্রহণ ও সংকীর্তন

জপের মাধ্যমে নামের ফল হয়, কীর্তনে নয় কিংবা কীর্তনেই ফল হয়, জপে নয় অথবা সংখ্যাপূর্বক নাম গ্রহণেই ফল হয়, নতুবা নয়– এমন স্বকল্পিত মন্তব্যের ফলে অপরাধই হয়ে থাকে। হরিভক্তিবিলাসে আছে–

সর্ব্বাণি নামানি হি তস্য রাজন, সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈ তু ভবন্তি পুংসঃ।
তস্মাৎ যথেষ্টং খলু কৃষ্ণনাম, সর্ব্বেষু কার্য্যেষু জপেত ভক্ত্যা ॥ (১১/১৩৮)

অর্থ : হে রাজন, নিখিল ভগবন্নামই সেই এক শ্রীকৃষ্ণেরই নাম; সুতরাং সাধকের সর্বসিদ্ধি প্রদানের বিষয়ে সকল নাম একই মহিমার প্রকাশক। এ কারণে সকল কার্যে, সকল প্রয়োজনে সেই কৃষ্ণনাম যথেষ্ট ভক্তি সহকারে জপ করা কর্তব্য।

নির্দিষ্ট সংখ্যা রেখে মানসে বা মৃদুস্বরে নাম গ্রহণকেই 'জপ' এবং সংখ্যা না রেখে অন্যের শ্রবণযোগ্য করে বা উচ্চৈঃস্বরে নাম উচ্চারণ করাকে কীর্তন বলে। সুতরাং ভগবানের সকল নামই কীর্তন ও জপ উভয় প্রকারেই গ্রহণ করার কথা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে। কোনো বিধি-নিষেধের বন্ধন শ্রীনাম সম্বন্ধে শাস্ত্রে দেখা যায় না। ভগবানের নিখিল নামই যেকোনো জীব কর্তৃক যেকোনো প্রকারে অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, জপ, ধ্যানসহ যেভাবেই গৃহীত হোক না কেন তা জীবের সর্বাভিষ্টি, সর্বসিদ্ধি প্রদান করে থাকে।

তবে সংখ্যা না রাখলে জপ হয় না। ভগবানের নাম জপ চিরাচরিত সদ্ধর্ম। তা অবশ্যই শাস্ত্রবিহিত, স্বেচ্ছাকৃত নয়। এজন্যই চার যুগের জন্য চতুর্বিধ 'তারকব্রহ্ম' নাম জপের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। এ সম্বন্ধে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন : জপের বিধি অনুসারে দীক্ষামন্ত্র বা অন্য যেকোনো মন্ত্র কেবল উপাংশু ও মানসে জপের জন্য প্রশস্ত হওয়ায় তা কীর্তনীয় নয়। এসব মন্ত্রের সাধনায় শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের উল্লেখ দেখা যায়, যা পালন ও লঙ্ঘনের ফলে সাধকের মঙ্গল ও অমঙ্গল ঘটে থাকে।

কিন্তু "*কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ*" শ্রীনাম সংকীর্তন কলিযুগের যুগধর্মরূপে বিহিত হওয়ায় নাম গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাম সংকীর্তন সর্বাধিক প্রশস্ত হলেও জপ প্রক্রিয়া সব যুগেরই অবশ্য কর্তব্য সদ্ধর্ম হওয়ায় এ যুগে মহামন্ত্র জপও কর্তব্য বলে গৃহীত হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে উপদেশ করেছেন –

আপনে সভারে প্রভু করেন উপদেশ। / কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ ॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'
প্রভু বোলে– কহিলাম এই মহামন্ত্র। / ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব সিদ্ধি হইবে সভার। / সর্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড ২৩ অ.)

এ থেকে স্পষ্টই জানা যাচ্ছে যে, সদ্ধর্ম পালনের জন্য সংখ্যাপূর্বক নিত্য মহামন্ত্র জপ অবশ্যই সকলের কর্তব্য। সর্বক্ষণ বোল বলতে সর্বক্ষণ কীর্তন করার কথাই বলা হচ্ছে। আর যেহেতু কীর্তনের সময় সংখ্যা রাখা বা অন্য কোনো বিধির প্রয়োজন নেই, তাই বলা হয়েছে– '*ইথে বিধি নাহি আর।*' কেবল নিজে নিয়মিত জপের সময় সংখ্যাপূর্বক নাম গ্রহণ করবে। নির্দিষ্ট জপ শেষ হলে অন্য সময় কোনো বিধি-নিষেধ রাখার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং জপের সময় সংখ্যা রেখেই এ মহামন্ত্র গ্রহণ করতে হবে এবং সংখ্যাসহ সমস্ত বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে থেকে সর্বক্ষণ কীর্তন করাও এর অপর এক মহিমা বলেই জানতে হবে।

সংখ্যা রেখে নামজপের আবশ্যকতা

প্রথমত, জপমালায় সংখ্যা না রেখে সর্বদা মুখে নামোচ্চারণের সংকল্প করে নামকীর্তন আরম্ভ করলেও অপরাধযুক্ত চঞ্চল মন কখন যে নাম থেকে অন্যত্র সরে যায়, তা জানাও যায় না। কিন্তু হাতে মালা থাকলে মালাই জানিয়ে দেবে। বিশেষ করে প্রতিদিন নির্দিষ্টসংখ্যক নামজপ আরম্ভ করলে সংখ্যাপূরণের জন্য আগ্রহও জন্মাতে পারে। এভাবে নিয়মিত নামগ্রহণ চলতে থাকে এবং নামের প্রতি শরণাগতির ভাবও ক্রমশ পুষ্টি লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, হরিনাম কীর্তন সাধ্য ও সাধন উভয়ই। সাধনা বা উপায়কে ব্রতরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। বাস্তবে সাধানাঙ্গ মাত্রই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা কর্তব্য। নতুবা শৈথিল্য আসতে পারে, যেকোনো বিঘ্নের সম্মুখীন হলে ক্রমশ সাধনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যে সাধনা গ্রহণ করা হয়, অবিচলিতভাবে তা পালন করাই ব্রত। নাম গ্রহণকেও ব্রতরূপে গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক। সে জন্য সংখ্যাপূর্বক নামজপ করাই সঙ্গত; অন্যথায় শৈথিল্যাদির আশঙ্কা থাকে। এ জন্য প্রতিদিন সংখ্যা রেখে নামজপের বিধি সাধুসমাজে যেমন দেখা যায়, দীক্ষাগুরুও সংখ্যা রেখেই নামজপের আদেশ দিয়ে থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪০) আছে–

এমন নিয়ম করে (ব্রতরূপে গ্রহণ করে) যিনি প্রিয় শ্রীহরির নাম কীর্তন করেন, নামসংকীর্তনের ফলে প্রেমোদয়বশত তাঁর চিত্ত দ্রবীভূত হয়ে যায়; তখন তিনি লোকাপেক্ষাহীন হয়ে উন্মাদের মতো উচ্চৈঃস্বরে কখনো হাস্যচিৎকার, কখনো চিৎকার, কখনো রোদন, কখনো গান এবং কখনো বা নৃত্য করেন।"

তবে হরিনাম পরম স্বতন্ত্র, সুতরাং পরমনিরপেক্ষ; ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রীনাম সংখ্যারক্ষণ বা ব্রতরূপে গ্রহণের অপেক্ষা করে না। নামভজনে তৎপরতা বৃদ্ধিসহ অপরাধক্ষালন ও নামের প্রতি শরণাগতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নামসাধকের নিজের জন্যই সংখ্যারক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।

প্রতিকার

হরিনামের মহিমা সম্বন্ধে ক... ...ন্নত বৈষ্ণবের কাছে গিয়ে অনুতাপপূর্বক বিনীতভাবে ... ...জ্ঞান লাভের দ্বারা সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করতে হবে ... ...ম্বন্ধে শ্রবণ করতে হবে। নম্রস্বভাব দয়াময় ভক্তগণ ... ...মার্থিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাকে আশীর্বাদ করবেন। ... ...না। শীঘ্রই হোক বা পরে হোক, নিষ্ঠাবান ভক্ত একদি... ...প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। ঠিক বীজের মতো– যথাসম... ...াফল্য দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে; যথা : (১) শ্রী... ...রিক প্রয়াস।

ষষ্ঠ নামাপরাধ

নামে অর্থবাদ : ভগবানের নামে অর্থবাদ আরোপ করা।

ব্যাখ্যা

শাস্ত্র ও সাধুর মুখে হরিনামের মহিমার কথা শুনে একে অতিস্তুতি বা অতিশয়োক্তি বলে মনে করাই অর্থবাদ নামক অপরাধ। হরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "হরিনামের যে মহিমা শাস্ত্রে লেখা আছে, তা সত্য নয়, কেবল নামে রুচি উৎপত্তির জন্য অতিবাদ মাত্র– এরূপ মনে করাই অর্থবাদ অপরাধ।"

জড় ধারণা ও বিচারবোধের ভিত্তিতে অপ্রাকৃত নামকে উপলব্ধি করার চেষ্টা অথবা অনিত্য জড়-জাগতিক শব্দের সাথে তুলনা করে শ্রীনামকে ব্যাখ্যা করাও এ অপরাধের মধ্যে গণ্য হতে পারে। যেমন অ্যালেন গিন্সবার্গ নামে এক আমেরিকান কবি একবার শ্রীল প্রভুপাদ এবং অতিথিগণের সামনে নাম জপের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনাপূর্বক ফেডরিক স্ট্রিটের ইস্‌কন মন্দিরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, "আমরা বিশেষ করে তাদেরই ভোরবেলার কীর্তনে যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছি, যারা এল.এস.ডি-র নেশা কেটে যাওয়ার পর পুনরায় নেশাগ্রস্ত হয়ে তাদের চেতনাকে স্থির করতে চায়।" (শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত) আরেকবার শ্রীল প্রভুপাদের কীর্তন শোনার পর শউ গোতলিব নামক এক হিপি কেন্দ্রের মালিক বলেছিল, "কোনো সন্দেহ নেই যে একবার যদি তুমি এ মহামন্ত্র শোনো আর মাথায় ভরে ফেল, তবে সেখানেই তা প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। কখনোই থামবে না। কোষে কোষে ওই কীর্তন তরঙ্গ একেবারে গেঁথে যায়। কোষের ডি.এন.এ. বা এ জাতীয় কোনো উপাদানকে সক্রিয় করে মাদকতার সৃষ্টি করে, যেন তা এক উচ্চতর নেশা।" (শ্রীল প্রভৃপাদ লীলামৃত) আবার যদি কেউ কৃষ্ণ অর্থ কালো ধরে নিয়ে তাঁকে কালো বর্ণের একজন সাধারণ ব্যক্তি বা মহাপুরুষ বলে মনে করে, তবে তারও এ অর্থবাদ অপরাধ হয়।

বেদের কর্মকাণ্ডোক্ত অর্থবাদ এবং এর কারণ

শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে–

কর্ম করাইলে যাজকের অর্থলাভ। / অতএব তাহে কৈতবের ত প্রভাব ॥
কর্মকাণ্ডে আছে ত কৈতব স্বার্থজ্ঞান। / ভক্তিতত্ত্বে নামে তাহা নহে বিদ্যমান ॥

কৈতব শব্দের দ্বারা যাজকের রুচি উৎপাদকের জন্য বেদের কর্মকাণ্ডে যে অর্থবাদ বা অতিশয়োক্তি করা হয়েছে, তাই বলা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণার জন্য বেদোক্ত অর্থবাদ এবং তার কারণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

বেদের 'অর্থবাদ', অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি সম্বন্ধে গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন–

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ ! নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ (২/৪২-৪৩)

অর্থ : বিবেকবর্জিত লোকেরাই বেদের পুষ্পিত (অতিরঞ্জিত) বাক্যে আসক্ত হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ, উচ্চকুলে জন্ম, ক্ষমতালাভ আদি সকাম কর্মকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বলে যে, তার ঊর্ধ্বে আর কিছুই নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, অনিত্য মায়া-দোষযুক্ত স্বর্গাদি সম্বন্ধেও বেদে যখন অর্থবাদ বা অতিস্তুতি করা হয়েছে, তখন ভগবানের নামের প্রতি যে আকৃষ্ট করার জন্য সে সম্বন্ধে অর্থবাদ বা অতিশয়োক্তি করা হয়নি, তার প্রমাণ কী? উত্তর হলো, বেদের মুখ্য অভিপ্রায় যে পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, সে বিষয়ে কোনো অর্থবাদ করা হয়নি এবং হতেও পারে না। তবে অন্যান্য গৌণ বিষয় সম্বন্ধে অর্থবাদ করা হয়েছে; কিন্তু কেন– তাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন :

জীব স্বরূপত নির্গুণ ও শুদ্ধচেতন; তাই অব্যয় ও অবিকারী হলেও সে অনাদিকাল ধরে ভগবৎ-বহির্মুখ হওয়ার কারণে মায়া ও অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে জড়দেহকেই আত্মাবোধ করছে। জড় বা প্রাকৃত বস্তুমাত্রই সত্ত্ব, রজ ও তমোরূপ ত্রিগুণের বিকার মাত্র।

এ তিন গুণের বিষয়ে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ (১৪/১৭)

অর্থ : সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞানের বিকাশ হয়, রজোগুণ থেকে লোভ (বিষয়াসক্তি) জন্মে এবং তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে।

এদের মধ্যে সত্ত্বগুণও বন্ধন; তবে তা জীবের নির্গুণ বা স্বরূপভাবের সর্বাধিক কাছাকাছি ও জ্ঞানের বিকাশক বলে তা থেকেই জীবের যথার্থ মঙ্গলের সূচনা হয়। তাই জড় জগতে আবদ্ধ জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের প্রবৃত্তি বা অধিকার অনুরূপ কর্মে নিযুক্ত করা হয়। তারপর ধীরে ধীরে তারা তম থেকে রজ এবং রজ থেকে সত্ত্বগুণে ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে ক্রমশ পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পরিশেষে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী হয় আর তা লাভের বিষয়ে সহায়তা করাই হলো সমস্ত বেদের সার্বিক উদ্দেশ্য–

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥ (ভা. ৭/১১/৩২)

অর্থ : স্বাভাবিক বৃত্তির অনুরূপ স্বকর্মে রত ব্যক্তি স্বধর্মাচরণের দ্বারা সেই স্বভাবজ কর্ম পরিত্যাগ করে ক্রমে ক্রমে নির্গুণ অবস্থাপ্রাপ্ত হন।

এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বেদে যথাক্রমে (১) কর্মকাণ্ড, (২) দেবতাকাণ্ড ও (৩) জ্ঞানকাণ্ড সাধনের উপদেশ করা

হয়েছে। সকাম ও নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হয়েছে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান কিংবা অহৈতুকী মহৎসঙ্গের প্রভাবে জীবের অন্তরে ভগবৎবিষয়ক জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। এটাই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় এবং এটাই সমস্ত বেদের মুখ্য প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণই নির্বিশেষ ও সবিশেষ তত্ত্বের পরম অবস্থা বলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞানকেই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞানের মূল বা সার বলেই জানতে হবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তাঁর পরিবার ॥ (১/৪/৫৮)

অতএব, হিংসাযুক্ত সকাম কর্ম থেকে আরম্ভ করে বেদের উক্ত ক্রম থেকে বোঝা যায় যে, ভগবদ্ভক্তি এবং তার ফল ভগবৎ-সাক্ষাৎকারেই সমস্ত বেদের তাৎপর্য পর্যবসিত। শ্রীকৃষ্ণই সেই ভগবত্তত্ত্বের পূর্ণতম প্রকাশ। অতএব, সমস্ত জ্ঞানকাণ্ডেরও মুখ্য অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি। সুতরাং বেদে যা-ই বলা হোক না কেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত জীবকে সগুণ বা জড় অবস্থা থেকে ক্রমশ বিমুক্ত করে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা, অর্থাৎ জীবের পরমাশ্রয় যিনি, সেই পরমতত্ত্বকে জ্ঞাত করিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করা।

বেদবিহিত কর্ম বা স্বধর্মাচরণের দ্বারা স্বভাবের ক্রমিক উর্ধ্বগতির নামই ধর্ম বা পুণ্য; যেমন : তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তির রজোগুণে এবং রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তির সত্ত্বগুণে উন্নতি। আবার বেদনিষিদ্ধ কর্ম বা অধর্মাচরণের দ্বারা স্বভাবের অধোগতির নাম অধর্ম বা পাপ; যেমন : সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তির রজোগুণে এবং রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তির তমোগুণে অধঃপতন। তবে অধিকারী বা অনধিকারী যেকোনো অবস্থায় অহৈতুকী মহৎকৃপার সংযোগ ঘটলে তার দ্বারা যে ভগবৎবিষয়িনী নির্গুণা শ্রদ্ধা উদয়ের সাথে সাথে শুদ্ধভক্তি লাভ হয়ে থাকে, তা-ই জীবের 'পরম ধর্ম' বা নিত্যধর্ম। সেই পরম ধর্ম বা ভগবদ্ভক্তি লাভ করা জীবের মুখ্য প্রয়োজন হলেও তা উদিত না হওয়া পর্যন্ত গুণভেদে অধিকারীর ভিন্নতা অনুসারে ধর্ম ও সাধনাও তাদের বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এ কারণে দোষ, গুণ, পাপ, পুণ্য ও ধর্ম-অধর্ম সকলের পক্ষে একরূপ হতে পারে না। ধর্মের লীলাভূমি এ ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে ধর্মের অধিকারভেদের কথা চিন্তা করা হয়নি। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে –

স্বে স্বেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্যায়স্ত দোষঃ স্যাদুভয়োরেব নির্ণয়ঃ ॥ (১১/২১/২)

অর্থ : যে ব্যক্তি যে ধর্মে অধিকার লাভ করেছে, তার সেই বিষয়ে নিষ্ঠাই গুণ বলে কীর্তিত হয় এবং তার বিপরীত হলেই তাকে দোষ বলা যায়। বস্তুত এটিই দোষ-গুণের রূপ।

অতএব, অধিকারী না হয়ে শ্রেষ্ঠতর ধর্মের অনুষ্ঠান অনিষ্টেরই কারণ হয়; আর অধিকার অনুরূপ ক্রমরীতিই বেদের বিধান। অনধিকার চর্চা সর্বদাই পরিত্যাজ্য। এ কথা গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ (৩/৩৫)

অর্থ : স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম সাধনে যদি মৃত্যুও হয়, তবু মঙ্গলজনক (তাতে স্বর্গলাভ হয়), কিন্তু অন্যের ধর্মের অনুষ্ঠান বিপজ্জনক।

দৃষ্টান্ত

কূপমণ্ডূক (কুয়োর ব্যাং) কূপের আয়তনকেই জগতের আয়তন মনে করে। জগতের আয়তন অনুভব করার অধিকার তার নেই। জগতের আয়তনের যথার্থতা উপলব্ধি করানোর জন্য তাকে ক্রমশ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর জলাশয়ে স্থাপন করতে হয়। ঠিক তেমনি, অনধিকারী ব্যক্তিদের পরতত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে জানানোর জন্য বেদ তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ক্রমশ উচ্চতর স্তরে নিয়ে আসে। আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, ঔষধ গ্রহণে অনিচ্ছুক শিশুর রোগ নিরাময়ের জন্য মা যেমন অনেক প্রশংসা বাক্যের দ্বারা শিশুকে প্রলুব্ধ করে অল্প অল্প করে মহৌষধ সেবন করিয়ে থাকেন, তেমনি

বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থায় অর্থবাদ বা প্রশংসাকীর্তন থাকলেও, তা শুভ উদ্দেশ্যেই জানতে হবে।

কিন্তু ভগবানের নামে অর্থবাদের প্রশ্নই আসে না

কার সাধ্য আছে যে ভগবানের মহিমার কথা বলে শেষ করে? অন্যরা কোন ছার, ভগবান অনন্তশেষ স্বয়ং ভগবানের মহিমা তাঁর অনন্ত মুখে কীর্তন করে শেষ করতে পারেন না। ভগবানের নাম ভগবান থেকে অভিন্ন; তাই তাঁর নামের মহিমাও অনন্ত ও অসীম। হরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে–

তুমি ত' স্বতন্ত্র তত্ত্ব সর্বশক্তিমান।
তোমার ইচ্ছায় যত বিধির বিধান ॥
ইচ্ছাময় তুমি প্রভু, স্বীয় নামাক্ষরে।
অর্পিয়াছ সব শক্তি আর কে কি করে ॥ (নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা...)
অতএব তব নাম সর্বশক্তিমান।
নামে অর্থবাদ নাহি করিবে বিদ্বান ॥

শুধু তা-ই নয়, ভগবানের নামের মহিমা তাঁর নিজের চেয়েও অধিক! ভগবানকে পেতে হলে তাঁর নামই একমাত্র উপায়, যা সামান্য শ্রদ্ধামূল্যে খুব সহজেই আমরা পেতে পারছি! তাই তাঁর নাম সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। আবার নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায় তাঁর নাম সাধ্যও বটে। যদি প্রমাণ করা যায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমার ক্ষেত্রে অর্থবাদ বা অতিশয়োক্তি হতে পারে না, তবে তাঁর নামেও অর্থবাদ হতে পারে না। তাই নিচে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণ-মহিমার কিছু সংক্ষেপে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, তাঁর ক্ষেত্রে অর্থবাদ অসম্ভব :

১। পরমব্রহ্মে অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ

অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ ছাড়া সর্বশক্তিমান হওয়া সম্ভব নয়। সর্বশক্তিমত্তা না থাকলে মহিমার অনন্তত্বও হয় না। বিরুদ্ধ ধর্মের প্রকাশ না হলে কেবল অবিরুদ্ধ বা একপক্ষীয় ধর্ম সর্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক হয় না। যেমন কোনো ছোট বস্তু যদি বৃহৎ হতে না পারে, তবে তাকে যেমন সর্বসামর্থ্য বলা যায় না, তেমনি কোনো বড় বস্তু ছোট হতে না পারলেও তা সর্বশক্তির পরিচায়ক হতে পারে না। যা অসম্ভব, তা-ই সম্ভব হলে তাঁকে বলে অচিন্ত্য। যুগপৎ হন আবার নন– সেটিই অচিন্ত্য ধর্ম (যেমন ভগবান সাকার হয়েও নিরাকার হতে পারেন)। ভগবানের অচিন্ত্যত্ব সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়েছে–

সর্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তিময় ॥ / আমিত জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমাতে জগৎ বৈসে, না আমি জগতে ॥ / অচিন্ত্য ঐশ্বর্য এই জানিহ আমার।
এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥

পরমব্রহ্মের বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে কিছু শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি

(ক) "*অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্*" *(শ্বেতাশ্ব ৩/২০)* অর্থাৎ পরমেশ্বর সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর, মহান থেকেও মহত্তর।

(খ) "*অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্...*" *(বৃ. আ. ৩/৮/৮)* অর্থাৎ তিনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ।

(গ) "*অজায়মানো বহুধা বিজায়ত্যে*" *(পুরুষসূক্ত)* অর্থাৎ তিনি জন্মরহিত হয়েও বহু প্রকারে জন্মগ্রহণ করেন।

(ঘ) "*ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।*" *(শ্বেতাশ্ব ৪/৩)* অর্থাৎ তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী।

(ঙ) "*মূর্তঞ্চৈবামূর্তঞ্চ...*" *(বৃহদারণ্যক)* অর্থাৎ তিনি মূর্ত, তিনিই অমূর্ত।
(চ) "*দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ...*" *(মুণ্ডক ৩/১/৭)* অর্থাৎ তিনি দূর থেকেও সুদূরে এবং নিকট থেকেও নিকটে।
(ছ) "*যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্...*" *(শ্বেতাশ্ব ৩/৯)* অর্থাৎ যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ কিছুই নেই।
(জ) "*অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা...*" *(শ্বেতাশ্ব ৩/১১)* অর্থাৎ তিনি হস্তপদরহিত হয়েও গমন ও গ্রহণ করেন।
(ঝ) "*সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ...*" *(শ্বেতাশ্ব ৩/১৬)* অর্থাৎ সর্বত্র তাঁর হস্ত ও পদ বিস্তৃত। আবার তিনি "*অপাণিপাদো...*" *(শ্বেতাশ্ব ৩/১৯)* অর্থাৎ হস্ত-পদহীন।
(ঞ) "*পশ্যত্যচক্ষুঃ...*" *(শ্বেতাশ্ব ৩/১৯)* অর্থাৎ তিনি অচক্ষু হয়েও দেখেন। আবার তিনি "*সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।*" *(শ্বেতাশ্ব ৪/১৪)* অর্থাৎ তিনি সহস্র সহস্র শির, চক্ষু ও চরণবিশিষ্ট।
(ট) "*অশব্দমস্পর্শমরূপম্...*" *(কঠোপ. ১/৩/১৫)* অর্থাৎ তিনি অশব্দ, অস্পর্শ ও অরূপ। আবার "*বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্...*" *(শ্বেতাশ্ব ৪/১৪)* অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তিনি, তাঁর অনেক রূপ।
(ঠ) "*অরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ...*" *(কঠোপ. ১/৩/১৫)* অর্থাৎ তিনি অরস ও গন্ধহীন– তিনি নিত্য। আবার "*সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ...*" *(ছান্দো. ৩/১৪/২)* অর্থাৎ সর্বগন্ধ, সর্বরস তিনি।

বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ অচিন্ত্য ধর্মসমূহ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেই সম্ভব

ব্রহ্মের পরিপূর্ণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ, সাকার, সচ্চিদানন্দ, ষড়ৈশ্বর্যময় ইত্যাদি অবিরুদ্ধ ধর্মময়, অর্থাৎ কেবল কল্যাণগুণময় হয়েও সর্বশক্তিমান হওয়ায় তিনি নিজ স্বরূপের নিত্য সত্তা ধারণ করেও ইচ্ছামাত্রই সাকার, নিরাকার, মূর্ত, অমূর্ত, সক্রিয়, নিষ্ক্রিয়, সগুণ, নির্গুণ ইত্যাদি বিরুদ্ধ কিংবা অবিরুদ্ধ যেকোনো ভাব প্রকাশ করতে সমর্থ। এ সামর্থ্যই তাঁর মহিমা। উল্লেখ্য, শ্রীকৃষ্ণের এ মহিমা চার প্রকারে প্রকাশিত হয়, যথা : (ক) চিৎশক্তি (নির্বিশেষ), (খ) চিৎশক্তির কার্য (সবিশেষ), (গ) জড়শক্তি (নির্বিশেষ) এবং (ঘ) জড়শক্তির কার্য (সবিশেষ)। শক্তি নিরাকার, কিন্তু এর কার্য সাকার বা মূর্ত।

তার পরও শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব তাঁর শক্তির নিরাকারত্ব ও শক্তিকার্যের সাকারত্বের চেয়েও অতিরিক্ত ধর্মবিশিষ্ট, যা কেবল ভক্তিগ্রাহ্য। নিচে কৃষ্ণলীলায় প্রদর্শিত অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মসমূহের কিছু তুলে ধরা হলো :

১। তিনি জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও মাতা দেবকীর সন্তা
প্রেমের বন্ধনে বেঁধেছেন।

ন চান্তর্ন বহির্যস
পূর্ব্বাপরং বহি
তং মত্বাত্মজম
গোপিককোলূখ

অর্থ : যাঁর ভেতর নেই, বাহির নেই, পূর্ব নেই, পর নেই আবার যিনি জগতের পূর্ব ও পর, বাহির ও অন্তর এবং যিনি জগৎ, তিনিই অব্যক্ত, সকল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত নরাকৃতি ব্রহ্মবস্তুকে নিজ পুত্র বোধে গোপিকা যশোদা প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জুর দ্বারা উদুখলে বেঁধেছিলেন।

২। এক মূর্তিরই বহু মূর্তিতে প্রকাশ

রাসলীলায় স্বয়ংরূপে বিরাজ করেও শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে প্রত্যেক গোপীর পাশে এক এক কৃষ্ণরূপে এবং দ্বারকালীলায় ষোল হাজার একশ আটজন মহিষীর প্রতি গৃহে বহু কৃষ্ণরূপে তিনিই প্রকাশিত হয়ে নিজের ব্রহ্মলক্ষণের পরিচয় প্রদান করেছেন।

৩। এক মুখ হয়েও সর্বতোমুখ

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৬) বলা হয়েছে, সর্বত্র তাঁর নয়ন, শির ও মুখ। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষ্ণের ভোজন লীলায়। একবার যমুনার তীরে গোপবালকগণ কৃষ্ণের চারদিকে চক্রাকারে বহু সারিবদ্ধ হয়ে ভোজনে বসেছিলেন। সবার অভিলাষ ছিল কৃষ্ণের সম্মুখে ভোজন করার। অন্তর্যামী কৃষ্ণ সকলের অভিপ্রায় জেনে একইসাথে সবার সম্মুখে বসে ভোজন করেন।

৪। একই সাথে সকলের অন্তরে ও বাইরে অবস্থান করেন

মাটি খাওয়ার কথা শুনে মাতা যশোদা কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে যখন মুখ হাঁ করে তার মুখের ভেতরে তাকালেন, তখন তিনি সেখানে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডসহ নিজেকে ও কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। পরক্ষণই আবার শিশু কৃষ্ণকে তাঁর কোলেই দেখতে পেলেন। এর দ্বারা ঈশোপনিষদের (*তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ* – ভগবান যুগপৎ অন্তরে ও বাইরে অবস্থান করেন) কথাটিই প্রতিপন্ন হয়।

৫। একই মূর্তির যুগপৎ বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব

দামবন্ধন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ একই সাথে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এবং অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্য রূপ প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণকে ছোট্ট শিশু দেখালেও যখন মাতা যশোদা তাঁকে বাঁধতে গেলেন, তখন বারবার দড়ি যোগ করার পরও দুই ইঞ্চি দড়ি কম পড়ে যাচ্ছিল। এ জন্যই ভগবান সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে– "*অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্ (শ্বেতাশ্ব. ৩/২০)*"।

৬। দূরে থেকেও কাছে, শায়িত থেকেও সর্বত্রগামী

পাণ্ডবদের বনবাসকালে একবার দুর্মতি দুর্যোধন দুরভিসন্ধিপূর্বক দুর্বাসা ঋষিকে দশ হাজার শিষ্যসহ পাণ্ডবদের আবাসে পাঠিয়েছিল। পাণ্ডবদের ভোজন শেষে শিষ্যসহ ঋষিকে তাদের গৃহে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল, অতিথিসেবা করতে ব্যর্থ হয়ে যেন অতিথিদের অভিশাপে তারা ভস্ম হয়ে যায়। যদিও সূর্যদেবের দেওয়া এক পাত্র ছিল দ্রৌপদীর, যা তিনি ভোজন না করা পর্যন্ত অন্নে ভর্তি থাকত; কিন্তু সেদিন তিনিও ভোজন শেষ করেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি ক্ষুধার্থ অতিথিগণের জন্য ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সেই বিপদ থেকে পরিত্রাণের অন্য কোনো উপায় না দেখে তিনি বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনকেই ডাকতে লাগলেন, "হে বিপদভঞ্জনকারী, শরণাগতপালক, তুমি পূর্বে আমাকে

যেভাবে দুঃশাসনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলে, সেভাবে আজও এ ব্রহ্মশাপ থেকে আমাদের রক্ষা করো।"

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন মহিষী রুক্মিণীর প্রাসাদে শায়িত ছিলেন। কিন্তু দ্রুপদনন্দিনীর আহ্বানমাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর গৃহে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, "আমি বড়ই ক্ষুধার্থ, আমাকে খেতে দাও।" দ্রৌপদী বিপদের মধ্যে আরো বড় বিপদে পড়লেন। বললেন, "পাত্র ধুয়ে রাখা হয়েছে, তাতে কিছুই নেই।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "সেটিই নিয়ে এসো।" তা আনা হলে তিনি সেটির ভেতরের গাত্রের এক কোণে লেগে থাকা কিঞ্চিৎ শাকান্ন বের করে এনে সেটুকুই ভোজন করে বললেন, "এ অন্নে বিশ্বাত্মা পরিতৃপ্ত হোক।" এরপর অতিথিগণকে ডাকার জন্য ভিমসেনকে পাঠালেন। এদিকে সশিষ্য দুর্বাসা স্নানকালেই উদরের স্ফিতিসহ প্রচুর অন্নবেঞ্জনাদির উদ্গার অনুভব করে ভাবলেন, "এ অবস্থায় আর সামান্য কিছুও ভোজন করা সম্ভব নয়, তাই পাণ্ডবগৃহে গিয়ে তাদের অন্ন নষ্ট করে শাপগ্রস্ত হওয়ার চেয়ে এখান থেকে কেটে পড়াই উত্তম।"

এ লীলার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, তিনি শায়িত থেকেও সর্বত্রগামী, দূর থেকেও সুদূরে এবং নিকট থেকেও নিকটে– "*দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ*" (মুণ্ডক. ৩/১/৭)। অভক্তের পক্ষে তিনি দূর থেকেও সুদূরে, একই সাথে ভক্তের পক্ষে তিনি নিকট থেকেও নিকটে।

৭। এক শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্নরূপে প্রতিভাত

বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়, সর্বসৌন্দর্য ও মাধুর্যের আশ্রয় এক শ্রীকৃষ্ণই যে জীবের অধিকারভেদে বিভিন্নভাবে উপলব্ধ হন, তা কংসের সভা, মল্ল-রঙ্গস্থলে প্রবেশের সময় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়েছিল–

মল্লানামশনির্নৃ ণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান,
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং,
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ (ভা. ১০/৪৩/১৭)

অর্থ : অগ্রজ বলদেবের সাথে শ্রীকৃষ্ণই মল্লগণের কাছে বজ্র, সাধারণ মানুষের কাছে নরশ্রেষ্ঠ, মাননীয়া ব্যতীত স্ত্রীগণের কাছে মূর্তিমান কন্দর্প, শ্রীদামাদি গোপগণের কাছে স্বজন, উন্মার্গগামী রাজগণের কাছে শাস্তিদাতা, পিতা-মাতার কাছে নিজ বালক, ভোজপতি কংসের কাছে মূর্তিমান মৃত্যু, অজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে প্রাকৃতবস্তু, যোগীগণের কাছে পরতত্ত্ব এবং যদুবংশীয়দের কাছে পরদেবতারূপে বিদিত হয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন।

৮। পঞ্চবিধরূপে জগতে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ

বিশ্বকসেন সংহিতায় ভগবান বলেছেন–

পরোব্যুহশ্চ বিভবো নিয়ন্তা সর্বদেহিনাম্।
অর্চাবতারশ্চ তথা দয়ালু পুরুষাকৃতিঃ।
ইত্যেবং পঞ্চধা প্রাহুর্মা রহস্যবিদো জনাঃ ॥

তাৎপর্য : রহস্যবেত্তাগণ এক পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবানেরই পঞ্চবিধ সাক্ষাৎ প্রকাশ-রহস্য কীর্তন করেন; যথা :

(ক) '*পর*' অর্থাৎ পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই উপাসকদের অনুগ্রহ করার জন্য–
(খ) '*ব্যুহ*' অর্থাৎ সংকর্ষণাদিরূপে প্রকাশ হন।
(গ) '*বিভব*' অর্থাৎ নৃসিংহ-মৎস্য-কূর্মাদি অবতাররূপে বিশ্বজীবের কল্যাণে জগতে অবতীর্ণ হন।
(ঘ) '*অন্তর্যামী*' অর্থাৎ পরমাত্মারূপে প্রত্যেক দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং
(ঙ) '*অর্চা*' অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহরূপে ভক্তগণের চিত্ত বিনোদন ও অর্চনাদি বিষয়ে আনুকূল্য প্রদানের জন্য জগতে ভক্তগৃহে, মন্দিরে মন্দিরে বিরাজ করেন।

(সুতরাং, আপাতদৃষ্টিতে ভগবানের অধিষ্ঠান বোধ হলেও জানতে হবে শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠান নন, অধিষ্ঠাতা শ্রীভগবান

সাক্ষাৎ।)

শ্রীকৃষ্ণই 'ভূমা'

ব্রহ্মস্তবে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করেই '*তথাপি ভূমণ্*' ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে এবং ভূমা শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে–

যদ্ বৈ ভূমা তৎ সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।
যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা।
অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্।
যো বৈ ভূমা তদমৃতম্ অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্ ॥ *(ছান্দো. উ. ৭/২৩/২৪)*

অর্থ : যা 'ভূমা' তাই সুখস্বরূপ। অল্পে সুখ নেই; ভূমাই সুখ। (ভূমা কী, তা বলা হচ্ছে) যা দেখার পর আর কিছু দেখার থাকে না, যা শোনার পর আর কিছু শোনার থাকে না; যা জানার পর আর কিছু জানার থাকে না– তা-ই ভূমা। আর যা দেখার পরও অন্য কিছু দেখার থাকে, তা-ই অল্প। যা ভূমা তাই অমৃত বা নিত্য। আর অল্প বা সসীম যা, তাই মর্ত বা ক্ষয়শীল, অর্থাৎ প্রাকৃত বিশ্বসংসার।

প্রাকৃত বস্তুর মহিমা যত বেশিই হোক না কেন, সসীম হওয়ায় তার মহিমা সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি, অর্থাৎ অধিক বলা সম্ভব। যেমন যদি বলা, স্বর্গ ছাড়া অন্য কোনো পরমার্থ নেই, তবে নিঃসন্দেহে তা অর্থবাদ বা অতিস্তুতি। স্বর্গের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যই তা বলা। কিন্তু পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর অচিন্ত্য, অসীম মহিমাময়; তাঁর চেয়ে অধিক মহিমান্বিত বস্তু আর কিছু না থাকায় তাঁর মহিমা সম্বন্ধে অর্থবাদ বা অতিশয়োক্তি বা অধিক বলা একেবারেই অসম্ভব। যেমন যদি বলা হয়, পরমব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোনো পরমার্থ নেই, তবে তা সর্বাংশে ঠিক, অতিস্তুতি নয়। তাই ব্রহ্মস্তবে "তথাপি ভূমন্..." শ্লোকে 'ভূমা' শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে–

নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বরং বোধগম্য হতে পারে, কিন্তু হে কৃষ্ণ, সবিশেষ তোমার গুণরাশির গণনা করতে কে সমর্থ? যদি কেউ দীর্ঘকাল পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা, সূর্যের কিরণকণা গণনায় সমর্থ হন, তবুও তিনি কখনোই তোমার গুণের সংখ্যা গণনা করতে পারেন না।

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রুতিশাস্ত্রের আরো কিছু কথা

শ্রুতিশাস্ত্রসমূহে যে ব্রহ্মলক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ব্রহ্ম হলেন বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্বধর্মযুক্ত, সর্বসমর্থ, সর্বশক্তিমান বস্তু। তাঁর মহিমা ও প্রভাবের কোনো অন্ত নেই। অনন্ত মহিমার অধিকারী অচিন্ত্য পরমব্রহ্ম সমস্ত কিছু প্রকাশে সমর্থ হয়েও নিজে সমস্ত কিছু থেকে নির্লিপ্ত ও মুক্ত থাকেন। মায়াবী কোনো ব্যক্তি যেমন মায়া প্রকাশের মাধ্যমে দর্শকগণকে বিমুগ্ধ করলেও নিজে প্রভাবমুক্ত থেকে সেই মায়াকে পরিচালনা করেন, তেমনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর মায়াশক্তির মাধ্যমে বহির্মুখ জীবকে বিমুগ্ধ করলেও নিজে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে অধীশ্বররূপে তাকে পরিচালনা করেন (শ্বেতাশ্ব. ৪/১০)। তাঁর ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য উদিত হয়, অগ্নি, ইন্দ্র, কাল প্রভৃতি তাঁরই ভয়ে ভীত হয়ে নিজ নিজ কার্যে ধাবিত হয়ে থাকে (কঠোপনিষদ ২/৩/৩)। তাঁর শাসনেই সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্রাদি আপন আপন নিয়মে অবস্থান করছে (বৃহদারণ্যক ৩/৮/৯)। তিনিই আবার নিজ কৃপা ও করুণাশক্তির দ্বারা তাঁর আশ্রিত ভগবৎ-অন্বেষণকারী জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বধামে নিয়ে গিয়ে নিজ সুশীতল চরণ দানপূর্বক স্বয়ং নিজেকে পর্যন্ত দান করেন (কঠকে ১/২/২৩)। তাঁর সমান বা তাঁর থেকে অধিক কেউই নেই (শ্বেতাশ্ব. ৬/৮)। তাঁর শ্রীমূর্তি, নাম, গুণ, কর্ম, লীলা, বসন-ভূষণ, পরিকর ও ধাম সবই মায়াতীত, অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বময় এবং অশেষ কল্যাণযুক্ত ও চিদানন্দময় (ভা. ২/৯/৯-১৬)। এ সমস্তই সবিশেষ পরব্যোমের অন্তর্গত বস্তু বলে নির্বিশেষ পরব্যোম বা সিদ্ধলোকেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং কেবল ভক্তিগ্রাহ্য হওয়ায় (গী. ১৮/৫৫)

সাধারণের পক্ষে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

মায়াতীত অপ্রাকৃত, অসীম, অখণ্ড বিভূ আত্মা বা ভূমা বস্তুর সমান ও অধিক কিছু না থাকায় সে বিষয়ে অতিশয়োক্তি হতে পারে না। এরূপ নিরতিশয় মহান ভগবানের অপরিসীম বিভূতি বা মহিমারাশির কোনো সীমা বা অন্ত নেই বলে তাঁকে অনন্ত নামে নির্দেশ করা হয়। সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরম ব্রহ্ম অপরিমিত অনন্ত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে আরও বলা হয়েছে–

"স ভবগঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নীতি ॥" (৭/২৪/১)

অর্থাৎ : তিনি যুগপৎ বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্বশক্তিমান বলে এবং তাঁর মহিমারাশির অন্ত না থাকায় তাঁকে কেউ কোনোদিন অতিক্রম করতে পারেনি এবং পারবেও না। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে অতিশয়োক্তির সম্ভাবনা কোথায়?

অনুধাবন করুন

শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে বাচ্য ও বাচক, অর্থাৎ নামী ও নামে তত্ত্বত কোনো ভেদ না থাকায় নামী ভগবানের মতো তাঁর নামও অনন্ত, অসীম ও অচিন্ত্য মহিমাসম্পন্ন। আর ভগবান তাঁর নামে কেবল সর্বশক্তিই অর্পণ করেননি, নামরূপেই তিনি পরমাশ্চর্য কৃপা জীবের প্রতি করে থাকেন। সতুরাং সে সম্বন্ধে অর্থবাদ অসম্ভব তো বটেই, ভগবানের চেয়ে ভগবানের নামে কারুণ্যের আধিক্য থাকায় ভগবান সম্বন্ধে অর্থবাদে যে অপরাধ হয়, শ্রীনামে অর্থবাদ আরোপ করলে অপরাধও ততোধিক হয়। আর অর্থবাদ নামক অপরাধের ফলে 'কল্পনা' নামক অপরাধও ঘটে থাকে।

হরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে–

অতএব চৌদ্দলোক ভ্রমিয়া ব্রাহ্মণ।
যেই ফল নাহি পান, নাম তাহা হন ॥
নামফল সর্বোপরি অবশ্য হইবে।
কর্মী জ্ঞানী হিংসা করি নামে কি করিবে ॥

সবশেষে আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, ক্ষুদ্র, সীমিত ও প্রাকৃত মানুষ এবং অধিক বললে দেবতাদেরও প্রাকৃত ভাব ও ভাষার সাহায্যে সহজেই অতিস্তুতি করা সম্ভব। কিন্তু যিনি অনন্ত– যাঁর শক্তি অচিন্ত্য অনির্বচনীয় অবাঙ্মানসগোচর, যাঁর সীমাহীন গুণের কণামাত্র নিয়ে সমগ্র বিশ্বের সমস্ত গুণসম্পদের উদ্ভব, সেই ভগবান এবং তাঁর নামের মহিমা বা গুণাবলি সম্বন্ধে অতিস্তুতি করার সামর্থ্য লৌকিক বা প্রাকৃত ভাব ও ভাষায় কীভাবে সম্ভব হতে পারে? এ সম্বন্ধে শ্রুতিতেও বলা হয়েছে–

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ (শ্বেতাশ্ব, ৬/১৪)

অর্থ : সূর্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি যাঁকে প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, বরং যাঁর দীপ্তিতেই এরা প্রদীপ্ত, যাঁর শক্তিতে সমগ্র জগৎ শক্তিমান, সেই স্বয়ংপ্রকাশ, সর্বশক্তিমান ভগবানকে সীমিত বা প্রাকৃত ভাব ও ভাষার সংযোগে তাঁর সীমাহীন গুণরাশির সীমা অতিক্রমপূর্বক অতিস্তুতি করা কখনো কি কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে?

সুতরাং বুঝতে হবে, শাস্ত্রকারগণ নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে যা বর্ণনা করেছেন, তা অতিস্তুতি নয়, স্তুতিও নয়– সে অসীম মহিমার কণামাত্রও তাঁরা বলতে সক্ষম হয়েছেন কিনা, তাও সন্দেহ।

শ্রীনামে অর্থবাদ সম্বন্ধে শাস্ত্রের সতর্কবার্তা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন–

শ্রুতিগণ নামের মাহাত্ম্য সদা গায়। / নামকে চিৎতত্ত্ব বলি জগতে জানায় ॥

শ্রুতি-স্মৃতি প্রদর্শিত নামের যে ফল। / তাহে অর্থবাদ করে পাষণ্ডপ্রবল ॥
হরিনামে অর্থবাদ যে অধম করে। / সে পাপিষ্ঠ নরকেতে পচি পচি মরে ॥

হরিভক্তিবিলাসে বলা হয়েছে–

ঈদৃশে নামমাহাত্ম্যে শ্রুতি-স্মৃতি-বিনিশ্চিতে।
কল্পয়ন্ত্যর্থবাদং যে তে যান্তি ঘোরযাতনাম্ ॥ (১১/১৭৭)

অর্থ : শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রে নির্ধারিত এই ভগবৎনামের মহা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যারা অর্থবাদ আরোপ করে, তারা নিদারুণ নরকাদি দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে কাত্যায়ণ সংহিতায় বলা হয়েছে–

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্ ॥ (হ.ভ.বি. ১১/২৭৮)

অর্থ : যে মানুষ হরিনাম সম্বন্ধে অর্থবাদ সম্ভাবনা করে, সে পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই নরকে নিপতিত হয়ে থাকে।

ব্রহ্মসংহিতায় বৌধায়নের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতেও প্রকাশ পেয়েছে–
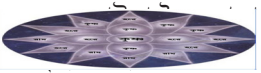
"যে মানুষ নামকীর্তনের বিবিধ ফলের কথা শ্রবণ করেও তা বিশ্বাস না করে বরং অর্থবাদ বলে মনে করে, আমি সংসারের বিবিধ প্রকার নিদারুণ যন্ত্রণায় তার দেহ নিপীড়িত করে তাকে ইহলোকে দুঃখরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করে থাকি।"

তদ্রূপ জৈমিনি সংহিতায়ও বলা হয়েছে–

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেষু নাম-মাহাত্ম্যবাচিষু।
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রুয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ ॥ (হ.ভ.বি. ১১/২৮০)

অর্থ : যারা নাম-মাহাত্ম্য বিষয়ক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের বাণীতে অর্থবাদের কথা বলে, তাদের নরক যন্ত্রণা ক্ষয় না হয়ে নিরন্তর চলতে থাকে।

এ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন–

ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল।
শুনি এক পড়ুয়া নামে অর্থবাদ কৈল ॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবে নিষেধিল– ইহার না হেরিবে মুখ ॥
সগণে [illegible] স্নান।
নামের [illegible] ॥ (চৈ. চ. ১/১৭/৭২-৭৪)

প্রতিকার

নামে অর্থবাদ অপরাধ ঘটে যদি। / দন্তে তৃণ ধরি যাই বৈষ্ণবসংসদি ॥
অপরাধ জানাইয়া বৈষ্ণবচরণে। / ক্ষমা মাগি কাকুতি করিয়া ঋজুমনে ॥
নামের মহিমা জ্ঞাতা ভাগবতজন। / ক্ষমা করি কৃপা করি দিবে আলিঙ্গন ॥
অর্থবাদকারী সহ হৈলে সম্ভাষণ। / সচেলে জাহ্নবী জলে করিব মজ্জন ॥

নামে যেসব লোক অর্থবাদ করে, তাদের মুখদর্শন করা উচিত নয়। যদি ঘটনাক্রমে তেমন লোকের সাক্ষাৎ ঘটে যায়, তবে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করাই উত্তম। গঙ্গা না থাকলে পবিত্র জলে সচেলে (সবস্ত্রে) স্নান করতে হবে।

তাও যদি না হয়, তবে মানসস্নান করে আত্মশুদ্ধি করতে হবে।

সপ্তম নামাপরাধ

নাম বলে পাপ আচরণ করা : "*নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ*" অর্থাৎ নাম বলে যার পাপবুদ্ধি হয়, বহু যন্ত্রণা ভোগেও তার অপরাধ-মুক্তি হয় না।

ব্যাখ্যা

'*এক কৃষ্ণনামে হয় সর্বপাপ ক্ষয়*'– এ কথা জেনে নামকেই পাপ ক্ষয়ের উপায়রূপে গ্রহণ করে যদি পাপকর্মের বুদ্ধি হয়, পাপকার্যের তো কথাই নেই, তবে এ নামাপরাধ হয়। পাপের প্রতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত যে পাপকর্ম হয়, তা শুধু পাপই উৎপন্ন করে; কিন্তু নামগ্রহণে সর্বপাপ বিনষ্ট হয় জেনে পাপকর্ম করে তা নামগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয় হবে বুদ্ধিতে যে পাপকর্ম হয়, তা শুধু পাপ নয়, পাপের চেয়ে অনেক গুরুতর– নামাপরাধ। এককথায়, পাপকর্ম করার জন্য নামকে উপায়রূপে গ্রহণ করলেই সপ্তম অপরাধ হয়। যতদিন এ নামাপরাধ থাকে, ততদিন অপরাধীকে যমরাজের শাসনে থেকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

উপমা

মহৎ-ঔদার্যবশত কোনো রাজরাণী রোগগ্রস্তা দাসীর প্রতি করুণা পরবশ হয়ে নিজ হাতে তার পরিচ্ছন্নতা ও রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করতেই পারেন। কিন্তু এ মহৌদার্যের সুযোগ নিয়ে সেই দাসী যদি বারবার একই কার্যে রত হওয়ার জন্য মহারাণীকে প্রার্থনা করে, তবে তা যেমন ঘোরতর দুর্বিনীত অপরাধ, তেমনি তাতে মহারাণীও বিশেষ অসন্তুষ্ট হন– এ বিবেচনায় যে, এ দাসী ইচ্ছা করলেই তাঁর কাছ থেকে অতি মূল্যবান ধন-রত্নাদি লাভ করতে পারত, কিন্তু তাঁকে অতি ঘৃণ্য ও তুচ্ছ কাজে নিয়োজিত হবার প্রার্থনা করায় সে বঞ্চিত হলো। নামবলে পাপে প্রবৃত্ত ব্যক্তির

প্রতিও শ্রীনাম তদ্রূপ অপ্রসন্ন হয়ে থাকেন। আর তা ঘোরতর অপরাধও বটে।

> এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন– "পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম ভোক্তা, তিনি কারও ভৃত্য বা আজ্ঞাবহ দাস নন। তেমনি ভগবানের নামও হচ্ছেন পরম-ঈশ্বর, পরম-ভোক্তা ও পরম- প্রভু, তাই ব্যক্তিগত সেবার উদ্দেশ্যে হরিনাম উচ্চারণ করা উচিত নয়।"

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ বলেছেন–

যেন নাম্নো বলেন পরমপুরুষার্থ-স্বরূপং,
সচ্চিদানন্দসান্দ্রং সাক্ষাচ্ছ্রীভগবচ্চরণারবিন্দং।
সাধয়িতুং প্রবৃত্তস্তেনৈব পরম-ঘৃণাস্পদং,
পাপ-বিষয়ং সাধয়তীতি পরম-দৌরাত্ম্যম্ ॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫ অনু)

অর্থ : যে নামের বলে পরম পুরুষার্থস্বরূপ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম প্রাপ্তির প্রতি প্রবৃত্তি হয়, সেই শ্রীনামকে চরম ঘৃণ্য পাপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার উপায়রূপে নিয়োগ করা পরম দৌরাত্ম্য (অর্থাৎ পরম অপরাধ) ছাড়া আর কী হতে পারে?

পাপবুদ্ধির অর্থ

বুদ্ধি দুই প্রকার, যথা : **সুবুদ্ধি** ও **কুবুদ্ধি**। পাপবুদ্ধির অর্থ পাপকর্মকেই নিজের স্বার্থ বা প্রয়োজন মনে করে তা সিদ্ধ করার কুমতি বা কুমতলব। আর তার বিপরীতই হলো সুবুদ্ধি– নামের প্রভাবে আমার পাপ আদি সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হবে, আমি আর পাপে রত হব না ইত্যাদি অনুকূল সংকল্প ও প্রাতিকূল্য বর্জনের জন্য যে নামগ্রহণ তাই নামে সুবুদ্ধি। এর ফলে ভক্তির উদয় হয়। মহৎকৃপা ছাড়া এ শুভবুদ্ধি হয় না।

যে নামের আভাসে বা গৌণফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং মুখ্যফলে প্রেম লাভ হয়, সেই পরম মঙ্গলময় নামকে পাপকর্ম সম্পাদনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করলে যে অতীব গর্হিত অপরাধ হয়, তাতে সংশয় থাকার কথা নয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন :

> যেদিন শুদ্ধনাম হয়, সেদিন এক নামেই তার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়; এর পর যে নাম হয়, তাতে প্রেম হয়। সুতরাং শুদ্ধ নামাশ্রিত ব্যক্তির পাপবুদ্ধি তো দূরে থাকুক পুণ্যাদি কার্যেও তার রুচি থাকে না। পাপ-পুণ্যের কথা তো বহু দূরের বিষয়, এমনকি মোক্ষেও তার রুচি থাকে না। তিনি কখনোই পাপ করবেন না। তবে বিবেচ্য বিষয় হলো, সাধক নাম গ্রহণ করছেন, তবু তার কিছু কিছু অপরাধ থাকায় উচ্চারিত নাম কেবল নামাভাস হয়, শুদ্ধনাম হয় না। নামাভাসেও পূর্বপাপ ক্ষয় হয় এবং নতুন পাপে রুচি জন্মায় না। কিন্তু পূর্ব অভ্যাসক্রমে কিছু কিছু পাপ অবশিষ্ট থাকে এবং তা নামাভাসে ক্রমশ ক্ষয় পেতে থাকে। কদাচিৎ হঠাৎ কোনো পাপ সংঘটিত হলেও তা নামাভাসে দূর হয়। কিন্তু সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তি যদি এমন মনে করে যে, নামের দ্বারা যেহেতু সব পাপ ক্ষয় হয়, তাই আমি কোনো পাপ করলে তাও অবশ্যই ক্ষয় হবে– এই ভরসায় যে পাপ হয়ে থাকে, তা অপরাধ বলে গণ্য হয় (জৈবধর্ম)।

পাপের প্রকারভেদ

মাত্রাভেদে পাপ চার প্রকার, যথা : (১) **পাতক**, (২) **উপপাতক**, (৩) **অতিপাতক** এবং (৪) **মহাপাতক**। আবার ব্যক্ত-অব্যক্তভেদে পাপ চার প্রকার, যথা :

(১) অপ্রারব্ধ – যা সঞ্চিত আছে, ব্যক্ত হয়নি।

(২) কূট – যে পাপসমূহ ব্যক্ত হওয়ার উপক্রম।

(৩) বীজ – পাপ করার বাসনা ও ইচ্ছা যা ক্রিয়াশীল হয়নি।

(৪) ফলোন্মুখ বা প্রারব্ধ – যে পাপের ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে ক্রমানুসারে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পাপ

ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পাপের পার্থক্য বোঝা প্রয়োজন। যদি কেউ উদ্দেশ্যহীনভাবে হঠাৎ কোনো পাপকাজ করে, তবে তা সাময়িক এবং শীঘ্রই তা হরিনামের আভাসেই নাশ হবে। কিন্তু কেউ যদি পরিকল্পনা করে কোনো পাপকাজ করে, তবে তা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের ফলেই হয় এবং তা হয় মারাত্মক। আর যদি হরিনামে পাপ নাশ হয়, এই সাহসে ইচ্ছাকৃতভাবে পাপকাজ করে, তবে তা ঘোরতর অপরাধ। এর কুফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তার কায়, মন ও বাক্য সবকিছুরই অধঃপতন হবে।

পাপের পর্যায়

বেদ অনুসারে প্রত্যেক পাপকর্ম সংঘটিত হওয়ার তিনটি পর্যায় রয়েছে, যথা : (১) **অজ্ঞতা,** (২) **পাপ করার ইচ্ছা** বা **বাসনা** এবং (৩) **পাপকর্ম**। অজ্ঞতা বা অবিদ্যাই পাপের মূল কারণ। অবিদ্যা থেকে পাপবীজ বা পাপবাসনা এবং পাপবাসনা থেকে পাপ– এই তিনটিই জীবের ক্লেশ। হরিনাম জপ-কীর্তনের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের দ্বারা অজ্ঞানতা ও পাপ করার ইচ্ছা উভয়ই নাশপ্রাপ্ত হয়। অনর্থ নিবৃত্তির স্তরে অতীত পাপের সাথে ভক্তের সামান্য পরিমাণে সম্বন্ধ থাকে। যদি পাপকর্ম থেকে বিরত হয়ে শুদ্ধ অভিলাষ নিয়ে জপ-কীর্তন অব্যাহত রাখে, তবে তার অন্তর থেকে পাপ প্রবৃত্তির শেষ চিহ্নটুকুও আর থাকবে না। নামে রতি উৎপন্ন হওয়ার পূর্বের ও পরের অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলে সন্ধিকাল। এ সন্ধিকালে নতুন পাপের প্রতি রুচি হয় না। অভ্যাসক্রমে পূর্ব পাপের কিছু কিছু ক্ষয়োন্মুখ গন্ধ থাকতে পারে। কখনো কখনো অসৎ সঙ্গের প্রভাবে নবীন ভক্তের পূর্বের বদভ্যাস ফিরে আসতেও পারে। এমন অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক পাপও হরিনামের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। প্রমাদের কারণে কোনো পাপকার্য ঘটে গেলেও সেজন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না।

পাপমুক্তির উপায়

শাস্ত্রে পাপের ফল নাশের জন্য বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হলেও তাতে পাপবীজ বা বাসনা নষ্ট হয় না। তা থেকে পুনরায় পাপের জন্ম হয়। ঠিক যেমন, জমির ঘাস কেটে ফেললেও তা থেকে পুনরায় ঘাসের উদ্গাম হয়। কিন্তু নামাপরাধ না থাকলে নামের আভাসেই পাপবীজসহ সর্বপাপ সমূলে নাশ হয়। হরিভক্তিবিলাসে আছে–

বর্ত্তমানস্তু যৎ পাপং যদ্ভুতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানল কীর্তনাৎ ॥ (১১/১৫৬)

অর্থ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল প্রকার পাপই শ্রীগোবিন্দের নামকীর্তনরূপ অনলে ভস্মীভূত হয়ে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে–

এক কৃষ্ণনাম করে সর্বপাপনাশ। / প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। / এক কৃষ্ণ-নামের ফলে পাই এত ধন ॥

(চৈ. চ. ৮/২৬-২৮)

হরিনামের শক্তির কথা বলতে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন :

মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী। সে তোমাকে অন্য পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করবে, শক্তি প্রয়োগ

করবে। ঠিক যেমন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যখন হরিনাম জপ করছিলেন, তখন তাঁকেও মায়া পরীক্ষা করতে এসেছিল, কিন্তু পরাস্ত হয়েছিল। মায়া স্বয়ং পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। মায়াই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ঠাকুর হরিদাস মায়ার শিষ্য হননি। সুতরাং মায়ার ভয়ে ভীত হয়ো না। কেবল বেশি করে জপ-কীর্তন করো, তুমিই বিজয়ী হবে। মায়া কিছুই করতে পারবে না। শুধু তোমাকে বলবান হতে হবে। কী সেই বল? কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করা।

প্রশ্ন হতে পারে–

"নামের দ্বারা পাপক্ষয়ের এমন সহজ উপায় থাকতে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে কেন?"

উত্তর হলো প্রায়শ্চিত্তসমূহ অন্য যুগের জন্য, নামযুগের জন্য নয়। শ্রীনাম কেবল কলিযুগের ধর্ম। অন্য কলিযুগে নাম যুগধর্মরূপে প্রবর্তিত হলেও তা সর্বসাধারণের গ্রহণীয় হয় না। ("*যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ*"– ভা. ১২/৩/৪৪)। কেবল বর্তমান কলিযুগেই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তা গ্রহণীয় হয়েছে। এ কারণে হেলায়, শ্রদ্ধায় যেভাবেই হোক সকলেই নাম গ্রহণ করতে পারছে। শ্রীনামের সাধ্য হলো সর্বোত্তম ব্রজপ্রেম, যা কেবল রাগভক্তির দ্বারা লাভ হয় এবং সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই তার প্রদাতা। সব কলিযুগে নয়; ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ এক হাজার চতুর্যুগের বর্তমান গৌরপ্রকটিত কলিযুগেই তা প্রদত্ত হয় এবং তা প্রাপ্তির পরম উপায় হলো শ্রীনামসংকীর্তন। এই শ্রীনামের অপ্রতিহত মহামহিমা, গৌণ ফলে এমনকি নামাভাসেও অখিল পাপরাশি নাশ এবং মুখ্যফলে ব্রজপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ প্রদানরূপ সামর্থ্যের কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জগতে কেউ বিদিত ছিল না। অন্য যুগে ব্রত, তীর্থ, প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারাই সে যুগের উপযোগী সাধ্য সাধিত হতে কোনো বাধা ছিল না। সেসব যুগে ব্রজপ্রেম বা রাগভক্তি প্রদত্ত হয়নি বলে তা প্রাপ্তির উপায় শ্রীনামেরও আবির্ভাব হয়নি। যেমন, মৃতসঞ্জীবনীর শক্তির মহিমা না জানা পর্যন্ত বৈদ্যগণ পাচনাদির ব্যবস্থাই করে থাকেন, তেমনি শ্রীনামের মহামহিমা উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, প্রায়শ্চিত্ত আদির প্রয়োজন স্বীকার করতে হয়।

নামবলে পাপের উপলক্ষণ

নামবলের উপলক্ষণে নামজাত 'ভক্তিবলে' অথবা 'ধর্ম বলে' পাপে প্রবৃত্তির বিষয়গুলোকেও অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে বুঝতে হবে। ঠিক যেমন, "কাক থেকে দধি রক্ষা করো" বললে একইসাথে কুকুর, বিড়াল বা অনুরূপ অন্য প্রাণী থেকেও দধি সংরক্ষণের কথা বুঝতে হবে। তদ্রূপ নাম বলে পাপ প্রবৃত্তির উপলক্ষণ হলো কেবল নাম বলেই নয়, ভক্তিবলে, ধর্মবলে পাপ প্রবৃত্তিকেও বুঝতে হবে।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে–

যতদিন শুদ্ধনাম না হয় উদয়। / ততদিন অপরাধ-আক্রমণে ভয় ॥
অতএব নামাভাসী যদি ভাল চায়। / নাম বলে পাপবুদ্ধি হইতে পালায় ॥
বিশেষ যতনে পাপবুদ্ধি দূর করি। / অহর্নিশি মুখে বলিবেক হরি হরি ॥
শ্রীগুরুকৃপায় হইবে সুসম্বন্ধজ্ঞান। / কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণনাম তাহাতে বিধান ॥
যদ্যপি প্রমাদে নামবলে পাপবুদ্ধি। / শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গে করি তার শুদ্ধি ॥

তত্ত্বাবধায়ক আসার সাথে সাথে যেমন চোর পালিয়ে যায়, তেমনি আমাদের ভজন পথের তত্ত্বাবধায়ক শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ

উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে অনর্থ ও পাপরূপী চোর দূরে পালায়। তাই যখনই এই চোরদের উপস্থিতি দেখবেন, তখনই উচ্চৈঃস্বরে তত্ত্বাবধায়ক শ্রীগুরুদেব ও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে ডাকবেন– "জয় শ্রীল গুরুদেব, জয় শ্রীল প্রভুপাদ"। সর্বদা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সঙ্গ করলে আমরা সর্বদাই সুরক্ষায় থাকব।

প্রমাদবশত কোনো পাপ হয়ে গেলে অনুতাপ সহকারে শ্রীগুরুদেব ও শুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গে নিরন্তর হরিনাম কীর্তন করতে হবে। তাহলে অচিরেই অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। যতদিন নামাভাস স্তরে কেউ থাকবে, ততদিন অপরাধ থেকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে। আর অসৎসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে শ্রীল গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ বলেছেন যে, প্রেমভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত শুদ্ধনাম ভজনকারী সাধুর সঙ্গ ব্যতীত শুদ্ধনাম ভজন করা যায় না। আর অসাধু বা অভক্তসঙ্গে যে নাম হয়, তা কেবল অভিধানের অক্ষর মাত্র।
পণ্ডিত জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্তে' উপদেশ দেওয়া হয়েছে–

অসাধুসঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়। / নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয় ॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ। / এ সব জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর। / ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর ॥

অষ্টম নামাপরাধ

ধর্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্বশুভক্রিয়াসাম্যপি প্রমাদঃ : **হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করাকে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বর্ণিত পুণ্যকর্ম বলে মনে করা অর্থাৎ ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোম ইত্যাদি শুভকর্মের সঙ্গে অপ্রাকৃত নামকে সমান জ্ঞান করা।**
(শুভকর্মকে নামের সমান মনে করা প্রমাদ বা ভুল বিচার। পরবর্তী প্রমাদ শীর্ষক আলোচনায় প্রমাদই যে সকল অনর্থের মূল তা সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।)

ব্যাখ্যা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এ অপরাধের ব্যাখ্যায় বলেছেন– "ধর্ম অর্থ বর্ণাশ্রম ও দানাদি ধর্ম, ব্রত অর্থ সমস্ত শুভকর কর্ম, ত্যাগ অর্থ সর্বকর্মফল ত্যাগরূপ ধর্ম, হুত অর্থ বহুবিধ যজ্ঞ ও অষ্টাঙ্গযোগাদি– এসব সৎকর্ম বলে পরিগণিত। শাস্ত্রে যেসকল শুভক্রিয়া নির্দিষ্ট হয়েছে, তার সবই জড় ধর্মের অন্তর্গত, সুতরাং প্রাকৃত; কিন্তু হরিনাম প্রকৃতির অতীত। উক্ত সমস্ত শুভকর্মই উপায়রূপে অপ্রাকৃত সুখরূপ উপেয় সংগ্রহের প্রতিজ্ঞা করে, সুতরাং তা উপায় মাত্র, উপেয় নয়। কিন্তু হরিনাম সাধনকালে উপায় হলেও ফলকালে স্বয়ং উপেয়। অতএব হরিনামের সঙ্গে অন্য সব সৎকর্মের তুলনা নেই। আর যাদের মনে অন্য সৎকর্মের সাথে হরিনামের সাম্যবুদ্ধি হয়, তারা নামাপরাধী। সেসব কর্মের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল নির্ণীত আছে, তা নামের কাছে প্রার্থনা করলে নামাপরাধ হয়, কেননা তাতে অন্য সৎকর্মের সাথে নামের সাম্যবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তাই অন্য সৎকর্মের তুচ্ছফল জেনে হরিনামকে অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে আশ্রয় করতে হবে– এটিই অভিধেয় জ্ঞান।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (আদি ১৭ /২১২) শ্লোকের তাৎপর্যে এ অপরাধের ব্যাখ্যায় বলেছেন :

ভগবানের নামকীর্তনকে দান, ধ্যান, তপস্যা আদি বিবিধ শুভকর্মের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা অপরাধ।

জড়-জাগতিক বিচারে, ধর্ম পালন করলে সমগ্র জগতের কল্যাণ হয়। জড়বাদীরা তাই তাদের বিষয়সুখ অব্যাহত রেখে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন-যাপন করার আশায় নানা রকম ধর্মানুষ্ঠানের উদ্ভাবন করে। যেহেতু তারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাই মনে করে যে, ভগবান নিরাকার এবং তাঁর বিষয়ে ধারণা করার জন্য যেকোনো একটি রূপ কল্পনা করে নিলেই চলে। তাদের মতে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপসমূহই ভগবানের রূপের প্রকাশ। এজন্য তাদের বলা হয় বহু-ঈশ্বরবাদী বা হাজার দেব-দেবীর পূজক। তারা মনে করে দেব-দেবীর নামকীর্তনও এক প্রকার শুভকর্ম। তাই তারা নামাপরাধী।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে–

ইষ্টাপূর্ত আর যজ্ঞাদিক পুণ্যকর্ম। / স্নান, হোম, দান, যোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম ॥
তীর্থযাত্রা ব্রত পিতৃকর্ম ধ্যানজ্ঞান। / দৈবকর্ম তপ প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান ॥
সকলই জড়ীয়দ্রব্য করিয়া আশ্রয়। / উপায় স্বরূপে সদা শুভকর্ম হয় ॥
নামের স্বরূপ হয়, শুদ্ধসত্ত্বময়। / জড়গন্ধ শুদ্ধ নামে কভু নাহি রয় ॥
জড়ীভূতজীব নামে জড়ভাবদানে। / অন্য শুভকর্ম সহ এক করি মানে ॥
মায়াবাদ হৈতে এই নাম-অপরাধ। / যাহার দৌরাত্ম্যে সদা হয় ভক্তি বাধ ॥

বদ্ধজীব জড় বিষয় ছাড়া থাকতে পারে না। তার সকল কর্ম ও চিন্তায় জড় বিষয় মিশে থাকে। তাতে জড়াতীত শুদ্ধভক্তি অন্বেষণ করাই কর্ম-যোগাদির কৌশল। কৃষ্ণলাভের জন্য তাই অধিকার ভেদে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির উপায় শাস্ত্রে বিধৃত হয়েছে। নিতান্ত জড়-আসক্তির ক্ষেত্রে চিত্তশোধিনী কর্মময়ী বুদ্ধি, নিতান্ত মায়া-আসক্তের ক্ষেত্রে অদ্বৈতজ্ঞান এবং সর্বজীবের ক্ষেত্রে শুদ্ধভক্তি উপদিষ্ট হয়েছে। ভক্তির মাধ্যমে সিদ্ধি লাভের সময় জড়কর্মাদি সহজে দূর হয়। নাম উপায় হলেও মুখ্য উপায় আর অন্য উপায় সর্বদাই গৌণ উপায়। এ তত্ত্ব বুঝতে পারলে অন্য শুভকর্ম থেকে নামকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে প্রতিভাত হয়।

জড়া প্রকৃতির প্রভাবকেই শ্রীল প্রভুপাদ জড়জগতে জীবের পতন বলেছেন। জড় প্রভাবই অবিদ্যা-মোহরূপ ভবরোগ। এ ভবরোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে জড় উপাদানের দ্বারা সম্পন্ন যজ্ঞ, দান, ব্রতাদিরূপ ঔষধ আসলে খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পারে না। তা রোগের সাময়িক উপশমের সাথে সাথে অনেক সময় রোগটিকে এক অবস্থা থেকে অন্য এক অবস্থায় রূপান্তরিত করে মাত্র; ভবরোগের বীজকে কখনোই নির্মূল করতে পারে না। তাই প্রয়োজন তার চেয়ে অধিক শক্তিশালীতো বটেই সর্বরোগহর, সর্বশক্তিমান হরিনামের। যার আভাসমাত্র উচ্চারিত হলেও কোটি জন্মের পাপসহ ভবরোগ নির্মূল হয়ে মুক্তিলাভ সম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠত্ব

কারণ ব্যতীত কোনো কার্য হয় না। যা কিছু হয় সবই কার্য; যার দ্বারা কার্য হয়, তাই শক্তি এবং যিনি কার্য করেন, তিনিই কারণ। কারণ মাত্রই শক্তিমান এবং শক্তির আধার। যাঁর পূর্বে কোনো কারণ নেই, যিনি পরম কারণ, সমগ্র শক্তির আধার যিনি, তিনিই যথার্থ শক্তিমান। আর তিনি ছাড়া বাকি সবই হলো তার শক্তি ও শক্তির কার্য। শক্তির কার্যরূপ জগৎ এবং শক্তিমান জগদীশ্বরের মধ্যে এক অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধের কথা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় প্রচারিত হয়েছে–

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥

(গী. ৯/৪-৫)

অর্থ : অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই। যদিও সব কিছুই আমারই সৃষ্ট, তবুও তারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার যোগৈশ্বর্য দর্শন করো! যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত, তবুও আমি এ জড় সৃষ্টির অন্তর্গত নই, কেননা আমি নিজেই সমস্ত সৃষ্টির উৎস।

নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীব ও জড়া-প্রকৃতি এবং অপ্রাকৃত যা কি
উৎস পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সকল কার্য ও কারণের পরম কারণ।

ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চি
অনাদিরাদিগোবিন্দ সর্ব

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ শক্তির কথা শ্রুতিশাস্ত্রের বহুস্থানে
প্রধান শক্তি হলো : (১) চিৎ-শক্তি (স্বরূপ বা অন্তরঙ্গা শক্তি)
অচিৎ-শক্তি (জড় বা মায়া শক্তি)।

শক্তি নিজে কারণ নয়। শক্তির ব্যক্ত অবস্থার নাম কার্য। কা
সুতরাং কারণের শ্রেষ্ঠত্ব ও পারম্য জানতে হবে। এ বিশ্ব প্রকৃতি
শক্তিতত্ত্ব এবং তা কারণের অধীন। আবার অন্তরঙ্গা শক্তি চি
পরমেশ্বরের আশ্রিত। আশ্রয় ও আশ্রিতে সেব্য-সেবক সম্পর্ক

নিখিল কারণের পরম কারণ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তিনি অগ্নিরাশি হলে রাম, নৃসিংহ, মৎস্য-কূর্ম ইত্যাদি স্বাংশ অবতারগণ অগ্নিরাশির বিশেষ বিশেষ শিখা, প্রভা ব্রহ্মজ্যোতিসহ চিৎশক্তি, জীব অগ্নিরাশির স্ফুলিঙ্গ এবং মায়া বা জড়শক্তি অগ্নিরাশির ধূম বা ধোঁয়াসদৃশ। অগ্নিশিখা অগ্নিরাশির স্বাংশ-প্রকাশ, কিন্তু জ্যোতি, স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়া এর শক্তি।

আরেকটি উপমা হলো পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণ হলেন পূর্ণচন্দ্র এবং দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী ইত্যাদি তিথিতে প্রকাশিত এক চন্দ্রেরই আংশিক প্রকাশসমূহ তাঁর বিলাস ও স্বাংশাদি অবতার। দ্বিতীয়া, তৃতীয়াদি বিভিন্ন প্রকাশভেদ অনুসারে চন্দ্রের শক্তি প্রকাশ বা আলো বিতরণের ক্ষেত্রে যেমন তারতম্য হয়, তেমনি অবতারী ও অবতারসমূহ এক শক্তিমানের প্রকাশভেদ হলেও শক্তি প্রকাশে তারতম্য আছে বুঝতে হবে।

অনুধাবন করুন

স্বাংশপ্রকাশ হওয়ায় অবতারগণকে শ্রীকৃষ্ণের সমান বলা হলেও, তাতে অপরাধের আশঙ্কা থাকায় শ্রীসূত গোস্বামী

গৌণ লক্ষণে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সাথে অবতারগণের সমতা বর্ণনা করলেও বিশেষ লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং ভগবান বলে নির্দেশ করেছেন; যথা :

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।" (ভা. ১/৩/২৮)

অর্থ : পূর্বোক্ত অবতারগণ কেউ কেউ অংশাবতার, কেউ কেউ কলা বা অংশের অংশ অবতার; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে করিলা গণন ॥
তবে সূত গোঁসাই মনে পাইয়া বড় ভয়।
যার যা লক্ষণ তাহা করিলা নিশ্চয় ॥
সব অবতার পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব অবতংস ॥

(চৈ. চ. ১/২/৫৫-৫৭)

অধিক কী বলার আছে? স্বয়ং ব্যাসদেব, যিনি বেদকে চারভাগে ভাগ করেছেন, পুরাণ ও মহাভারতাদি প্রকাশ করেছেন, ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেছেন– তাঁরও চিত্তে প্রসন্নতা এলো না সমান জ্ঞান করে পরতত্ত্ব সকলের সাথে পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণের সমতার কথা বলেছেন বলে। পরে দেবর্ষি নারদ সেই দোষের বিষয় বুঝিয়ে দিলে ব্যাসদেব কৃষ্ণকথাপ্রধান শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করে প্রসন্নতা লাভ করলেন।

এখন অনুধাবন করার বিষয় হলো, শ্রীকৃষ্ণের সাথে অবতারগণের সমতাজ্ঞানে যদি অপরাধ সঞ্চার হতে পারে, তবে শ্রীকৃষ্ণের সাথে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সমতায় সাধারণ জীবের কীরূপ অপরাধ হতে পারে? এজন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৯৩)

অর্থ : যে ব্যক্তি সর্বারাধ্য শ্রীনারায়ণকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সাথে সমদৃষ্টি করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

আবার পরমোপাস্যের সাথে অন্য সব উপাস্যের সমতা চিন্তায় যেমন অপরাধ হয়, তেমনি পরম উপাস্যের উপাসনা কৃষ্ণনাম কীর্তনের সাথে অন্য উপাসনার সমতা চিন্তা নিঃসন্দেহে মারাত্মক অপরাধ।

সকল প্রকার শুভকর্মের চেয়ে ভক্তির উৎকর্ষ অনেক অনেক গুণ বেশি এবং শ্রীনামের উৎকর্ষ সেই ভক্তির চেয়েও বেশি, যেহেতু শ্রীনামই ভক্তির কারণ। শুভকর্মের ফলে ভুক্তি (ধন-সম্পদ, স্বর্গসুখ) লাভ হয় এবং জ্ঞান-যোগাদির ফলে মুক্তি লাভ হয়। ভুক্তি ও মুক্তির চেয়েও ভক্তি শ্রেয়, কারণ জ্ঞানযোগাদি সবকিছুই ভক্তিমুখাপেক্ষী; কিন্তু ভক্তি স্বাধীন। দান, যজ্ঞ, তপ, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি সর্বশুভকর্ম থেকে শ্রীহরিভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে বহুভাবে প্রমাণিত হয়েছে–

হরিভক্তি-মহাদেব্যাঃ সর্বা মুক্ত্যাদি-সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ ॥ (ভ. র. সি.)

অর্থ : দান, যজ্ঞ ও জ্ঞান-যোগাদি সকল শুভ কর্মের ফলে যে ভুক্তি-মুক্তিরূপ সিদ্ধিসমূহ লাভ হয়, তা শ্রীহরিভক্তি

মহারাণীর চেটিকা বা দাসীরূপে অনুবর্তিনী হয়ে থাকে, ভক্তিদেবীর এমনই আশ্চর্য প্রভাব।

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে, "*কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ এক কৃষ্ণনাম। যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥*" (১/৩/৬৪) তদুপরি শ্রীনাম যদি ভক্তিরও কারণ হয়, তবে শ্রীনামের সমান কি কোনো শুভক্রিয়া হতে পারে? সর্বশাস্ত্রসার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এও বলা হয়েছে–

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥ (৩/৪/৬৫-৬৬)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর জৈবধর্ম নামক গ্রন্থে বলেছেন, "যত প্রকার ভজন আছে, তার মধ্যে নামভজনই সর্বাপেক্ষা বলবান। নাম ও নামীতে কোনো ভেদ নেই। নিরপরাধে নাম করলে অতি শীঘ্র সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়। আপনি বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে নাম গ্রহণ করুন। নাম করতে করতে নববিধা ভজনের সবই হয়ে থাকে। নাম উচ্চারণ করলে শ্রবণ ও কীর্তন উভয়ই হয়। নামের সঙ্গে হরিলীলা স্মরণ ও মানসে পদসেবা, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন সকলই হয়।"

শ্রীনামের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ

(১) প্রায়শ্চিত্ত

প্রায়শ্চিত্তের ফলে কৃত পাপের ক্ষয় হয়। কিন্তু পাপবাসনা বা পাপের মূল ক্ষয় হয় না। কিন্তু নিরপরাধে নাম গ্রহণ করলে সঞ্চিত ও প্রারব্ধ সকল পাপই নামের গৌণ ফলেই সমূলে বিনষ্ট হয়। আর পাপবাসনার মূল অবিদ্যা নাশ করে চিত্তশুদ্ধির পর নামের মুখ্যফল শ্রদ্ধাদি ক্রমে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করে–

সংকীর্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥ (চৈ. চ. ৩/২০/১০)

(২) তীর্থ

বিভিন্ন তীর্থের নাম আর কত উল্লেখ করা যাবে, সমষ্টি হিসেবে তীর্থের তুলনায় শ্রীনামেরই উৎকর্ষ প্রদর্শিত হয়েছে–

তীর্থকোটি-সহস্রাণি তীর্থকোটি-শতানি চ।
তানি সর্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনাৎ ॥ (হ. ভ. বি. ১১/১৮৫)

অর্থ : শত সহস্র কোটি তীর্থার্জিত সমস্ত পুণ্যফল শ্রীবিষ্ণুর নাম-কীর্তন থেকেই লাভ করা যায়।

গঙ্গা আদি পুণ্যসলীলা নদীসমূহ ও তীর্থসমূহ সকাম জীবের পাপক্ষয়, পুণ্যসঞ্চয় ও মোক্ষ অর্থাৎ চতুর্বর্গ প্রদান করতে পারে। এজন্য এদের বলা হয় পাবন। আর শ্রীনাম তাদেরও পবিত্রতা দান করে বলে তাকে বলা হয়– '*পাবনং পাবনানাম্*'। কারণ নদী ও তীর্থসমূহ পাপক্ষয় ও পুণ্য আদি চতুর্বর্গ প্রদান করতে গিয়ে নিজেরাই মলিন হয়ে পড়ে। তখন তীর্থে সমাগত ভক্ত-সাধুগণের সংস্পর্শ ও হরিকীর্তন সেই মলিনতা অপসারিত করলে তারা পুনরায় পাবনী শক্তি লাভ করেন (ভা. ১/১৩/১০)।

(৩) শুভকর্ম

শ্রীনামের সাথে অন্য কোনো শুভকর্মেরই তুলনা হতে পারে না। তাই হরিভক্তিবিলাসে আছে–

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য

প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং
গোবিন্দকীর্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥ (১১/১৮৬)

অর্থ : গ্রহণের সময় কোটি গাভী দান, কিংবা প্রয়াগে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ অথবা মেরুতুল্য স্বর্ণদান করা হয়, তবু তার ফল শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্তনের ফলের শতভাগের এক ভাগও হয় না।

পৃথকভাবে শুভক্রিয়া ও শুভদ্রব্যের কথা আর কত উল্লেখ করা যাবে? তাই একসঙ্গেই উল্লেখ করা হচ্ছে–

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদিনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু ॥

(হ. ভ. বি. ১১/১৯৬)

অর্থ : দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থাদিতে, দেবতা ও সাধুসেবায়, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে, জ্ঞান ও অধ্যাত্মবস্তুসমূহে সর্বপাপহারিণী ও মঙ্গলদায়িনী যে সকল শক্তি রয়েছে, তা আকর্ষণপূর্বক শ্রীহরি নিজ নামে স্থাপন করেছেন।

(৪) সর্বশুভফল প্রদাতা

যা কিছু শুভ, যা কিছু মঙ্গলপ্রদ ও শ্রেয় সবই মঙ্গলেরও মঙ্গলপ্রদ শ্রীনামেই পর্যবসিত। শাস্ত্রে তাই গীত হয়েছে–

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ (ভা. ১২/৩/৫২)

অর্থ : সত্যযুগে ধ্যানাদি দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্যাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে তার সবই একমাত্র হরিনাম-সংকীর্তনে সহজেই লাভ করতে পারে।

(৫) সর্বোত্তম পাবন

শ্রীনাম-সংকীর্তনের মতো পরম পবিত্রতা ও পরম পাবন আর কিছুই নেই–

নাম্নাং হরে কীর্তনতঃ প্রযাতি,
সংসারপারং দুরিতৌঘমুক্তঃ।
নরঃ স সত্যং কলিদোষ-জন্ম
পাপং নিহন্তাশু কিমত্র চিত্রম্ ॥ (হ. ভ. বি. ১১/১৬৪)

অর্থ : শ্রীহরিনাম-সংকীর্তনের ফলে দুরতিক্রম্য ভবভয়ও বিদূরিত হয়, অতএব কলিদোষজনিত পাপ থেকে যে জীবসমূহ মুক্ত হবে, তাতে আশ্চর্য কী?

দোষবহুল কলির প্রভাবে দেশ, কাল, পাত্র ও দ্রব্য আদির শুদ্ধি নেই। কর্ম-জ্ঞান-যোগ আদি সাধনে কিংবা দান-ব্রত-তীর্থাদি শুভ ক্রিয়ার কোনো ফলই হয় না। কিন্তু তাদের সাথে শ্রীহরিনাম যুক্ত হলে সেসব দোষ শ্রীনামের গৌণ ফলেই অপসারিত হয়, তখন যথোচিত ফলদানে আর বাধা থাকে না (হ. ভ.বি ১১/১৮০)।
কলিযুগ মহা অনিষ্টকারক কালসর্পতুল্য, কিন্তু হরিনামও পরম সঙ্কটত্রাতা। এজন্য শাস্ত্র অভয়দান করে বলছেন–

কলিকালকুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য মা ভয়ম্।
গোবিন্দনামদাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্ ॥ (হ. ভ. বি. ১১/১৭৩)

অর্থ : কলিকালরূপ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ক্রুর কালসর্পকে ভয় নেই, গোবিন্দনামরূপ দাবাগ্নিতে তা দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

একারণেই কলিযুগের যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন–

কলিযুগে সুদুঃসাধ্য অন্য শুভকর্ম।
অতএব নাম আসি হইল যুগধর্ম ॥ (শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

হরিভক্তিবিলাসে আরো বলা হয়েছে–

অনন্যগতয়ো মর্ত্তা ভোগিনোহপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্যাদিবর্জিতাঃ ॥
সর্বধর্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেহপিধার্মিকাঃ ॥

(হ.ভ. বি. ১১/২০১)

অর্থ : যাঁরা অনন্যগতি, নিয়ত বিষয়ভোগী, পরপীড়াদায়ক, জ্ঞান-বৈরাগ্যবর্জিত, ব্রহ্মচর্যশূন্য এবং সর্বধর্মত্যাগী, তারাও বিষ্ণুর নাম মাত্র কীর্তন করেই অনায়াসে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরও দুর্লভ যা, তা লাভ করে থাকে।

(৬) বেদের উদ্ভাবক

শ্রীনামী ও নাম অভিন্ন বলে উভয়ে এক হওয়ায় নামী থেকে যেমন বেদের উৎপত্তি, তেমনি 'প্রণব' থেকেও বেদাদি অখিল শাস্ত্র ও জগতের উৎপত্তির কথা বিদিত–

প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি।
প্রণব হৈতে সর্ববেদ জগতের উৎপত্তি ॥ (চৈ. চ. ২/৬/১৫৮)

আর এই প্রণবেরই পরাবস্থা বা পরিপূর্ণ সবিশেষ 'প্রণব'– কৃষ্ণনাম থেকেই অখিল বেদাদিশাস্ত্রের উৎপত্তি।

(৭) সর্ববেদাধিকত্ব

সর্বশুভবস্তু ও শুভক্রিয়াদি বেদেই প্রকাশিত হয়েছে; সুতরাং বেদ সেসবের অকর বা আশ্রয়। সেই বেদই যে শ্রীনাম থেকে প্রাদুর্ভূত, তার সমান প্রভাব বা মহিমা আর কোথায় থাকবে? সুতরাং শ্রীনামের মাহাত্ম্য বেদের অধিক জানতে হবে। তাই স্কন্দ পুরাণে পার্বতীর উক্তি–

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥

(হ. ভ. বি. ১১/১৮২)

অর্থ : বৎস, তুমি ঋক, যজু ও সামবেদ কিছুই পাঠ করো না, কেবল শ্রীহরির গানযোগ্য 'গোবিন্দ' নাম নিত্য গান করতে থাকো।

সুতরাং শ্রীনামের সাথে অন্য শুভক্রিয়া অদির সমতাচিন্তা তো দূরের কথা কোনো তুলনাই হতে পারে না; তাতে নামাপরাধ সংঘটিত হয়।

পরমেশ্বরের অনন্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণনামের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব

পরতত্ত্বের নাম এবং নামী অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্বের চরম স্বরূপ হওয়ায় কৃষ্ণনামেরই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীরাম যে পরতত্ত্বের দ্বিতীয়, তা শাস্ত্র থেকেই জানা যায়–

বিষ্ণুরেকৈকনামানি সর্ববেদধিকং মতম্।
তাদৃংনাম সহস্রেণ রামনাম সমং স্মৃতম ॥

সহস্রাস্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

অর্থ : বিষ্ণুর এক একটি নাম সর্ববেদাধিক। আবার তাঁর সহস্র নাম এক রামনামের সমান বলে জানতে হবে। তিন বার বিষ্ণু-সহস্রনাম করলে যে ফল হয়, একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করলে সেই ফল হয়। অর্থাৎ এক কৃষ্ণনাম তিন রামনামের সমান।

বেদেও পরোক্ষভাবে কৃষ্ণনামেরই প্রাধান্য কীর্তিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণই ঘনীভূত ব্রহ্ম। ব্রহ্মের নির্বিশেষ নাম 'প্রণব' দ্বারা সবিশেষ কৃষ্ণনামকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এমনকি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীমতি রাধিকারও জপ্য কৃষ্ণনামই– "*জপ্যঃ স্বাভীষ্টসংসর্গী কৃষ্ণনাম মহামনুঃ*" (শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা)। অর্থাৎ নিজ অভীষ্ট কৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্তির সহায় শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শ্রীরাধিকার জপ্য। কৃষ্ণনাম পরম সাধ্য হয়েও পরম সাধন। তাই শ্রীনামী স্বয়ং নামের জয়গানে বিভোর হয়ে বলেছেন, "*...পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্।*" কেবল এক কৃষ্ণনামেই জীবের সমস্ত মলিনতা সুমার্জিত হয়ে শ্রদ্ধাদি ক্রমে সকল ভক্তি ও সাধনাঙ্গ উদ্গমের সাথে সাথে কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তিরূপ পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া যায়। এজন্য শ্রীনামের সঙ্গে কোনো শুভকর্মেরই কোনো সমতা বা তুলনা হতে পারে না; এমনকি অজ্ঞতাবশত করলেও তাতে অপরাধ সংঘটিত হয়।

প্রতিকার

কাহারো যদ্যপি অন্য শুভকর্ম সনে। / নামে সমবুদ্ধি হয় দুষ্কৃতি বন্ধনে ॥
সে দুষ্কৃতি ক্ষয় লাগি করিবে যতন। / নামে শুভবুদ্ধি পাবে, পাবে প্রেমধন ॥
অন্ত্যজ গৃহস্থ শুদ্ধনাম পরায়ণ। / তাঁর পদধূলি দেহে করিবে মৃক্ষণ ॥
খাইবে অধরামৃত পিবে পদজল। / তবে শুদ্ধনামে মতি হইবে নির্মল ॥

(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

* অপরাধই দুষ্ক ... জড়বুদ্ধিতে দেখা) রুচি জন্মে। সাধুসঙ্গে সেই দুষ্ক ...

* বৈষ্ণব সম্বন্ধে ... র্বক মাখতে হবে, তাঁদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ও পদজল ...

হরিনামের প্রতি নামাচার্য ... া করেছিলেন, আপনিও সেরূপ করুন–

"হে নাথ, আমার ব ... চ্চারণ করি মাত্র। হে প্রভু, তোমার শ্র ... মার জিহ্বায় নৃত্য করো। তুমি তোমা ... নিতে পারো, কিন্তু আমার জন্য কৃষ্ণ ... তা তুমি আবির্ভূত হয়েছো। আমিও ... তুমি অধমতারণ– অচ্ছেদ্য এ সম্বন্ধের ...

নামাপরাধ প্রমাদ– সকল অনর্থের মূল

হরিদাস বলে প্রভু, হেথা সনাতনে। / আর ত গোপাল ভট্টে দক্ষিণ-ভ্রমণে ॥
শিখাইলে অপ্রমাদে শ্রীকৃষ্ণভজন। / প্রমাদকে অপরাধে করিলে গণন ॥
অন্য অপরাধ ত্যাজি সদা নাম লয়। / তবু নামে প্রেম নাহি হয়ত উদয় ॥
তবে জানি 'প্রমাদ' নামেতে অপরাধ। / প্রেমভক্তি-সাধনেতে করিতেছে বাধ ॥

(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন, "*এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥*" মহাপ্রভু নিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একই সাথে সাধনে নিষ্ঠা লাভের জন্য প্রমাদ বা অনবধানতাকে পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন।

প্রমাদ কী?

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমাদের অর্থ করেছেন 'অনবধানতা', যার অর্থ অমনোযোগিতা, যত্নহীনতা, নিষ্ঠাহীনতা। তিনি একে সকল অনর্থের মূল বলেছেন। শ্রীহরিনামচিন্তামণিতে বলা হয়েছে–

প্রমাদ– অনবধান এই মূল অর্থ।
ইহা হৈতে ঘটে প্রভু সকল অনর্থ ॥

প্রমাদের আভিধানিক অর্থ : অনবধানতা, অসাবধানতা, অমনোযোগিতা; কী করতে হবে সে সম্পর্কে বিচারের অভাব বা বিমূঢ়তা, বিস্মৃতি।

এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন,

"তুমি যদি অমনোযোগী হও, তা অপরাধ। এ কথা অবশ্যই তোমার জানা উচিত। এ অমনোযোগিতা পরিহার করার চেষ্টা করো। কৃষ্ণ আমাদের কতভাবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দিচ্ছেন : নাম, রূপ, লীলা, পরিকর আরো কত কী।" (শ্রীল প্রভুপাদ পত্রাবলি, ৩০/১০/৭২)

এ অপরাধকে সংস্কৃতে প্রমাদ বলা হচ্ছে, যার অর্থ বাতুলতা বা স্মৃতিবিভ্রম। যদি কেউ নামোচ্চারণের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করে, অথচ একইসাথে তাঁর কথা ভুলে উদাসীনতা বা অবহেলা দেখিয়ে বিভিন্ন জড় বিষয়ের প্রতি মনকে নিবিষ্ট করে, তবে নিঃসন্দেহে তা বাতুলতা বা বিস্মৃতির লক্ষণ এবং মারাত্মক অপরাধ।

এস্থলে একটি বিষয় লক্ষণীয়, শাস্ত্রে সাধনের যত উপদেশ বা বিধিনিষেধ প্রদত্ত হয়েছে, তার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো : "*স্মর্তব্য সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।*" (পদ্মপুরাণ) অর্থাৎ সর্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করো– এটাই সমস্ত বিধির মূল এবং কখনোই তাঁকে বিস্মৃত হয়ো না– এটাই সমস্ত নিষেধের মূল। শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করাই সংসার বন্ধন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। সেজন্যই শাস্ত্রে বিষ্ণুস্মৃতিকেই যাবতীয় সাধনের মূল ভিত্তিরূপে স্থাপন করা হয়েছে। যে সাধনে বিষ্ণুস্মৃতি বা কৃষ্ণস্মৃতি নেই, তা শাস্ত্রোপদিষ্ট সাধন নয়। একইভাবে যে হরিনাম সাধনে শ্রীহরির প্রতি আসক্তিজনিত স্মৃতি নেই, তা 'অনাসঙ্গ' সাধন। এমন সাধনের কথা উল্লেখ করেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন–

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥"

(চৈ. চ. আদি ৮/১৫)

শ্রবণ ও কীর্তন ছাড়াও স্মরণ করা যায়, কিন্তু স্মরণ ভিন্ন কীর্তন ও শ্রবণ সম্ভব হয় না। কারণ অর্থগ্রাহ্য না হয়ে শব্দ উচ্চারিত হলেও অন্তরে উদয় না হওয়া পর্যন্ত বা স্মরণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো নাম বা শব্দ উচ্চারিত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, শিক্ষক ছাত্রকে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে বললেন, কিন্তু ছাত্রটি কবিতার অর্ধেক বলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল, কারণ আর সে স্মরণ করতে পারছে না। সে কবিও নয় যে তার অন্তরে কবিতার উদয় হবে আর তা আবৃত্তি করবে। আবার উচ্চারিত কোনো শব্দ শ্রবণ করেও যদি মন স্পর্শ না করে, তবে তা গ্রাহ্য হয় না। যেমন : সচরাচর এমন হয় যে, কোনো বিষয়ে নিবিষ্ট থাকার কারণে পাশ দিয়ে রেলগাড়ি গেলেও মানুষ শুনতে পায় না। তার মানে অন্যমনস্ক হওয়ার কারণে তা শ্রবণ করা সম্ভব হয়নি।

সুতরাং বুঝতে হবে কীর্তন ও শ্রবণের সাথে স্মরণের সংযোগ অবশ্যই আছে। তবে প্রভেদ হলো, কীর্তনকালে মনোগ্রাহ্য হওয়ার পরই নাম উচ্চারিত হয়; আর শ্রবণকালে শ্রবণ করার পর তা মনোগ্রাহ্য হয়। এ উভয় কার্য অত্যন্ত দ্রুত নিষ্পন্ন হয়; তাই একইসাথে সংঘটিত হয় বলে মনে হয়। সুতরাং নাম গ্রহণের ক্ষেত্রেও যদি তা নামগ্রহণকারীর অন্তর থেকে উদিত না হয় এবং একইসাথে শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তা অন্তর স্পর্শ না করে, তবে সত্যিকার অর্থে শ্রবণ-কীর্তন হয় না। এ অবস্থায় রেলগাড়ির মতো শব্দ করে নাম উচ্চারণ করলেও তাতে শ্রবণ ও কীর্তন কোনোটিই হয় না।

অতএব নাম গ্রহণকালে যদি শ্রীনাম প্রভুর স্মৃতিই হৃদয়ে জাগ্রত না হলো, তবে নামের প্রতি অমনোযোগিতা ও অযত্নশীলতা প্রকাশ পেল না কি? যদি তাই হয়, তবে এ অমনোযোগিতা ও অযত্নশীলতাই অনবধানরূপ নামাপরাধ। এ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীনামপ্রভু নামের মুখ্যফল প্রদান করেন না। এজন্য ভাগবতে (২/২/৩৬) আছে–

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্নৃণাম্ ॥

অর্থ : হে পরীক্ষিৎ, প্রমাদ অনবধানে বিক্ষেপ আদি ঘটলে নামে জ্ঞানপূর্বক হেলা হয়, অতএব সমস্ত চিত্ত ও

ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করে সর্বত্র সবসময় ভগবান শ্রীহরির নাম আদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করো।

উল্লেখ্য, স্মরণ পাঁচ প্রকার; যথা : ১) যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম স্মরণ, ২) পূর্বের কোনো বিষয় থেকে চিত্তকে আকর্ষণ করে সামান্য পরিমাণে মনে ধারণের নাম ধারণা, ৩) বিশেষ রূপ আদি চিন্তনের নাম ধ্যান, ৪) অমৃতধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম ধ্রুবানুস্মৃতি এবং ৫) ধ্যেয়মাত্র স্ফূর্তির নাম সমাধি।

সাসঙ্গ ও অনাসঙ্গ ভজন

যেখানে জিহ্বার দ্বারা হরিনাম কীর্তন হয় অথচ মন শ্রীহরির সুখানুসন্ধানময়ী চিন্তায় যুক্ত না হয়ে নিজের সুখের জন্য বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সেস্থলে তা নামকীর্তনরূপ ভক্তি না হয়ে অনবধানরূপ নামাপরাধই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সাসঙ্গ ভজন ও অনাসঙ্গ ভজন বিষয়ে ধারণা থাকাও অত্যন্ত জরুরি। সাসঙ্গ শব্দের টীকায় শ্রীল জীবপাদ উল্লেখ করেছেন– "নিপুণতার সাথে অনুষ্ঠিত হলেই সাধনকে সাসঙ্গ সাধন বলে। শ্রীহরির সাক্ষাৎ-ভজনের প্রবৃত্তিই সেই নিপুণতা।" অর্থাৎ শ্রীহরির সাক্ষাতে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রীতির উদ্দেশ্যে হরিনাম শ্রবণ-কীর্তন করার অনুভূতিযুক্ত ভজনকেই সাসঙ্গ ভজন বলা হয়। যেখানে এরূপ অনুভূতি থাকে না অর্থাৎ ভজনের সময় মন শ্রীহরির পাদপদ্মে নিবিষ্ট না থেকে দেহাসক্তিবশত অন্যান্য বিষয়চিন্তায় আবিষ্ট থাকে, তাকে অনাসঙ্গ সাধন বলে। অনাসঙ্গ সাধনের দ্বারা কখনোই হরিভক্তি লাভ হবে না। তাই সন্ন্যাস গ্রহণের আগে দর্শনার্থী নবদ্বীপবাসীগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ–

কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ বদনে ॥ (চৈ. চ. মধ্য ২৫/৭৭)

অহর্নিশি চিন্তনের দ্বারা নাম ভজনের সময় শ্রীহরির সঙ্গ অনুভব এবং মনকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিবিষ্ট রেখে মুখে নাম গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে।

প্রমাদের প্রকারভেদ

প্রমাদ তিন প্রকার, যথা : (১) **ঔদাসীন্য,** (২) **জাড্য** ও (৩) **বিক্ষেপ।**

(১) ঔদাসীন্য

বিষয়ী লোকেরা মুখে হরিনাম উচ্চারণ করলেও নামের প্রতি তারা উদাসীন থাকে, আর মনোযোগ থাকে তাদের বিভিন্ন জড় বিষয়ের প্রতি। যত মালাই জপ করুক না কেন তারা, জপের সাথে তাদের কোনো সংযোগ নেই। নবীন ভক্তদের ক্ষেত্রেও তেমন হয়। জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তিই এর কারণ। একারণে নামজপে তাদের রুচি যেমন থাকে না, থাকে না কোনো আনন্দও। নাম হয় অপরাধযুক্ত।

রুচি যায় অন্য স্থানে, নামে উদাসীন। / নামে চিত্ত লগ্ন নহে, জপে প্রতিদিন ॥
চিত্ত একদিকে, আর অন্যদিকে নাম। / তাহার মঙ্গল কিসে হয় গুণধাম ॥
এই তো অনবধান-দোষের প্রকার। / বিষয়ী-হৃদয়ে প্রভু বড় দুর্নিবার ॥ (হ. চি.)

প্রতিবিধান

নামের প্রতি অনুরাগ না হওয়া পর্যন্ত নামগ্রহণে যত্নের প্রয়োজন। এজন্য বিষয়াসক্তি ছেড়ে নামপরায়ণ সাধুর কাছে গিয়ে নিষ্ঠার সাথে হরিনাম করতে হবে। শ্রীনামের প্রতি সাধুর উৎসাহ, মনোযোগ ও ভাব দেখে তা অনুসরণে প্রবৃত্ত হলে ঔদাসীন্য ত্যাগ করার স্পৃহা হবে। ধীরে ধীরে ঔদাসীন্য চলে গেলে নামে মনস্থির করা সম্ভব হবে। যে বিধান অনুসরণ করে সাধুগণ নামভজনে আনন্দ লাভ করেছেন, তা মেনে ক্রমশ নামসংখ্যা বৃদ্ধি করলে নামামৃত আস্বাদনের

জন্য মন উৎসুক হয়ে উঠবে। তুলসীদেবীর সামনে অথবা বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের কোনো লীলাস্থলীতে নামজপ করা অত্যন্ত অনুকূল। ঔদাসীন্য দূর করার আরেকটি উপায় হলো অনুকূল পরিবেশে বসে ধ্যানপূর্বক জপ করা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এ সময় মাথা ও মুখ কাপড় দিয়ে আবৃত করে রাখার কথা বলেছেন, যাতে নামের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সুবিধা হয়।

(২) জাড্য (আলস্য)

জাড্যের অর্থ হলো জড়তা, আলস্য, নীরস, নিস্পৃহ, ভাবলেশহীন অবস্থা। হরিনামামৃত আস্বাদনে জাড্য এক বড় প্রতিবন্ধক। নামজপে জাড্য থাকা বলতে জড়তা, আলস্য ও ভাবলেশহীন হয়ে জপ করা, অন্যকিছু করার জন্য জপের মাঝখানে থামা, মালা শেষ না করেই রেখে দেওয়া অথবা বিশ্রাম নেয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে জপ শেষ করাকে বোঝায়। এর ফলে কখনোই জপে রুচি লাভ হয় না।

প্রতিবিধান

বিশুদ্ধ সাধু অন্বেষণ করে তাঁদের সঙ্গ করতে হবে, যাঁরা কখনোই অর্থহীন কথা বা কাজে সময় নষ্ট করেন না, বরং গভীর মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে নিরন্তর হরিনাম জপ-কীর্তন করেন। সাধুচরিত্রে অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম (ভাবাঙ্কুর প্রাপ্ত হলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই হরিসেবার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়, মুহূর্তকালও বৃথা যায় না) দর্শন করে তা অনুসরণ করলে নামভজনের প্রতি আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শ্রীহরিনামচিন্তামণিতে আছে–

অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম সাধুর চরিত।
দেখিলে তাহাতে রুচি হইবে নিশ্চিত ॥
মনে হবে তাহা করে ইঁহার সমান।
স্মরিব, গাহিব নাম হয়ে ভাগ্যবান ॥
সেই ত উৎসাহ আসি অলসের মনে।
জাড্য দূর করে কৃষ্ণনামের স্মরণে ॥

(৩) বিক্ষেপ

মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা বা মনোযোগের বিচ্যুতিকে বিক্ষেপ বলা হয়। বিক্ষেপ থেকেই মোহ, ঔদাসীন্য ও জড়তারূপ প্রমাদ উৎপন্ন হয়। পূর্ব অপরাধের কারণে বিক্ষেপ হয়ে থাকে। বিক্ষেপ আছে মানে অর্থ-সম্পদ, কনক-কামিনী ও জয়-পরাজয়ের প্রতি মোহ আছে, আছে প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্যবৃত্তিও। বিক্ষেপই কোনো বিষয়ে কাউকে মনঃসংযোগ করতে দেয় না। বিভিন্ন পার্থিব বিষয়ের প্রতি মন অভিনিবিষ্ট থাকে। তখন নামগ্রহণকারী নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম যথাশীঘ্র শেষ করার চেষ্টা করে, আর জপ করলেও প্রকৃতপক্ষে মন সেসবের কিছুই শুনতে পায় না।

প্রতিবিধান

নামসাধনে অযত্ন পরিহার করে নিষ্ঠার সাথে বৈষ্ণব সদাচারসমূহ পালনের মাধ্যমে বিভিন্ন জড় বিষয়ের প্রতি ছড়িয়ে থাকা আসক্তিকে প্রত্যাহার করার প্রয়াস করতে হবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, হরিদিনে অর্থাৎ একাদশী, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী এবং ভগবান ও ভক্তের আবির্ভাব তিথিতে ভোগচিন্তা পরিত্যাগ করে সাধুসঙ্গে দিনরাত হরিনাম জপ-কীর্তন করতে হবে। এসব তিথি উৎসাহের সাথে পালন করে আরো বেশি করে ভগবানের চিন্তা করার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। বৃন্দাবন, মায়াপুরের মতো ভগবানের লীলাস্থলীসমূহে অবস্থান করে রূপানুগ বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যে হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন, ভজন, ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নে মজে থাকলে ক্রমে ক্রমে চিত্তে শ্রেষ্ঠরসের উদয় হবে এবং নিকৃষ্ট রসের প্রতি মন আর ধাবিত হবে না। প্রশান্তচিত্ত বিশুদ্ধ সাধুগণের কীর্তিত নামগান শুনে চিত্ত

স্থির হবে; স্থিরচিত্ত তখন নামরসে নিমজ্জিত হয়ে পরমানন্দ আস্বাদন করবে। এভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের প্রতি অকৃত্রিম আকর্ষণ জেগে উঠলে মন আর বিভিন্ন জড় বিষয়ের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হবে না। কৃষ্ণভাবনা আস্বাদিত হলে এমনিতেই জড়-আসক্তি কমে যায়।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে এ বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে–

হরিক্ষেত্রে হরিদাস হরিশাস্ত্র ল'য়ে। / উৎসবে মজিবে সুখে পরম নির্ভয়ে ॥
ক্রমে ভক্তিকাল মনে করিবে বর্ধন। / হরিকথা মহোৎসবে মজাইয়া মন ॥
শ্রেষ্ঠরস ক্রমে চিত্তে হইবে উদয়। / জড়ের নিকৃষ্ট রস ছাড়িবে নিশ্চয় ॥
মহাজন-মুখে হরিসংগীত শ্রবণে। / মুগ্ধ হবে মনঃকর্ণ রস আস্বাদনে ॥
নিকৃষ্ট বিষয়স্পৃহা হইবে বিগত। / নামগানে চিত্ত স্থির হবে অবিরত ॥

বিষয়াসক্ত মন প্রাকৃত রূপ-রসাদির প্রতি লোভ ও ভোগ ছাড়া থাকতে পারে না। তাই সেসব বিষয়ভোগ থেকে তাকে নিবৃত্ত বা নিরোধ করার চেষ্টা না করে এমন রূপ-রসাদি গ্রহণ করতে দিতে হবে, যা তার চিরন্তন রুচির উপযোগী অথচ তা ভোগ করে তার ভবরোগ দূরীভূত হয়। রূপের পাগল মন, তাকে রূপ-সৌন্দর্যের সুধানিধি শ্রীকৃষ্ণের রস-সুধা পান করতে দিন। মন নানা রসাত্মক গ্রাম্যকথা শ্রবণ-কথনে দিবানিশি নিমগ্ন, তাকে সর্বরসাকর কৃষ্ণকথা রস সাগরে ডুবতে দিন। সুঘ্রাণের প্রতি লোলুপ মনকে ভগবানের মহাসুগন্ধযুক্ত পুষ্পমাল্য-চন্দন-আতরাদি সংস্পর্শ দিন। রসনার প্রতি আসক্ত মনকে বিচিত্র বিচিত্র ভগবৎপ্রসাদ আস্বাদন করতে দিন। স্পর্শসুখের জন্য কাতর মনকে শ্রীভগবানের অঙ্গস্পৃষ্ট চন্দন-মালা ইত্যাদি এবং ত্রিতাপহীন ভগবদ্ভক্তগণের সুশীতল গাত্রের আলিঙ্গন সুখ দিন। অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান ও তৎসম্বন্ধী বিষয়ে আকৃষ্ট হলে দুর্জয় ও উন্মত্ত মন অল্পকালের মধ্যে জড়বিষয় পরিত্যাগ করে পরম শান্ত অবস্থা লাভ করবে।

প্রমাদ নামক নামাপরাধের প্রতিকার

* নামসাধনে যেন কোনো প্রকার অযত্ন না হয় সেদিকে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত।
* অধিক সংখ্যক নাম গ্রহণের চেষ্টা না করে ভাব সহকারে স্পষ্টাক্ষরে নিরন্তর হরিনাম গ্রহণের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত।
* শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, হরিনাম ঠোঁট দিয়ে নয় হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে উচ্চারণ করতে হবে, তেমনি শ্রবণও করতে হবে গভীরভাবে হৃদয় স্পর্শ করিয়ে।
* নাম গ্রহণের জন্য অনুকূল স্থানে বসে একাগ্রতার সাথে নাম গ্রহণ করার অভ্যাস করুন।
* কেবল নিজের চেষ্টায় কোনো ব্যক্তি প্রমাদ বর্জন করতে পারে না, কিন্তু কৃপা লাভ করলে তা অনায়াসে করা যায়।

সুতরাং কৃপা লাভের জন্য কাকুতি-মিনতি নিতান্ত আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি কেবল নিজবুদ্ধি ও প্রচেষ্টার বলে ভজনে প্রবৃত্ত হয়, তারা কখনোই ফল লাভ করতে পারে না। কৃষ্ণকৃপাই সকল কার্যের মূল। সুতরাং যে ব্যক্তি কৃষ্ণকৃপা পাওয়ার চেষ্টা করে না, সে নিতান্ত ভাগ্যহীন। এজন্য প্রার্থনা করতে ভুলবেন না, "হে কৃষ্ণ, তোমার কৃপা ছাড়া জগতের কেউ কিছু করতে পারে না। আমিও তোমার নামে মনোনিবেশ করতে পারছি না। দুষ্ট ও অবাধ্য মন আমার কিছুতেই কথা শুনছে না। কৃপাপূর্বক আমাকে সাহায্য করো প্রভু। তোমার মধুর নামের প্রতি আমার রুচি প্রদান করো। তোমার কৃপা ছাড়া আমার মতো অধম-পামরের আর কোনো গতি নেই।" "হে শচীনন্দন গৌরহরি, আমি নিতান্ত ভাগ্যহীন, কৃষ্ণনামের প্রতি আমার কোনো অনুরাগ নেই। দয়া করে তুমি আমাকে গ্রহণ করো, কৃষ্ণনামের প্রতি আমার অনুরাগ দাও।"

প্রমাদমুক্ত হওয়ার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

হরিনাম জপের সময় অস্থির হয়ে ভাববেন না– "আমাকে এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, আবার ওখানে যেতে হবে, তাড়াতাড়ি নামজপ শেষ করে আমাকে ওই জরুরি কাজটা করতে হবে।" ভেবে দেখুন, যে কৃষ্ণনাম আমাদের সর্বসিদ্ধি দান করে, তা জপ করার জন্য আমাদের অবশ্যই কিছু সময় বরাদ্দ রাখা উচিত এবং পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারেই তা করা উচিত। মনে রাখবেন, অন্য যেকোনো কাজকে হরিনামের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবাও মারাত্মক অপরাধ। সুতরাং নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে প্রস্তুত থাকার পাশাপাশি সর্বাধিক গুরুত্ব ও পূর্ণ মনোযোগের সাথে তা করাও উচিত। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কালের নিয়মে তা হতে থাকবে। অবাধ্য মনের চাঞ্চল্য সহ্য করার চেষ্টা করুন, কোলাহল থেকে দূরে থাকুন; আর জড়-জাগতিক সুখ-দুঃখে উদাসীন ও নিরুদ্বিগ্ন থাকার চেষ্টা করুন। সর্বোপরি, হরিনামের আশ্রয়ে থাকলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই খুশি হয়ে আমাদের সব সমস্যার সমাধান করবেন। সমস্যা কেবল একটাই– "কীভাবে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারব।"

একবার এক শিষ্য শ্রীল প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেছিলেন, "প্রভুপাদ, গৃহ, পরিবার, দেশ-জাতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যার মন আচ্ছন্ন, তার পক্ষে নিরন্তর হরিনাম জপ করা কীভাবে সম্ভব?" উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "ঠিক আছে, করুক সেসব চিন্তা; কিন্তু একইসাথে নামজপও চালিয়ে যাক। দুটোই চলতে থাক, তাতে হরিনামই জয়ী হবে। মায়া কৃষ্ণভাবনা থেকে তোমাকে নিচে নামানোর চেষ্টা করছে, তুমিও মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে মায়ার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করো। এটিই মায়ার সাথে যুদ্ধ। শেষে দেখবে মায়াই পালাতে বাধ্য হবে।"
কনক-কামিনী, ধন-মানের প্রতি আসক্তি আর প্রতিষ্ঠাশাই বিক্ষেপের কারণ; নিষ্কাম হলেই মন শান্ত হয়ে যায়। তাই তৃণের চেয়ে নিচু, বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু, নিজে অমানী আর অন্যকে মান দিয়ে প্রশান্তচিত্তে সর্বদা হরিনাম গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন, প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে হরিনামই আপনাকে পথ দেখাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই আপনি এসব গুণের অধিকারী হয়ে উঠবেন।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের অর্থ গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। এ মহামন্ত্রই আপনার মন ও আপনাকে রক্ষা করবে। চিত্তবিক্ষেপ ও বাহ্য পরিবেশের কারণে বিচলিত হবেন না। দীন-হীন ভিক্ষুক হয়ে ভক্তিভরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করুন, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিত সাড়া দিয়ে আপনার মনকে পূর্ণরূপে অধিকার করবেন।

নামভজনের জন্য পূর্বতন আচার্যগণ বিঘ্নহীন, ভজন অনুকূল পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দিতেন। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগের বৃন্দাবন নিশ্চয়ই এখনকার চেয়ে অনেক বেশি শান্ত ছিল। তবু ভক্তপ্রবর সনাতন গোস্বামীপাদ বিঘ্ন এড়ানোর জন্য কুড়ি ফুট মাটির নিচে বসে নামজপ করতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও পূর্ণ মনোনিবেশের জন্য বিঘ্নহীন ভজনানুকূল স্থান বেছে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। গোদ্রুম দ্বীপে তিনি নামভজনের জন্য তাঁর গৃহে মোটা দরজাযুক্ত একটি ভজনকক্ষ তৈরি করেছিলেন। নামভজনের জন্য তিনি এমন নিরালা পরিবেশের কথাই বলেছেন। একাগ্রচিত্তে নামস্মৃতি অভ্যাস করার জন্য সর্বজীবের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের কথা এখানেও কিছু তুলে ধরা হলো :

প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥
ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥ (চৈ. ভ. ২৩/৬৫০)

এস্থলে নির্বন্ধ শব্দের অর্থ এই যে, সাধক ১০৮ সংখ্যক তুলসীমালায় এ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর জপ করবেন। চার মালায় এক গ্রন্থ হয়। এ গ্রন্থ ক্রমশ বৃদ্ধি করতে করতে ষোল গ্রন্থে এক লক্ষ নাম হয়। এভাবে তিন লক্ষ নামে

পৌঁছালে অখিল নামেই জীবন যাপিত হবে। পূর্বতন আচার্যগণ সবাই প্রভুর এ আদেশ পালন করে সর্বসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এখনো এ নামজপের দ্বারা সকলের সর্বসিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা বিদ্যমান। মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী সবাই এ নামের অধিকারী।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (৩/২৮/৯) তাৎপর্যে মন নিয়ন্ত্রণে নামগ্রহণের আবশ্যকতা তুলে ধরেছেন :

> কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা এবং মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করা, যাতে মন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন কৃষ্ণনামের চিন্ময় শব্দতরঙ্গে স্থির হয়। নির্দিষ্ট বিধির দ্বারা প্রাণবায়ুর পথ শোধন করার দ্বারা মনকে সংযত করার প্রকৃত উদ্দেশ্য তৎক্ষণাৎ আপনা থেকেই সাধিত হয়ে যায়, যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে মনকে স্থির করা যায়। যারা দেহাত্মবুদ্ধিতে অত্যন্ত নিমগ্ন, তাদের জন্যই হঠযোগ বা প্রাণায়ামের পন্থা বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছে, কিন্তু যারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের সরল পন্থা অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা অনায়াসে তাঁদের মনকে স্থির করতে পারেন।
>
> শ্বাস গ্রহণের পথ পরিষ্কার করার জ... দওয়া হয়েছে, যথা– পূরক, কুম্ভক ও রেচক। শ্বাস গ্রহণ করাকে বলা হয় পূরক, তা ধারণ করাকে বলা হয় কুম্ভক এবং অবশেষে তা ত্যাগ করাকে বলা হয় রেচক। বিপরীতক্রমেও এ পন্থাটি সম্পন্ন করা যায়। শ্বাস ত্যাগ করার পর তা কিছু সময়ের জন্য বাইরে রেখে, তারপর শ্বাস গ্রহণ করা যায়। যে নাড়ির দ্বারা নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাদের বলা হয় ইড়া ও পিঙ্গলা। ইড়া ও পিঙ্গলা শোধন করার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে জড় সুখভোগ থেকে প্রত্যাহার করা। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, মনই মানুষের শত্রু এবং মনই বন্ধু, সে অবস্থার পরিবর্তন হয় জীবের বিভিন্ন আচরণ অনুসারে। মন যখন জড় সুখভোগের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয়, তখন মন শত্রু হয়ে যায় এবং সেই মন যখন পরমেশ্বর ভবগান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ হয়, তখন সে পরম বন্ধুতে পরিণত হয়। যোগ-পদ্ধতিতে পূরক, কুম্ভক ও রেচকের দ্বারা অথবা সরাসরি যখন মনকে শ্রীকৃষ্ণের নাম বা রূপে নিবদ্ধ করা হয়, তখনো একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ভগবদ্গীতায় (৮/৮) উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাণায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্তব্য (*অভ্যাসযোগযুক্তেন*)। সংযমের এই পন্থার দ্বারা মন বহির্মুখ চিন্তায় মগ্ন হতে পারে না (*চেতসা নান্যগামিনা*)। এভাবে মনকে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানে নিবদ্ধ করার দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় (*যাতি*)।

নবম নামাপরাধ

"*অশ্রদ্দধানে বিমুখেহপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।*" **শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্যনামের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ দান করা।**

ব্যাখ্যা

কৃষ্ণনামই জীবের সর্বস্ব; কৃষ্ণনামের আশ্রয় করলেই সর্বকর্ম করা হয়– এরূপ বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলা হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, বেদে যা কিছু উপদিষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে হরিনামোপদেশই সর্বশ্রেষ্ঠ। অনন্য ভক্তিতে যাঁদের শ্রদ্ধা জন্মেছে, তাঁরাই হরিনামের যথার্থ অধিকারী। যাদের শ্রদ্ধা হয়নি, অপ্রাকৃত সেবাবিমুখ এবং হরিনাম শ্রবণে রুচিহীন, তাদের হরিনাম উপদেশ করলে নামাপরাধ হয়। হরিনামই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন এবং হরিনাম গ্রহণ করলে সকলের মঙ্গল হবে এমন উপদেশ দেওয়াই ভালো, কিন্তু অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত হরিনাম প্রদান বা দীক্ষা দেওয়া যাবে না, তাতে অপরাধ হবে। যখন তুমি পরমভাগবত হবে, তখন তুমিও শক্তিসঞ্চার করতে পারবে। তখন কৃপা করে নামের প্রতি যে জীবের শ্রদ্ধা উৎপত্তি করবে, তাকে নামোপদেশ করবে। যতদিন মধ্যম বৈষ্ণবের স্তরে থাকবে, ততদিন অশ্রদ্দধান, বহির্মুখ ও বিদ্বেষী ব্যক্তিদের উপেক্ষা করবে। এমন অনেকেই আছে, যারা অর্থ ও যশ লাভের জন্য অনধিকারী ব্যক্তিকে হরিনাম মন্ত্র দান করে, তারাও নামাপরাধী।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, বদ্ধজীব সাধারণত অজ্ঞ হওয়ায় হরিনামের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা না থাকাই স্বাভাবিক।

তাকে হরিনামের মাহাত্ম্য না বললে সে জানবে কীভাবে? উপদেশের প্রয়োজনই হয় শ্রদ্ধাহীন বহির্মুখ জনের জন্য। সাধুদের মুখে ভগবৎকথা শুনতে শুনতে শ্রোতার শ্রদ্ধাদি জন্মে। এ থেকে বোঝা যায় যে, পূর্বে শ্রোতার শ্রদ্ধা ছিল না। সেই শ্রোতা শ্রদ্ধাহীন বলেই তো সাধুগণ তাকে হরিকথা শোনাতে ক্ষান্ত হননি, প্রসঙ্গক্রমে উপদেশ দিতেও বিরত হননি। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেও বলেছেন– "ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। / তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায় ॥" (চৈ. চ. ২/২২/১২) এস্থলেও শ্রদ্ধাহীনকে উপদেশ দেওয়ার কথাই বলা হচ্ছে। তাহলে একে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে কেন?

উত্তর হলো : অশ্রদ্দধানে (শ্রদ্ধাহীনে) বিমুখে অপি (এবং বিমুখ হলেও) অশৃণ্বতি (যে উপদেশ শোনে না, গ্রাহ্য করে না, তাকে) যশ্চ উপদেশঃ (যে উপদেশ), তা অপরাধজনক। এস্থলে 'অপি' এবং 'অশৃণ্বতি' শব্দ দুটির ওপরই সমস্ত তাৎপর্য নির্ভর করছে। অপি শব্দের মাধ্যমেই বোঝানো হচ্ছে যে, শ্রদ্ধাহীন ও বিমুখকে তো উপদেশ দেওয়াই যায়; কিন্তু যদি সে উপদেশ না শোনে, গ্রাহ্য না করে, উপেক্ষা করে (অশৃণ্বতি), তবে তাকে উপদেশ দেওয়া যাবে না। অশৃণ্বতি শব্দের দ্বারা এও বোঝায় যে, দুই একবার তাকে উপদেশ দেওয়া যায়, নতুবা সে উপদেশ শোনে কি না, গ্রাহ্য করে কি না, তা জানা যাবে কীরূপে? যখন দেখা যাবে সে উপদেশ গ্রাহ্যই করে না, তবে আর তাকে উপদেশ দেওয়া যাবে না, দিলে অপরাধ হবে। কারণ, যে গ্রাহ্যই করে না তাকে নামোপদেশ দিতে গেলে সে নামের অবজ্ঞা, অবমাননা ও অমর্যাদা করবে। তখন উপদেষ্টাকেই সেই অপরাধ স্পর্শ করবে। তিনি উপদেশ না করলে তো অবজ্ঞার অবকাশ থাকত না।

পূর্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি কথায় বলা হয়েছে, পরমভাগবতের শক্তিসঞ্চারের ক্ষমতা থাকে। অর্থাৎ তিনি জীবের মধ্যে সংকীর্তনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করতে পারেন। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলেই কেবল তাকে নামোপদেশ করার কথা বলেছেন। এখানে নামোপদেশ দ্বারা নাম প্রদান বা দীক্ষাদানকে বোঝানো হচ্ছে। সুতরাং হরিকথা ও হরিনাম শোনানোর মাধ্যমে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের উদয় হলেই কেবল তাকে হরিনাম দীক্ষা প্রদান করা যাবে। এর মাধ্যমে দীক্ষার পূর্বে শিক্ষাদানের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে। হরিনাম শোনানোর মধ্যে অপরাধ হয় না, অপরাধ হয় শ্রদ্ধাহীন অযোগ্য ব্যক্তিকে হরিনামের গুহ্য মহিমা শোনালে।

উদাহরণস্বরূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং জগাই-মাধাইয়ের মধ্যে প্রথমে শ্রদ্ধার সঞ্চার করে তারপর হরিনাম প্রদান করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদও যখন নিউইয়র্কের হিপ্পিদের মাঝে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করেছিলেন, তখন তিনি প্রথমে গাছের নিচে বসে হরিনাম কীর্তন করেছিলেন, তা শোনে হিপ্পিরাও তা কীর্তন করতে থাকে এবং এভাবে তাদের মধ্যে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রীল প্রভুপাদ তাদের হরিনাম কীর্তন করতেও উৎসাহিত করতেন। তারপর মাদকসহ অন্যান্য বদভ্যাসগুলো ছাড়তে বলতেন এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা উদিত হওয়ার পরই তিনি তাদের দীক্ষা প্রদান করতেন।

নবম নামাপরাধকে শিবনামাপরাধ বলার কারণ

নামাপরাধ সম্পর্কিত উল্লিখিত শ্লোকের 'সঃ খলু হরিনামাহিতকরঃ' উক্তির দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে দশবিধ নামাপরাধ হরিনামের বিষয়েই বলা হয়েছে। কিন্তু এ নবম নামাপরাধের স্থলে হরিনামাপরাধের বর্ণনায় শিবনামাপরাধ বলার কারণ কী?

এর প্রথম উদ্দেশ্য হলো, শিব শ্রীহরিরই একটি নাম। শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময়। বিষ্ণু-সহস্রনামস্তোত্রে শ্রীহরির এ 'শিব' নাম দেখা যায়। এজন্য শিবনামাপরাধ উক্তির দ্বারা হরিনামাপরাধকেই নির্দেশ করা হয়েছে; কারণ হরিনাম অপরাধের স্থানে শিবের নাম উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক। তবে এর অন্য একটি তাৎপর্যও আছে :

দ্বিতীয় নামাপরাধের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বা মূল বিষ্ণু বা আদ্যহরি থেকে শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাগণের কারোরই কোনো স্বতন্ত্র নেই অর্থাৎ কেউই স্বয়ংসিদ্ধ নন, শ্রীকৃষ্ণ থেকেই সবার অভিব্যক্তি। ঠিক

বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, পত্র, পুষ্প যেমন বৃক্ষ থেকে স্বতন্ত্র নয়। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ থেকে কৃষ্ণনাম অভিন্ন বলে কৃষ্ণনাম থেকেও শিব-ব্রহ্মা আদি নিখিল দেবতা ও নিখিল বস্তুর নাম অভিব্যক্ত। কোনো নামই হরিনাম থেকে একান্ত ভিন্ন বা স্বয়ংসিদ্ধ নয়। এজন্য দেবোপাসকগণ যদি স্বতন্ত্র জ্ঞানে শিব-ব্রহ্মা আদি দেবতার নাম গ্রহণ করে, তাও অবিধিপূর্বক অর্থাৎ অপরাধজনক হয়ে থাকে।

এর তাৎপর্য হলো, দেবোপাসকগণ যদি মনে করে– নামাপরাধ সম্বন্ধে জানার বা সাবধান থাকার আমাদের কী প্রয়োজন? যেহেতু আমরা শিব, কালী, দুর্গা, সূর্য কিংবা গণেশের উপাসক। তাঁদের নামই আমাদের শ্রেয় বিধান করবে। তাই আমাদের সাথে হরিনামের কোনো সম্পর্ক না থাকায় আমাদের নামাপরাধেরও কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না।

এসব ব্যক্তিও যে নামাপরাধী তা উত্তম ও স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই দশবিধ নামাপরাধের অন্তত একস্থানে শিব শব্দটি উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণ বা হরি থেকে স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে অন্য দেবতার উপাসনা যেমন অবিধি, তেমনি সর্বমূল হরিনাম থেকে শিবাদি নিখিল দেবতার নামকে স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে তা গ্রহণের ফলে সেসব নামের প্রতি অপরাধ হয় বলে জানা আবশ্যক। বৃক্ষের মূল শুষ্ক হলে যেমন বৃক্ষের শাখা-পত্রাদি সমস্তই শুষ্ক হয়ে যায়, তেমনি শব্দব্রহ্মরূপ সকল শব্দ বা নামের মূল কৃষ্ণনাম বা হরিনাম অপ্রসন্ন হলে শিবাদি দেবতাগণের নামও অপ্রসন্ন হয় এবং তার ফলে সেসব নামের প্রতিও অপরাধ হয়।

স্বতন্ত্রবুদ্ধির কারণে সমতাবোধ হয় বলে শ্রীহরি থেকে অন্য দেবতাকে পৃথক ও সমান মনে করা যেমন অপরাধ, তেমনি হরিনাম থেকে অপর কোনো দেবতার নাম পৃথক বা সমান বুদ্ধিতে গ্রহণ করলেও হরিনামাপরাধ সংঘটিত হওয়ায় সেসব নামের প্রতিও অপরাধ হয়; যথা : শিবনামাপরাধ, দুর্গানামাপরাধ, কালীনামাপরাধ ইত্যাদি।

প্রতি

শ্রীহরিন

নাম পে ... হরিনাম
প্রদান ক ... বং পরে
জানতে
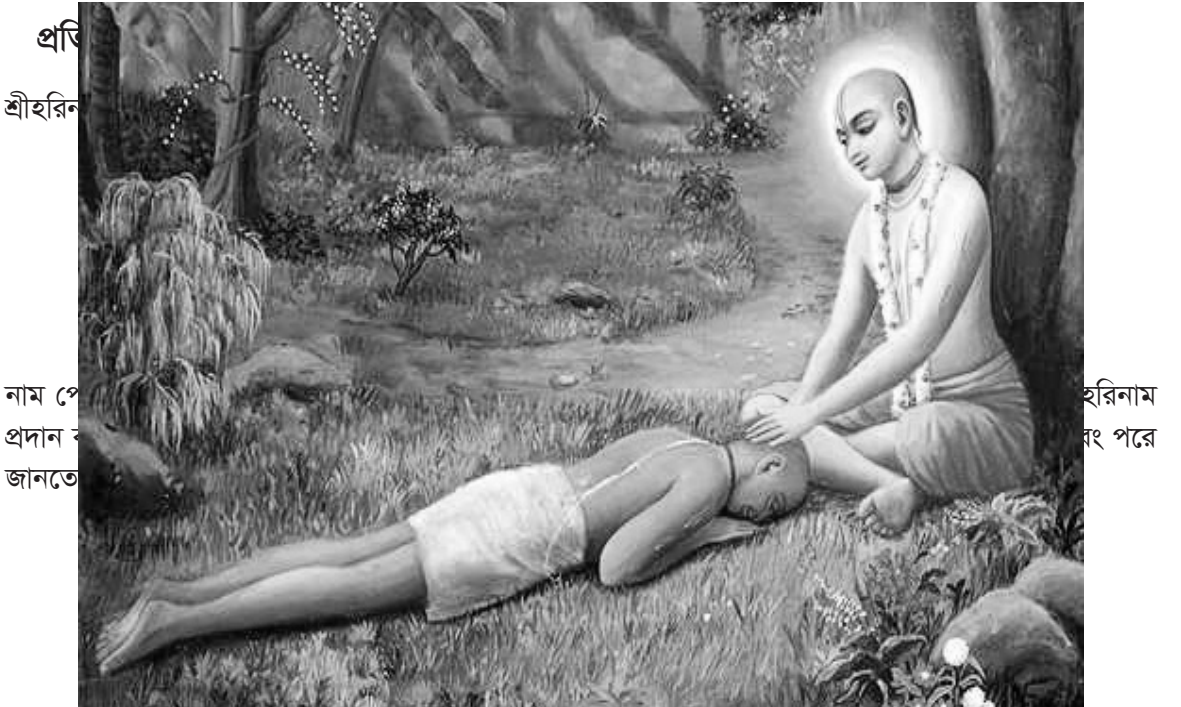
দশম নামাপরাধ

শ্রুতেহপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোহধমঃ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোহপ্যপরাধকৃৎ ॥

অর্থ : হরিনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেও যে ব্যক্তি মনে করে– এ দেহই আমি এবং দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত সবকিছুই আমার– এমন জড় আসক্ত এবং নামের প্রতি প্রীতিরহিত নরাধম নামের চরণে অপরাধী। অর্থাৎ ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং তাঁর অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরও বিষয়াসক্তি বজায় রাখা এবং নামের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন বা নামোচ্চারণে আনন্দ অনুভব না করা।

ব্যাখ্যা

দীক্ষিত হয়েও অধিকাংশ বিষয়ী লোক জড়দেহে অহংতা ও মমতাবুদ্ধি করে ভক্তিপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়। আমি কর্তা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি বৈষ্ণব, আমি রাজা, আমার দেহগেহ, আমার পুত্রপৌত্র, ধনজন– এমন অযথা অভিমানের কারণে নামভজনে প্রবৃত্তি হয় না। এ এক বিষম অপরাধ। গীতার ১৬/১৬ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ ধরনের মানসিকতা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন–

ঈশ্বরোহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী।
আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া ॥

অর্থ : আমিই ইশ্বর, আমি ভোক্তা। আমিই বলবান ও সুখী। আমি সবচেয়ে ধনবান এবং অভিজাত আত্মীয়স্বজন

পরিবৃত। আমার মতো আর কেউ নেই। আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আনন্দ করব।

শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীনামের মহিমা বা শক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করতে না পারায় নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মানুষের চিত্তে আপাতদৃষ্টিতে যে সংশয় উৎপন্ন হয়, তাও শ্রীনামের অচিন্ত্য ও অমোঘ শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার মতো তেমন অনর্থকর হয় না; কিন্তু দুর্দৈববশত সে অমূলক সংশয় থেকেই বিষফল উৎপন্ন হয়; এ কারণে হরিনামের সীমাহীন মুক্ত মহিমার কথা শ্রবণ করেও তা অতিস্তুতি বোধ হওয়ায় সংশয়াপন্ন ব্যক্তির চিত্তে উল্লাসের পরিবর্তে অপ্রীতির উদ্রেক হয়। শ্রোতা বা নামোচ্চারণকারী ব্যক্তির এরূপ অপ্রীতি স্বাভাবিকভাবেই নামের অপ্রীতিও সাধন করে। এজন্যই সাধারণের পক্ষে তা এক ভীষণ অনর্থকর নামাপরাধ।

দৃষ্টান্ত

লঙ্কা বিজয়ের পর কয়েকজন রাক্ষসসহ বিভীষণও রাম-লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সাথে অযোধ্যায় এসেছিলেন। তারপর লঙ্কায় ফিরে যাওয়ার সময় এক রাক্ষস বিভীষণকে জিজ্ঞেস করল, "লঙ্কাবিজয়ের পর তো সেই বিখ্যাত সেতুটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এখন আমরা লঙ্কা পার হবো কীভাবে?" তখন বিভীষণ একটি বটের পাতায় 'রাম' নাম লিখে কাপড়ে বেঁধে তাকে দিয়ে বললেন, "এই পুঁটলিটি শক্ত করে ধরে সাগরে নেমে পড়ো; দেখবে সাগর পার হয়ে তুমি লঙ্কায় পৌঁছে গেছো।" বিশ্বাস করে রাক্ষসটি পুঁটলি হাতে সাগরে নেম পড়ল; দেখল সাগরে হাঁটুজল মাত্র। তাই সে অনায়াসে হেঁটেই সাগর পার হতে লাগল। কিন্তু সাগরের মাঝ বরাবর গিয়ে সে তার কৌতূহল সামলাতে পারল না, পুঁটলি খুলে দেখেই ফেলল পুঁটলিতে যা ছিল। তারপর হাসতে হাসতে ভাবতে লাগল, "এ কী! এ তো গাছের পাতায় লেখা একটি নাম মাত্র। এর আবার কী শক্তি থাকতে পারে?" ব্যস, যখনই রাম নামের প্রতি তার অবজ্ঞা আর সংশয় উৎপন্ন হলো, তৎক্ষণাৎ সে সাগরের অথৈ জলে ডুবে গেল।

নবম নামাপরাধে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ প্রদানে উপদেষ্টার অপরাধের কথা বলার পর এখানে হরিকথা শ্রবণের প্রতি অনাসক্ত বা অপ্রীত ব্যক্তির অধিকতর অপরাধের কথা নির্দেশ করে নামাপরাধের প্রসঙ্গ শেষ করা হয়েছে। দশম নামাপরাধের স্বরূপ লক্ষণ বলার পর নামাপরাধের ফল এখানে সূত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে; যথা : "*অহংমমাদি পরমঃ*" – অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার' বোধের প্রাবল্য। পূর্বোক্ত দশবিধ নামাপরাধেরও মুখ্য ফল এটি। অনাদি হরিবিমুখতার ফলে মায়াগ্রস্ত জীবকে জন্ম-মৃত্যু-ভয়-শোক ও ক্লেশময় অনিত্য সংসারে মায়ার পাঁচটি গ্রন্থির দ্বারা আবদ্ধ হতে হয়েছে। ব্রহ্মাসৃষ্ট পাঁচটি তামস স্মৃতিই এই পাঁচ গ্রন্থি; যথা :

(১) অবিদ্যা : মিথ্যা জ্ঞান বা অজ্ঞান, অনিত্য বস্তুতে নিত্য, অশুচিতে শুচি, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মায় আত্মজ্ঞান করা।

(২) অস্মিতা : মিথ্যা অহঙ্কার, আমি ও আমার অভিমান এবং প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেই সত্য বলে মনে করা।

(৩) রাগ : অনুরাগ, জড় সুখ লাভ ও দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা অথবা কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের পর তা আরও বেশি লাভ করার বাসনা।

(৪) দ্বেষ : ঘৃণা, দুঃখ বা দুঃখের কারণের প্রতি বিরক্তি এবং

(৫) অভিনিবেশ : দৈহিক সুখের প্রতি প্রবল আসক্তি; কিন্তু মৃত্যু তা থেকে বঞ্চিত করে বলে মৃত্যুকে প্রচণ্ড ভয় পাওয়া।

ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কারণে এ অবিদ্যা, অস্মিতা বা অহম ও মমতা পরস্পর কার্যকারণরূপে জীবের সংসার বন্ধনের কারণ হয়। গুণের সাথে সম্বন্ধই জীবের দেহবন্ধনের কারণ এবং দেহাত্মবুদ্ধিই গুণসম্বন্ধের কারণ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।

নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ (১৪/৫)

অর্থ : হে মহাবাহো, জড়া প্রকৃতি থেকে জাত সত্ত্ব, রজ ও তম নামক তিন গুণ এ দেহের মধ্যে অবস্থিত অব্যয় জীবকে আবদ্ধ করে রাখে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন– "আমরা যেভাবে বিশ্বদর্শন করছি সেটাই অসুবিধার কথা। আমরা বিশ্বের ওপর প্রভুত্ব করব– এ ভাব নিয়ে বিশ্বদর্শনই আমাদের বন্ধনের কারণ। বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করুক, এ বিচার থেকেই সংসারের উৎপত্তি।" সুতরাং ত্রিগুণের বন্ধন ছিন্ন করাই দেহজাত সংসারবন্ধন মোচনের উপায়। আবার শাস্ত্রের অনেক স্থানে অস্মিতাকেও সংসার বন্ধনের কারণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে, দেহে-গেহে অহংমমবুদ্ধি অতিক্রম করতে পারলেই বিমুক্তি বা বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি ঘটে। যথা :

ত এতদধিগচ্ছন্তি বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।
অহং মমেতি দৌর্জ্জন্যং ন যেষাং দেহগেহজম্ ॥ (ভা. ১২/৬/৩৩)

অর্থ : তাঁরাই শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হতে পারেন, যাঁদের চিত্ত থেকে নিজ দেহে 'আমি' এবং দেহসম্পর্কিত গৃহ-বিত্ত ইত্যাদি অনাত্ম বিষয়ে 'আমার' বুদ্ধিরূপ দুর্জনতা দূরীভূত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, রাতের অন্ধকার সূর্যালোকের কাছে সম্পূর্ণ পরাভূত হলেও তা যেমন জোনাকির আলোককে পরাভূত করে, তেমনি মায়াও লজ্জিতা হয়ে ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করলেও স্বরূপবিস্মৃত ক্ষুদ্র জীবকে অভিভূত করে তার জড় দেহকেই আমি এবং দেহ সম্পর্কিত জড় বিষয়কে আমার বোধ করিয়ে থাকে।

যাই হোক, মায়ার এ পাঁচটি গ্রন্থি ছেদন না করা পর্যন্ত মায়ামুক্তির কোনো উপায় নেই এবং প্রকৃত কোনো মঙ্গলও নেই। তা লাভের জন্য শাস্ত্রে তিনটি মার্গের কথা বলা হয়েছে, যথা :

(১) ভুক্তির মার্গ : ভুক্তি বা কর্মমার্গে কোনো উপায় বিহিত হয়নি। কেবল অশুভ কর্ম ত্যাগ এবং শুভ কর্মের আচরণ দ্বারা পাপক্ষয় ও পুণ্যবৃদ্ধির ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, যাতে সংসারিক সুখ ব্যতীত দুঃখ না পেতে হয়। কিন্তু সাংসারিক শুভকর্মজাত সুখও যে দুঃখময়, তার তিনটি প্রধান কারণ হলো :

প্রথমত, শুভকর্মজাত সুখভোগের জন্য জীবকে মৃত্যুযন্ত্রণা তো বটেই, বার বার জন্মরূপ জঠর-যন্ত্রণাসহ জরা ও ব্যাধির যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত সুখমাত্রই অনিত্য ও ক্ষয়শীল; সুতরাং পুণ্যক্ষয় হলে পুনরায় কর্মানুসারে সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে থাকে। তাই এ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করতেই হয়। স্বর্গসুখও ক্ষয়শীল হওয়ায় পুনরায় মর্তে এসে কর্ম করতে হয়। অতএব যে সুখ প্রতিক্ষণেই ক্ষয়শীল এবং দুঃখের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ তাকে দুঃখ ভিন্ন সুখ নামে অভিহিত করা যায় না।

তৃতীয়ত, আলোকের পর হঠাৎ অন্ধকার এলে যেমন তা পূর্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হয়, তেমনি কেবল দুঃখ ভোগের চেয়ে ক্ষণভঙ্গুর সুখের পর পুনরায় দুঃখ ভোগ অধিক অনুভূত হয়, যা সহ্য করা ব্যক্তির পক্ষে আরো কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ অনিত্য সুখ দুঃখের যন্ত্রণাকে বাড়ানোর ইন্ধন হিসেবেই কাজ করে। তাছাড়া সংসারের সকল সুখকর বিষয়ই যে ভয়-ভাবনা ইত্যাদি দুঃখসঙ্কুল, মহাকবি ভর্তৃহরি নিচের শ্লোকে তা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন–

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং,
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ং।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং,
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ ॥

অর্থ : ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়, ধনে রাজভয়, মানে দৈন্যভয়, বলে রিপুভয়, রূপে জরাভয়, শাস্ত্রে বাদিভয়,

গুণে খলভয়, দেহে মৃত্যুভয়– এ জগতের সকল সুখবস্তুই ভয়ান্বিত; তাই মানুষের পক্ষে বৈরাগ্যই কেবল অভয় সম্পদ।

এ জগতের যেকোনো বিষয় লাভের ক্ষেত্রে আরেকটি বাস্তবতা হলো : মানুষ যাকে যত বেশি মূল্যবান মনে করে, তা অর্জন করা তত বেশি শ্রম ও কষ্টসাপেক্ষ; তা রক্ষা করা আরও বেশি কঠিন ও কষ্টকর এবং পরিণামে তা তত বেশি দুঃখ বয়ে আনে। সাংসারিক সুখের বিচার করলে একে তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়; যথা : (১) দুঃখের প্রতিকারকেই সাংসারিক লোক সুখ মনে করে, (২) অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বিষয়ের সংরক্ষণ বাসনা অর্থাৎ আশাই সুখ প্রতিভাত এবং (৩) রজোগুণী কর্মতৎপর ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যা দুঃখ তাকেই সুখ বলে মনে করে। কিন্তু তাতে সুখ কোথায়? সুখের মোহ ও হাতছানি মাত্র। এ জগতে আবদ্ধ জীবের অবস্থা যে কেবলই দুঃখময়, তা পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন–

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। / অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। / দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

(চৈ. চ. মধ্য ২০/১১৭-১১৮)

তাৎপর্য : কৃষ্ণবিস্মৃতির কারণে অনাদি বহির্মুখ জীবকে মায়া সংসারবন্ধনরূপ দুঃখ দিয়ে থাকে। সংসারবদ্ধ অবস্থায় জীবের শুভাশুভ কর্মফলের জন্য কখনো স্বর্গসুখ ভোগের জন্য উপরে স্বর্গলোকে উঠতে হয়, কখনো নরকযন্ত্রণা ভোগের জন্য নিচে নরকে নামতে হয়। এ ওঠা-নামা রাজদণ্ড ভোগকারীকে নদীতে ডুবিয়ে মারার ন্যায় দারুণ দুঃখ-জনক। এমন আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যেমন : এক লোক একটি ভারী ব্যাগ বহন করছে। ব্যাগটি এতোই ভারী যে ব্যাগটি বহন করা তার অনেক কষ্ট হচ্ছে। এজন্য সে তা কখনো এক হাতে, কখনো অন্য হাতে, কখনো ঘাড়ে এবং কখনো মাথায় বহন করছে। এক হাত থেকে যখন অন্য হাতে নিচ্ছে, তখন শুরুতে একটি কম কষ্ট হচ্ছে; কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার আগের মতোই কষ্ট বোধ হচ্ছে। তখন বাধ্য হয়ে ঘাড়ে নিচ্ছে, কিছুক্ষণ পর আবার ঘাড় থেকে তা মাথায় নিচ্ছে। এভাবে একই বোঝা সে অনেক কষ্ট করে বিভিন্নভাবে বহন করছে। হাত বদলানোকে সে বোকার মতো সুখ মনে করছে, কিন্তু আদৌ কি তা সুখ?

সুতরাং সংসারবন্ধনই প্রধান দুঃখ, আর সুখ-দুঃখ এর আনুষঙ্গিক ফল এবং সংসারমুক্তিই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। তথাকথিত সংসার সুখ প্রকৃত সুখ নয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৫/২) বলা হয়েছে– "*সুখায় কর্মাণি করোতি লোকো ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা... ॥*" অর্থাৎ (বিদুর বললেন) **হে মহর্ষি, এ জগতের সকলেই জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু তার ফলে তাদের জড়সুখও লাভ হয় না, দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না; পক্ষান্তরে তাদের অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই লাভ হয়।** এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়ের কথাও তাতে (৩/৫/১৩) বলা হয়েছে, **"যিনি নিরন্তর কৃষ্ণকথা (কৃষ্ণনাম) শ্রবণ করতে উৎসুক, তিনি ক্রমশ অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার ফলে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন এবং অচিরেই তাঁর সব রকম দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়।"**

শ্রীল প্রভুপাদ জড় জগতের সুখ-দুঃখের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন–

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব 'মনোধর্ম'।
'এই ভালো, এই মন্দ'– এই সব 'ভ্রম' ॥ (অন্ত ৪/১৭৬)

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর তাৎপর্যে লিখেছেন– "দ্বৈতভাব সমন্বিত এ জড় জগতে সুখ ও দুঃখের যে পার্থক্য তা কেবল মনের ভ্রম, কারণ তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ প্রকৃতপক্ষে একই। ঠিক স্বপ্নে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখের মতো। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ যে সুখ এবং দুঃখ সৃষ্টি করে, প্রকৃতপক্ষে তার কোনো অস্তিত্বই নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতের (১০/৩/৩৬) নং শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদ মানবজীবনের উদ্দেশ্যের কথাও তুলে ধরেছেন :

শুকর অথবা কুকুর হওয়া মানবজীবনের উদ্দেশ্য নয়, মানবজীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে *তপোদিব্যম্– দিব্য-তপস্যা*। সকলকেই এ তপস্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদিও পৃশ্নি ও সুতপার মতো তপস্যা করা সম্ভব নয়, তবুও শাস্ত্রে অনায়াসে তপস্যা করার একটি সুযোগ বর্ণনা করা হয়েছে; তা হলো সংকীর্তন আন্দোলন। শ্রীকৃষ্ণের মতো সন্তান লাভ করার জন্য তপস্যা করার প্রত্যাশা না করা যেতে পারে, তবুও কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে (কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য) এতই পবিত্র হওয়া যায় যে, তার মাধ্যমে এ জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে (*মুক্তসঙ্গঃ*) ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় (*পরং ব্রজেৎ*)। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে সুখী হওয়ার কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন না করে শাস্ত্রবর্ণিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে সুখী হওয়ার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দিচ্ছে, যাতে মানুষের জড়-জাগতিক জীবন সর্বতোভাবে সার্থক হতে পারে।

(২) মুক্তির মার্গ : ভুক্তির মার্গ বর্জন করে তাই মুক্তির উপায়ের কথা বলা হয়েছে– জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য জ্ঞানে নিজেকে ব্রহ্ম থেকে অভিন্নরূপে চিন্তা করা। কিন্তু তা সাধন করে জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখ আদি ক্লেশ বিনাশের সাথে সাথে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি লাভের ফলে নিজের আত্মারও স্বাতন্ত্র্যবোধ আর থাকে না। বিশেষ করে এ মার্গ সাধন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যথা :

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ (গীতা ১২/৫)

অর্থ : যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁদের অধিক ক্লেশ ভোগ হয়, কারণ নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ দেহীর পক্ষে নিতান্তই দুঃখপ্রদ।

(৩) ভক্তির মার্গ : জীবের পক্ষে দুরতিক্রম্য মায়াপাশ থেকে বিমুক্ত হয়ে শুদ্ধস্বরূপ লাভের একমাত্র উপায় ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন– ('*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।*'– *গী.* ৭/১৪) সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রীতির কায়িক, বাচিক ও মানসিক অনুকূল চেষ্টাকেই শুদ্ধাভক্তির মার্গ বলে। (*আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"– ভ. র. সি.*) আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে– "*ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল। সর্বফল দেয় ভক্তি– স্বতন্ত্র প্রবল ॥*" (২/২৪/৬৫) ভক্তির মার্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জগতে বৈধিভক্তিই জীবের লভ্য ছিল। তা কেবল দুর্লভ মহৎসঙ্গ সাপেক্ষ হওয়ায় অত্যন্ত দুর্লভ ছিল। এমনকি কোটি মুক্তের মধ্যে একজনেরও সেই ভক্তি লাভ করা দুরূহ হতো। এতে সর্বসাধারণের আশার কথা না থাকায়, সংসারমুক্তি সুদুর্লভই ছিল।

অথচ উক্ত অহংমমাদিবোধ তিরোহিত করে জীবের **সংসারমুক্তি কেবল শ্রীনামের গৌণ ফল তথা নামাভাসেই** হয়ে থাকে। আর মুখ্যফলে **শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেমভক্তি–** রাগানুগা ভক্তির উদয় হয়। যথা :

কেহো বোলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়। / কেহো বোলে নাম হৈতে জীবের মুক্তি হয় ॥
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নয়। / নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥
অতি তুচ্ছ ফল নামের মুক্তি পাপনাশ। / ইহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্যের প্রকাশ ॥

(চৈ. চ. ৩/৩/১৬৯-১৭১)

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনোকিছুর ওপর যখন সহজ প্রলেপ দেওয়া হয়, তা জলে ধুলে বা মাজলে উঠে যায়, কিন্তু ধাতুপাত্রে যে প্রলেপ বা বজ্রলেপ দেওয়া হয়, তা তুলে ফেলার সহজ কোনো উপায় থাকে না। ঠিক তেমনি অবিদ্যা আদি গ্রন্থির দ্বারা যে অহংবোধের প্রলেপ তৈরি হয়, তা একমাত্র অনন্যগতি শ্রীনামের আশ্রয় ছাড়া তুলে ফেলার দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই।

আবার চিদানন্দ বস্তুর সঙ্গে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের কোনো সংযোগ না ঘটলে জীবের মায়াপাশ বিমুক্তির কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আর আপন মহিমাকে লঘু করে বদ্ধজীবের নিকট প্রাকৃতবৎ প্রতিভাত হয়েও যে চিদানন্দবস্তুসমূহ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহে স্বয়ং স্ফুরিত হয়ে আপন প্রভাবে ধীরে ধীরে তাদের অনর্থ নাশ করে শুদ্ধভাব প্রদানপূর্বক নিজ স্বরূপের যথার্থতা উপলব্ধি করিয়ে থাকে, তার মধ্যে কৃষ্ণনামই সর্বাধিক কৃপালু ও সহজলভ্য এবং অপর চিদানন্দবস্তু ভক্তিরও উদ্‌গাতা। সুতরাং শ্রীনাম বিনা আর কী গতি থাকতে পারে আমাদের?

এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি :

যেকোনো বুদ্ধিমান মানুষের পরম কর্তব্য হলো অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির এই পন্থাটির প্রতি সর্বদাই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা। নারায়ণীয়তে এর যথার্থতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে– "*যা বৈ সাধন-সম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। / তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥*" এর তাৎপর্য হলো, সকাম কর্মের বিভিন্ন পন্থায় ব্রতী না হয়ে অথবা মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের অনুশীলন না করে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করলেই সব রকমের ধর্মাচরণ– দান, ধ্যান, যজ্ঞ, তপশ্চর্যা, যোগ আদির সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেটিই ভক্তিযোগের বিশেষত্ব। আর কেবল শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম– ***হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে–*** কীর্তন করার ফলে ভগবদ্ভক্ত অনায়াসে পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন, যা অন্য কোনো ধর্ম আচরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। (গীতা ১২/৬-৭)

শ্রীমদ্ভাগবতের (৪/২৪/১৪) তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ নাম-মাহাত্ম্য বিষয়ে আরও কিছু কথা বলেছেন :

কেউ যদি, জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য তপশ্চর্যা করে, তবে অবশ্যই তাকে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হতে হবে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্তর প্রাপ্ত হতে না পারে, তবে তার সমস্ত তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন অর্থহীন, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত সর্বোচ্চ ফল লাভ করা যায় না। ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। "*ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাং সর্ব-লোক-মহেশ্বরম্*"। তাই তপস্যার বাঞ্ছিত ফল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কেউ যদি মানবসমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট **চণ্ডালকুলেও** জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু ভগবানের নাম গ্রহণ করে, তবে তাকেই ধন্য বলতে হবে, কারণ বুঝতে হবে যে, যাঁর জিহ্বাগ্রে ভগবানের নাম বিরাজ করে, তিনি তাঁর পূর্বজন্মে সব রকম তপস্যা অনুষ্ঠান করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় যিনি মহামন্ত্র (***হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে***) কীর্তন করেন, তিনি সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভ করবেন, যা পূর্বে মানুষ সমুদ্রে প্রবেশ করে দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করেও প্রাপ্ত হতে পারতো না। যদি কেউ কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদস্বরূপ এ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সুযোগ গ্রহণ না করে, তবে বুঝতে হবে যে, সে ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা প্রবলভাবে মোহাচ্ছন্ন।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ তাঁর ভক্তিসন্দর্ভে নামাপরাধ সম্পর্কিত আলোচনার শেষে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করে অহংমমাদির পারম্য প্রদর্শন করেছেন–

ক) *নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,*
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্ ॥
খ) *তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতালোভ-পাষণ্ড-মধ্যে,*
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥

অর্থ : ক) শ্রীভগবানের একটি নাম যদি প্রসঙ্গক্রমে মাঝখানে উচ্চারিত কিংবা কিঞ্চিৎমাত্র মনঃস্পৃষ্ট বা শ্রুত হয়;

এমনকি সে নাম যদি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণও হয়, কিংবা ব্যবহিত-রহিত হয়েও গৃহীত হয়, তবুও নাম সেই ব্যক্তিকে সমস্ত সংসারবন্ধন থেকে সত্যিই পরিত্রাণ করে থাকেন। (ব্যবহিত– ব্যবধান রেখে উচ্চারণ এবং রহিত– কিছু অংশ উচ্চারিত হয়েছে, পরের কিছু অংশ হয়নি)

খ) কিন্তু সেই শ্রীনাম যদি দেহ, অর্থ, জনগণ, লোভ এবং পাষণ্ডের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে শ্রীনাম (অপ্রসন্নতাবশত) সত্বর ফল প্রদান করেন না অর্থাৎ মুখ্যফল প্রেম সত্বর প্রকাশিত হয় না।

এ স্থলে পাষণ্ড শব্দের দ্বারা দশবিধ নামাপরাধকেই বোঝানো হয়েছে। শ্লোকের প্রথম দুই চরণে নামের স্বাভাবিক মহিমা এবং পরের দুটিতে নামাপরাধের ফল নির্দেশ করা হয়েছে। নামাপরাধের ফলে অহংবোধের প্রাবল্য ঘটার কারণে অর্থ-বিত্তের প্রতি আসক্তি আরও প্রবল হয়, এমন আসক্তদের পাষণ্ড বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর একান্তভাবে হরিনামের আশ্রয় ছাড়া নামাপরাধজনিত প্রবল আসক্তি থেকে উদ্ধারের অন্য কোনো উপায় নেই। তা মজবুত শিকলের বন্ধনের মতো; দড়ির বন্ধন সাধারণ অস্ত্রেই কেটে ফেলা যায়, কিন্তু লোহার শিকলের বন্ধন বিশেষ অস্ত্রের দ্বারা বার বার আঘাত করেই কাটতে হয়।

নামাপরাধ এবং সংসারবন্ধন

নামভজন শুরু করার পূর্বে অপ্রাকৃত বিষয় সম্বন্ধে অবিদ্যাকৃত যে স্বাভাবিক অবজ্ঞা বা প্রাকৃতবোধ জীবের অন্তরে নিহিত থাকে, নামভজন শুরুর সাথে সাথে তা ক্ষয় হয়ে অপ্রাকৃত বুদ্ধি ও অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। **কিন্তু নামাপরাধ ঘটলে যদি তার প্রতিকারের ব্যাপারে উপেক্ষা করা হয়, তবে তার বিষময় ফলস্বরূপ অপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাস-শ্রদ্ধা আদি আবৃত হয়ে সেস্থলে যে প্রাকৃত বুদ্ধি হতে থাকে, তা-ই নামাপরাধ। নামাপরাধের কারণে অপ্রাকৃত বিষয়, যথা– ভগবান, ভগবদ্বিগ্রহ, ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ভক্ত, ভগবৎপ্রসাদ-নির্মাল্য ইত্যাদিসহ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও ভজনের বিষয়ে জীবের অন্তরে ক্রমশ যে পরিমাণে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা পুঞ্জীভূত হতে থাকে, সেই পরিমাণে লৌকিক বিষয়ে উৎসাহ ও অনুরাগ বাড়তে থাকে। পরিশেষে অপরাধের প্রাবল্যে বৈষয়িক ব্যাপারে অতিরিক্ত আসক্তির ফলে ভজন-সাধন সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে সেস্থলে দেহ-গৃহাদিতেই প্রগাঢ় অভিনিবেশ জন্মে থাকে। এটিই নামাপরাধজনিত অচ্ছেদ্য ও অস্বাভাবিক সংসারবন্ধন।**

নামাপরাধের অনিবার্য ফলের কারণে একদিকে যেমন দেহ-গৃহাদি অনাত্মবস্তুতে অতিরিক্ত আসক্তি বা অস্বাভাবিক অভিনিবেশ জেগে ওঠে, অন্যদিকে তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ভক্তি, ভগবান ও ভক্তসহ বিভিন্ন অপ্রাকৃত বিষয়ে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মায় এবং তার ফলে ভজন বিষয়ে শিথিলতাও উৎপন্ন হয়। এ অবস্থা অধিক হলে সাধকের চিত্তে কুটিলতা দেখা দেয় এবং নিজেকে যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ ও ভজনবিজ্ঞ অভিমান করে। যার প্রভাবে সরলচিত্তে দৈন্য, ঐকান্তিকতা ও আদরের সাথে নামাশ্রয় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। নামাপরাধমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরাধীকে এভাবে এক কঠিনতম অস্বাভাবিক সংসারবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়। নামাপরাধজাত চিত্তের অসরলতা ও অভিমানজাত অবাঞ্ছিত বুদ্ধি থেকে বার বার অপরাধ হতে থাকে বলেই এমন বুদ্ধিকে পরমার্থ সাধনের পথে পরম বিঘ্ন বলে জানতে হবে। তাছাড়া ভগবদ্ভক্তগণ সরল জীবদের অনুগ্রহ করলেও কুটিল বিজ্ঞগণকে তেমন অনুগ্রহ করেন না।

অপরাধের সুদূরপ্রসারী ফল

দেখা যায়, কেউ কেউ ভজনে প্রচুর আনন্দ পান এবং ভজনের প্রতি আগ্রহও অনেক। আবার কেউ কেউ মোটেই আনন্দ পান না, সাধন-ভজনে তাদের আগ্রহও নেই। নিম-নিসিন্দা পানের মতোই প্রীতিহীনভাবে তারা গুরুআজ্ঞা পালন করে যায় এবং কোনো ফল পায় না বলে কেউ কেউ আবার সাধন-ভজন পরিত্যাগও করে। এ প্রসঙ্গে বাস্তব

দৃষ্টান্ত হলো : বরফের উপর প্রখর সূর্যালোক পড়লেও তা উত্তপ্ত হয় না; অথচ সেই একই আলোক ধাতবপাত্রকে ঠিকই উত্তপ্ত করে। তার মানে সূর্যালোকের উত্তপ্ত করার শক্তি অবশ্যই আছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো, ধাতবপাত্রের তা গ্রহণের সামর্থ্য আছে, বরফের নেই। তদ্রূপ নামভজনের শক্তি অপরিসীম হলেও যারা তা গ্রহণ করতে পারে না, তারা কোনো আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না, উৎসাহও থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাদের চিত্তের এমন প্রতিকূল অবস্থা কেন?

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁর ভক্তিসন্দর্ভে বিষ্ণুধর্মোত্তরের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে যাদের চিত্ত বিষয়াসক্তির দ্বারা দূষিত, যারা মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাচার ছাড়তে পারে না, তাদের চিত্তের অবস্থা নামভজনের অনুকূল নয়। "*রাগাদিদূষিতং চিত্তং নাস্পদং মধুসূদনে... ॥ (ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৩)*– কাদাযুক্ত জল যেমন হংসের প্রীতি আকর্ষণ করতে পারে না, তেমনি ইন্দ্রিয়বিষয়ের প্রতি আসক্ত চিত্তও ভগবান মধুসূদনে স্থিতি লাভ করতে পারে না। এর তাৎপর্য হলো, ভগবানের প্রতি চিত্ত স্থির রাখার একমাত্র কারণ হলো ভগবানের করুণা বা প্রীতি। বিষয়মলিন চিত্ত ভগবানের করুণা বা প্রীতিকে আকর্ষণ করতে পারে না। এজন্য সে চিত্ত ভগবানে স্থিতি লাভ করতে পারে না। মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের কিরণ যেমন অন্ধকার দূর করতে পারে না, তেমনি মিথ্যাদির দ্বারা দূষিত বাগিন্দ্রিয়ও ভগবান কেশবের স্তব করার যোগ্য নয়, ভগবানের করুণারশ্মি বিষয়াসক্তিরূপ মেঘের কারণে বাগিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করতে পারে না। চিত্তের মলিনতা দূর করার জন্যই ভজনাঙ্গ অনুশীলন করতে হয়, চিত্তের মলিনতা দূর হলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, ভগবানের, হরিনামের স্ফুর্তি হয় এবং প্রেমসেবাকামীদের চিত্তে প্রেমেরও আবির্ভাব হয়। তাই অনুশীলন বাধ্যতামূলক। কিন্তু বার বার অনুশীলনেও যখন সুখ লাভ হয় না, তখন বুঝতে হবে তাতে অন্তরায় আছে। সেই সুদূরপ্রসারী অন্তরায়ই হলো অপরাধ। অন্তরায়রূপ অপরাধ যতদিন থাকবে, ততদিন চিত্ত অশুদ্ধ থাকবে। অশুদ্ধচিত্তে ভগবৎস্ফুর্তিও হয় না, আনন্দও লাভ হয় না। এ অপরাধ নানারূপে আত্মপ্রকাশ করে; যথা : কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, ভজনাভিমান, বিষয়াভিনিবেশ, ভক্তিশৈথিল্য ইত্যাদি। নিচে দৃষ্টান্ত সহকারে তা আলোচনা করা হলো :

কুটিলতা

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দূতরূপে হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের কাছে যাচ্ছিলেন, তখন কুটিলমতি দুর্যোধন তাঁকে বশীভূত করে নিজের পক্ষে নেয়ার জন্য প্রতি গৃহে উপাদেয় উপাচারসহ 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও স্তব করিয়েছিল। কিন্তু এর সবই ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেসব আয়োজনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবান হলেন ভাবগ্রাহী, সকলের অন্তর্দ্রষ্টা। উপাদেয় উপাচারে আবৃত স্বার্থবুদ্ধি কি তিনি জানতে পারেন না? সুতরাং তাতে প্রীত হবেন কেন? শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ এ সম্বন্ধে আরও লিখেছেন– আধুনিক লোকদের মধ্যেও যাদের চিত্তে অপরাধ আছে, শাস্ত্র অনুযায়ী বাহ্যিকভাবে ভগবান, গুরুদেব ও ভক্তের অর্চনা করলেও অন্তরে অপরাধ থাকে বলে তাদের অর্চনাও কুটিলতায় পর্যবসিত হয়। এজন্য শাস্ত্র বলে, অকুটিলচিত্ত লোক যদি শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খও হয়, তারা ভজন তো দূরের কথা তার আভাসের দ্বারাও কৃতার্থ হতে পারে। কিন্তু কূটিল ব্যক্তিদের ভক্তির অনুবৃত্তিও হয় না। তাই পরাশর মুনি বলেছেন– "*ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্। ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্তনং স্মরণং তথা ॥*" (স্কন্দ)– অপুণ্যবান কুটিলচিত্ত মূর্খগণের শ্রীগোবিন্দে ভক্তি হয় না; তাদের কীর্তন ও স্মরণও হয় না।

অশ্রদ্ধা

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করার পরও কৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে দুর্যোধনের যে অবিশ্বাস, তাই অশ্রদ্ধা। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীকে বলেছেন– "যে ভগবৎনামের ভয়ে স্বয়ং ভয় পর্যন্ত ভীত হয়, ঘোরতর সংসারদশাপ্রাপ্ত লোক বিবশ হয়েও সে নাম কীর্তনের ফলে তৎক্ষণাৎ সংসার থেকে বিমুক্ত হয়ে থাকে।" (১/১/১৪) শাস্ত্রের এ কথাও যে অনেকেই বিশ্বাস করে না, তাও অশ্রদ্ধা এবং তা অপরাধের ফল। প্রহ্লাদও বলেছিলেন, "আমার শক্তিতে

আমি বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করিনি, তেমন কোনো শক্তিই আমার নেই; ভগবৎস্মরণের প্রভাবই আমাকে রক্ষা করেছে।" কিন্তু অপরাধজনিত অবিশ্বাসবশত প্রহ্লাদ মহারাজের ভগবৎস্মরণের অদ্ভুত মহিমার প্রতিও অবিশ্বাস হয়। আবার কোনো পরমভাগবতের মধ্যে দৈন্য-দুঃখাদি দর্শন করে, তাঁর পরমভাগবতত্বেও যে অবিশ্বাস হয়, তা পূর্বসঞ্চিত অপরাধের ফল।

এ সম্বন্ধে আরেকটি গল্প আছে– এক গুরুর আশ্রমে প্রতিদিন দুধ দিয়ে যেত এক গোয়ালিনী। কিন্তু সে ঠিক সময়ে আসতে পারত না। আশ্রম-গুরু তাকে ঠিক সময়ে না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জানাল যে, নদী পার হতে গিয়ে সময়মতো নৌকা পাওয়া যায় না বলে ঠিক সময়ে সে আসতে পারে না। তখন গুরুদেব বললেন, "হরিনামের দ্বারা ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়! তুমি এ সামান্য নদীটি তো হরিনাম করতে করতে অনায়াসে পার হতে পার।" কথাটি গোয়ালিনীর খুব ভালো লাগল। তাই সে ঐদিনই হরিনাম নিল। এরপর থেকে সে ঠিক সময়ে দুধ দিয়ে যেতে লাগল। তাই গুরুদেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন কীভাবে সে এখন নদী পার হয়ে ঠিক সময়ে আসতে পারে। গোয়ালিনীর সরল উত্তর– 'হরিনামের মাধ্যমে।' এ কথা শুনে গুরু ভাবলেন, আমি তো বহুদিন ধরে নাম করছি; তাই আমার হরিনামের ক্ষমতা আরো বেশি হওয়ার কথা। গোয়ালিনীর সাথে তাই নিজেও গেলেন হরিনাম করে নদী পার হতে। গিয়ে দেখলেন, গোয়ালিনী হরিনাম করতে করতে অনায়াসে হেঁটে নদী পার হয়ে গেল। তারপর হরিনাম করতে করতে তিনি নিজেও নদীতে নামলেন। কাপড় সামলাতে সামলাতে হাঁটু থেকে কোমরজলে নামলেন; দেখলেন জলে ডুবে যাচ্ছেন, তাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। গোয়ালিনী তখন হাসতে হাসতে বলল– "ও, আপনি হরিও বলবেন, আবার কাপড়ও তুলবেন, তা কী করে হয়?" বহুদিন হরিনাম করলেও হরিনামের প্রতি তথাকথিত সেই গুরুর যথেষ্ট অবিশ্বাস ছিল। এ অবিশ্বাস অপরাধেরই ফল। কিন্তু অপরাধশূন্য হওয়ায় গোয়ালিনী ছিল তাতে দৃঢ় বিশ্বাস। তাই সে অসাধ্য সাধন করল।

ভজনাভিমান

কিছুকাল সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করতে করতে যদি কারো মনে এরূপ অভিমান হয়– "আমার মতো ভজন আর কেউ করে না, আমি উত্তম-অধিকারী ভক্ত" তবে বুঝতে হবে পূর্ব বা বর্তমান কোনো অপরাধের ফলেই এমন মানসিকতার উদয় হয়েছে। এমন অভিমান পোষণ করা অপরাধ। কারণ তার ফলে বৈষ্ণবের অবমাননাসহ অন্যান্য অপরাধও হয়ে থাকে। প্রজাপতি দক্ষ তাঁর পূর্বজন্মে শ্রীশিবের নিন্দা করেছিলেন। পরের জন্মে যখন তিনি প্রজাপতিরূপে প্রজা সৃষ্টির জন্য দু'দুবার দশ হাজার করে পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীনারদ মুনি তাদের সকলকেই ভগবৎভজনে নিযুক্ত করার পর দক্ষকেও ভগবৎভজনে প্রবৃত্ত করার জন্য এলে দক্ষ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে নারদকে ভর্ৎসনার দ্বারা অপমান করেছিলেন। এতে দক্ষের যে অপরাধ হয়েছিল, তাও তাঁর পূর্বকৃত শিবনিন্দাজাত অপরাধেরই ফল। এক অপরাধ থেকে অন্য অপরাধের উদয়– দক্ষের দৃষ্টান্ত থেকেই তা জানা গেল। অপরাধের ফলেই দক্ষের ভজনাভিমান হয়েছিল এবং তার ফলে পুনরায় নারদের অবমাননা করে নতুন অপরাধ সৃষ্টি করলেন।

বিষয়াভিনিবেশ

একমাত্র ভগবান বা ভগবৎভজনেই যদি অভিনিবেশ জন্মে, তবেই সাধক ভজনপথে অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু অন্য বস্তুতে অভিনিবেশ জন্মালেই তা ভজনের প্রতিকূল হয়। তাতে ভগবান ও ভগবৎবিষয়ে নিষ্ঠা ক্ষীণ হতে হতে শেষকালে একেবারে দূরীভূত হয়ে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ ভরত মহারাজের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। (ভা. ৫/৮/২৬)– ভগবৎভজনের জন্য লালায়িত হয়ে মহারাজ ভরত স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবান্ধব এবং ভারতসাম্রাজ্য পর্যন্ত ত্যাগ করে সাধনভজনে নিবিষ্ট হলেও দৈবাৎ একটি হরিণশাবকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মতো ভজনে অভিনিবিষ্ট পরমভাগবতের পক্ষে একটি হরিণশিশুর প্রতি অভিনিবেশ এক অসম্ভব ব্যাপার; তবু হয়েছিলেন।

এর কারণ তাঁর এক বিশেষ প্রারব্ধকর্ম। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলেছেন– "সামান্য প্রারব্ধকর্ম ভগবদ্ভক্তির অন্তরায় হতে পারে না, কেননা প্রারব্ধকর্ম মায়াশক্তির সামান্য কার্য বলে দুর্বল; স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তির ওপর তা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। (ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৭) কিন্তু এ কীরূপ প্রারব্ধ? শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলেছেন, এ প্রারব্ধ হলো প্রাচীন অপরাধবিশেষ। চার ধরনের (নাম, সেবা, ধাম ও বৈষ্ণব) অপরাধের যেকোনোটিই হতে পারে। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নেরও এরূপ অবস্থাই হয়েছিল : মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন ভগবৎ-আরাধনা করছিলেন, তখন তাঁর দর্শনাভিলাষী হয়ে অগস্ত্যমুনি এসেছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর সমাদর করেননি। এ অপরাধের ফলে তিনি পরে হস্তিজন্ম লাভ করেছিলেন। এমন কোনো অপরাধের ফলেই ভরত মহারাজও হরিণশিশুর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে ভগবৎ-আরাধনা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন।

ভক্তিশৈথিল্য

ভক্তিসন্দর্ভের ১৫৯ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলেছেন– সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে যে ব্যক্তি উল্লাসপ্রাপ্ত হয় না, অথচ দেহের সুখ-দুঃখাদিতে বিশেষ আবেশ দেখা যায়, দৈহিক দুঃখে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং দৈহিক সুখে অত্যন্ত উল্লসিত হয়– বুঝতে হবে তার ভক্তিশৈথিল্য জন্মেছে। অপরাধের ফলেই তা হয়ে থাকে। সাধনভজনে যাঁদের শৈথিল্য নেই, যাঁরা ভজননিষ্ঠ, তাঁদেরও অবশ্য দৈহিক সুখ-দুঃখাদি তাপ দেখা যায়। কিন্তু তাতে তাঁরা অভিনিবিষ্ট হন না। দুঃখেও অভিভূত হন না, সুখেও উল্লসিত হন না। উভয় ক্ষেত্রেই উদাসীন থাকেন। দৈহিক সুখ উপভোগের উদ্দেশ্যে নয়, তারা বেঁচে থাকতে চান কেবল ভজন বৃদ্ধির জন্য। দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলে দীর্ঘকাল ভজনের সুযোগ হবে। নরদেহও ভজনের মূল; অনেক সৌভাগ্যের ফলে নরদেহ লাভ হয়েছে। এ দেহে যতটুকু ভজন করা যায়, ততটুকুই লাভ।

কিন্তু যেস্থলে কেবল দেহের সুখভোগের জন্যই বেঁচে থাকার ইচ্ছা হয়, সেস্থলে ভক্তির তাৎপর্য থাকে না। তাৎপর্য হলো– বিচারবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যদি কখনো কখনো ভক্তিসাধনে রুচি জন্মে, তবে তার বোঝা উচিত যে, ভক্তিসাধনেই প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, মানবজন্মের সার্থকতাও লাভ হতে পারে। সুতরাং ভক্তিহীন বিষয়ে অভিনিবিষ্ট না হয়ে ভজনে নিবিষ্ট হওয়াই সঙ্গত। এ কথা বুঝেও যদি কেউ ভক্তিসাধনের প্রতি প্রাধান্য না দিয়ে ভক্তিহীন কর্মেই অধিকতর আদর দেখায়, তবে বুঝতে হবে তার পূর্বসঞ্চিত অপরাধ আছে। অধিকন্তু ভক্তিহীন কর্মের প্রতি অত্যধিক আদর প্রদর্শনও এক ভয়ানক দৌরাত্ম্য, এক অপরাধ।

যে কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করামাত্র প্রেমের উদয় হয়, সেই নামই যখন বহু বহু বার উচ্চারণ করলেও প্রেমের আবির্ভাব হয় না, চিত্ত দ্রবীভূত হয় না, অশ্রুধারাও প্রবাহিত হয় না, তখন বুঝতে হবে নামোচ্চারণকারীর পূর্বসঞ্চিত প্রচুর অপরাধ আছে। এ অপরাধ দূরীভূত না হলে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হতে পারে না। যারা কেবল মোক্ষকামী, তারাও মোক্ষলাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না অপরাধ থেকে মুক্ত হবে।

সুতরাং পরমার্থকামী সাধকমাত্রেরই অপরাধ দূর করা একান্ত প্রয়োজন। সূর্য যেমন কারো অবস্থানের অপেক্ষা না করে সর্বত্র নিজের আলোক দান করে থাকে। কিন্তু সূর্যকে দেখার জন্য এবং এর আলোক লাভ করার জন্য গুহা বা ঘর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হয়; তেমনি নামের মহিমা অনুভব করতে হলেও সাধককে অপরাধজনিত চিত্তমালিন্য অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? সর্বতোভাবে হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে নিরন্তর ভক্তিভরে হরিনাম জপ ও কীর্তন করতে হবে।

প্রতিকার

যেহেতু (১) কুটিলতা, (২) অপ্রাকৃত বিষয়ে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস, (৩) দেহ-গৃহাদি অনাত্ম বিষয়ে অভিনিবেশ, (৪)

ভজনে শিথিলতা এবং (৫) শাস্ত্রজ্ঞ ও ভজনবিজ্ঞ বলে অভিমানকে যখন মহৎসঙ্গ ও অব্যর্থ শক্তিযুক্ত ভক্তিসাধনের প্রভাবেও নাশ করা কঠিন হয়, তখন বুঝতে হবে বর্তমান ও পূর্বজন্মের নামাপরাধ বিদ্যমান। শ্রদ্ধায়, হেলায় অথবা আভাসমাত্র শ্রীনামের সংযোগে যেখানে অনাদি কোটি কল্পের অবিদ্যাবন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে, সেখানে এমন পরম মঙ্গলময় শ্রীনামে অপরাধ সংঘটিত হলে জীবের সে অসহায় অবস্থায়ও শ্রীনামই শেষ আশ্রয় হওয়ায় তখনো অপরাধ পরিহার করে কৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ সহকারে একান্তভাবে নামেরই শরণাপন্ন হয়ে নিরন্তর নাম গ্রহণ করতে পারলে নামাপরাধরূপ প্রবলতম অনর্থ থেকেও নিষ্কৃতি লাভ করা যেতে পারে– শ্রীনামের এমনই অশেষ অনির্বচনীয় কৃপা। তাই শাস্ত্র নামাপরাধগ্রস্ত অসহায় জীবকে পুনরায় আশ্বাস দিচ্ছে–

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ *(হ. ভ. বি. ১১/২৮৮)*

অর্থ : নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির নিরন্তর নামকীর্তনই সেই অপরাধ হরণ করে নানাবিধ প্রয়োজন (মঙ্গল) সাধক হয়ে থাকে।

সুতরাং অন্য উপায়ের দ্বারা অনতিক্রমণীয় নামাপরাধ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নামের কৃপায় প্রেমভক্তি পর্যন্ত লাভ করে পরম ধন্য ও কৃতার্থ হওয়ার যথেষ্ট আশা আছে। **তবে আশার মধ্যেও নিরাশার কথা এই যে, নামাপরাধের প্রগাঢ় অবস্থায় অপরাধী ব্যক্তির অন্তরে সরলতার পরিবর্তে কুটিলতার বিকাশ হওয়ায় অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে নামের নিকট অবনত হওয়া বা অনুতপ্ত হৃদয়ে কাতরতা প্রকাশ করা সহজসাধ্য হয় না; বরং কুটিলতা ও অহমিকাবশত তার বিপরীত প্রবৃত্তিই জন্মে থাকে। এজন্য কুটিল নামাপরাধীর নামাপরাধসমুদ্র অতিক্রম করে প্রেমভক্তি পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নিরাশ হওয়ার কারণ দেখা যায়।**

নামাপরাধের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে সাধন পথে প্রতিকূলতা দেখা যায়; যথা : **ক)** যেখানে সাধনার গতি পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ মন্থর– সেখানে নামাপরাধের অল্পতা; **খ)** যেখানে সাধনার অগ্রগতি প্রায় স্তব্ধ– সেখানে অপরাধের মধ্যমতা; **গ)** যেখানে গতি নিম্নগামী– সেখানে অপরাধের প্রাচুর্য এবং **ঘ)** যেখানে সাধন-ভজন বিলুপ্তপ্রায়– সেখানে অপরাধের পূর্ণতা বুঝতে হবে। নামাপরাধের সঞ্চার উপলব্ধ হওয়া মাত্র প্রথমত, অনুতাপ সহকারে অপরাধের স্থলে ক্ষমা প্রার্থনা করে তা বিমোচন করা আবশ্যক। কোনো প্রকারে তা অসম্ভব হলে শ্রীনামেরই শরণাপন্ন হয়ে নিরন্তর নামকীর্তনই নামাপরাধ থেকে নিষ্কৃতি লাভের সর্বশেষ ও একমাত্র উপায় বলে জানবেন। সেইসাথে সাধুসঙ্গকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর সঙ্গ করতে হবে।

অপরাধ প্রতিকারপূর্বক নামভজনে উত্তরোত্তর অগ্রগতি সাধনের জন্য শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থ থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ তুলে ধরা হলো; অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা বলে তা অত্যন্ত সহজবোধ্যও :

শরণাগতি

অন্য নয় অপরাধ করিয়া বর্জন। / নামেতে শরণাপন্ন হইবে সজ্জন॥
সংক্ষেপে চরণে করি নিবেদন। / আনুকূল্যে সংকল্প, প্রাতিকূল্য বিসর্জন॥
কৃষ্ণে রক্ষাকারী বুদ্ধি, পালক ভাবন। / নিজে দীনবুদ্ধি, আর আত্মনিবেদন॥
এ জীবন না রহিলে না হয় ভজন। / জীবনরক্ষায় মাত্র বিষয় গ্রহণ॥
ভক্তি-অনুকূল যে বিষয় অনুক্ষণ। / তাহে রোচমান বৃত্তে জীবন যাপন॥
ভক্তি-প্রতিকূল যে বিষয় যবে হয়। / তাহাতে অরুচি, তাহা বর্জিবে নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ বিনা রক্ষাকর্তা নাহি কেহ আর। / কৃষ্ণ সে পালকমাত্র জানিবে আমার॥
আমি দীন অকিঞ্চন সকলের ছার। / অধম দুর্গত কিছু নাহিক আমার॥
কৃষ্ণের সংসারে আমি আছি চিরদাস। / কৃষ্ণ ইচ্ছামত ক্রিয়া আমার প্রয়াস॥

কৃষ্ণের যে হয় ইচ্ছা, তাহাই করিব। / নিজ ইচ্ছা অনুসারে কিছু না চিন্তিব ॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছামতে হয় আমার সংসার। / কৃষ্ণ-ইচ্ছামতে আমি হই ভবপার ॥
দুঃখে থাকি সুখে থাকি, আমি কৃষ্ণদাস। / কৃষ্ণেচ্ছায় সর্বজীবে দয়ার প্রকাশ ॥
মম ভোগ কর্মভোগ কৃষ্ণ-ইচ্ছামত। / আমার বৈরাগ্য কৃষ্ণ-ইচ্ছা-অনুগত ॥

উত্তরণ

নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ। / বিষয় ছাড়িয়া করে নামসংকীর্তন ॥
নামের শরণাগত যেই মহাজন। / কৃষ্ণনাম করে পায় প্রেম-মহাধন ॥
অতএব সাধুনিন্দা যতনে ছাড়িয়া। / পরতত্ত্ব বিষ্ণু শুদ্ধ মনেতে জানিয়া ॥
নামগুরু নামশাস্ত্র সর্বোত্তম জানি। / বিশুদ্ধ চিন্ময় নাম হৃদয়েতে মানি ॥
পাপস্পৃহা পাপবীজ ত্যজিয়া যতনে। / প্রচারিয়া শুদ্ধনাম শ্রদ্ধান্বিত জনে ॥
অন্য শুভকর্ম হৈতে লইয়া বিরাম। / স্মরে যে শরণাগত অপ্রমাদে নাম ॥
অপরাধ নাহি ছাড়ি নাম যদি লয়। / সহস্রসাধনে তার ভক্তি নাহি হয় ॥
জ্ঞানে মুক্তি, কর্মে ভুক্তি, জ্ঞানী, কর্মী জনে। / সুদুর্লভা কৃষ্ণভক্তি নির্মল সাধনে ॥
ভুক্তিমুক্তি শুক্তিসম, ভক্তি মুক্তাফল। / জীবের মহিমা– ভক্তিপ্রাপ্তি-সুনির্মল ॥
সাধনে নৈপুণ্য-যোগে অত্যল্প সাধনে। / ভক্তিলতা প্রেমফল দেন ভক্তজনে ॥
দশ অপরাধ ছাড়ি নামের গ্রহণ। / ইহাই নৈপুণ্য হয় সাধনে ভজন ॥
অতএব ভক্তিলাভে যদি লোভ হয়। / দশ অপরাধ ছাড়ি করি নামাশ্রয় ॥
এক এক অপরাধ সতর্ক হইয়া। / যতনেতে ছাড়ি চিত্তে বিলাপ করিয়া ॥
নামের চরণে করি দৃঢ় নিবেদন। / নামকৃপা হলে অপরাধ বিধ্বংসন ॥
অন্যশুভকর্মে নাম-অপরাধ ক্ষয়। / কোনো প্রায়শ্চিত্ত যোগে কভু নাহি হয় ॥
অবিশ্রান্ত নামে নাম-অপরাধ যায়। / তাহে অপরাধ কভু স্থান নাহি পায় ॥
দিবারাত্র নাম লয় অনুতাপ করে। / তবে অপরাধ যায় নামফল ধরে ॥
অপরাধ গতে শুদ্ধনামের উদয়। / শুদ্ধনাম ভাবময় আর প্রেমময় ॥
দশ অপরাধ যেন হৃদয়ে না পশে। / কৃপা কর মহাপ্রভু মজি নামরসে ॥

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (৮/৬/১৫) তাৎপর্যে বলেছেন :

ভগবান যা বলেন তাই মন্ত্র এবং তাই বদ্ধ জীবকে মনোধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। বদ্ধজীব জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত (*মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*)। এ থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। গায়ত্রীই আদি মন্ত্র। কেবল গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার ফলেই মানুষ উদ্ধার লাভ করতে পারে। কিন্তু তা কেবল ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের জন্য উপযুক্ত। কলিযুগে আমরা সকলেই এক বিষম পরিস্থিতির শিকার, এজন্য এমন এক উপযুক্ত মন্ত্রের প্রয়োজন যা কলিযুগের এ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে আমাদের সহজে উদ্ধার করতে পারে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে আমাদের 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র দান করেছেন– ***"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"*** এবং তিনি স্বয়ং তা কীর্তন করেও দেখিয়েছেন।

স্ফুলিঙ্গসদৃশ জীব যখন অগ্নিসদৃশ ভগবান থেকে বিচ্যুত হয়ে জড়-জগতে পতিত হয়, তখন তাকে অবশ্যই ভগবানের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করে মুক্ত হতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের সেই মন্ত্রই দান করে গেছেন, যা কীর্তন করে আমরা জড়জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারব।

(তাৎপর্য ভা. ৬/২/৪৬) অতএব যারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাদের কর্তব্য হলো, যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিরাজ করে, তাঁর নাম, যশ, রূপ, লীলা আদির মহিমা কীর্তন করার পন্থা অবলম্বন করা। পুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত, মনোধর্মী জ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গযোগে ধ্যান আদি অন্যান্য পন্থায় যথার্থ লাভ হয় না, কারণ সেসব পন্থা অনুশীলন করার পরেও রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত মনকে সংযত করতে না পেরে মানুষ পুনরায় সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। দেখা গেছে যে, তথাকথিত সিদ্ধি লাভ করার পরেও কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীরা পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আসক্ত হয়। তথাকথিত বহু স্বামী ও যোগী জগৎ মিথ্যা বলে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে; কিন্তু কিছুদিন পর তারাই হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি খুলে অথবা জনহিতকর কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করে পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। নিজেদের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তারা কখনো কখনো রাজনীতিতে যোগ দেয়। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, কেউ যদি সত্যি সত্যিই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী হয়, তবে তাকে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যা শুরু হয় *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ...* থেকে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনই তা সত্যিকার অর্থে প্রমাণ করেছে। পাশ্চাত্যের বহু যুবগ-যুবতীর ড্রাগগ্রহণসহ অন্যান্য বহু বদভ্যাস ছিল যা ত্যাগ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করামাত্র সেসব ছেড়ে দিয়ে তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ভগবানের নামকীর্তনে যুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে এও বলা যায় যে, এ পন্থা রজ ও তমোগুণে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্মের আদর্শ প্রায়শ্চিত্ত। সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৯) বলা হয়েছে–

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে মানুষ অত্যন্ত কামুক এবং লোভী হয়, কিন্তু কেউ যখন এ শ্রবণ-কীর্তনের পন্থা অবলম্বন করেন, তখন সত্ত্বগুণে উন্নীত হয়ে তিনি সুখী হন। ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধনের সাথে সাথে তাঁর সন্দেহ দূর হয় (*ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়া*)। এভাবে তাঁর সকাম কর্মের বাসনারূপ গ্রন্থি ছিন্ন হয়।

নামাপরাধশূন্য নামগ্রহণকারীর লক্ষণ

নামাপরাধশূন্য ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষাষ্টকের তৃণাদপি শ্লোকোক্ত চার দিব্যগুণ অভিব্যক্ত হয়; রতি স্তরে উন্নীত সাধকের চিন্ময়ভাবের স্বাভাবিক লক্ষণও এ গুণগুলোই :

১। **দৈন্য :** জড় ইন্দ্রিয়ভোগের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হওয়ায় নামপরায়ণ সাধুর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এসব গুণের প্রকাশ ঘটে।

২। **সহিষ্ণুতা :** মাৎসর্যহীন শুদ্ধ দয়াভাব থেকে উৎসারিত।

৩। **মানশূন্যতা :** মিথ্যা অহঙ্কারশূন্য ঐশ্বর্যপূর্ণ শুদ্ধ হৃদয়ের বৃত্তি;

৪। **মানদাতৃত্ব :** প্রতিষ্ঠাশাশূন্য উদার হৃদয়ের শ্রদ্ধাযুক্ত ভাব, যা নির্বিশেষে সবার প্রতিই প্রযুক্ত।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুদ্ধ নামপরায়ণ সাধুর মনোভাব তুলে ধরেছেন– অন্যের কল্যাণ-চিন্তায় গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে তিনি ভাববেন, "আহা, এই বদ্ধজীবগণ কী দুর্ভাগা! মোহান্ধ হয়ে তারা গৃহ, পরিবার, ধন-সম্পদ, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি আর জন্ম-মৃত্যুর চোরাবালিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। সর্বমঙ্গলময় নামের প্রতি তাদের রুচি কীভাবে হবে? তারা এতই অনর্থে পরিপূর্ণ যে বিষয় ভোগের প্রতি তাদের সামান্যতম বিরক্তিও জন্মে না। সীমাহীন কামনা-বাসনার শক্ত পাশে তারা আবদ্ধ। অর্থহীন কার্যকলাপে তারা প্রতিনিয়তই তাদের অমূল্য সময়ের অপচয় করে চলেছে; কিন্তু কিছুতেই বোধোদয় হচ্ছে না।"

বিনয় : অপরাধশূন্য ব্যক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো বিনয়। বিনয় অর্থ অন্যের কাছ থেকে সম্মান লাভের

আশা না করা। কিন্তু বিষয়ীমাত্র অন্যের কাছ থেকে সম্মান লাভের জন্য সর্বদাই উন্মুখ শুধু নয়, সম্মান লাভের জন্য তারা কাউকে মারতে অথবা নিজে মরতেও দ্বিধাবোধ করে না। দেহাত্মবুদ্ধিই মানুষকে বিনীত হতে দেয় না। কিন্তু যিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি জানেন– এ জড় শরীরটি তাঁর স্বরূপ নয়, তাই তাঁর কাছে সম্মান ও অপমান উভয়ই নিরর্থক। এমনকি সর্বগুণে বিভূষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করেন। নির্মৎসর হওয়ার কারণে তাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ। এটিই প্রেমিক ভক্তের লক্ষণ। প্রেমের পরিণত অবস্থার প্রকাশ হয় বিনয়ের মাধ্যমেই।

কীভাবে নাম গ্রহণ করলে নামাপরাধ হয় না?

অহংমম বুদ্ধ্যাশক্তি না রাখে হৃদয়ে।
দীনভাবে নাম লয় সকল সময়ে ॥

জীব স্বরূপত কৃষ্ণদাস বলে সে তার স্বধামে অথবা এ জগতে যেখানেই থাকুক, নিত্যকাল হরিনামই তার ধর্ম। হরিনাম কীর্তনের তুল্য সিদ্ধিপ্রদানকারী ও উপকারী উপায় আর নেই। এর দ্বারা নিজের সর্বশুভোদয় তো হয়েই পরার্থপরতাও সাধিত হয় বিস্তরভাবে। কীভাবে হরিনাম করলে নামাপরাধমুক্ত হয়ে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়, তা জানানোর জন্যই প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৃণাদপি শ্লোকের অবতারণা করেছেন। তাই 'তৃণাদপি' শ্লোকের ওপর একটি চমৎকার ব্যাখ্যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

যার প্রবৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখ না হয়ে দেহ ও বিষয়ভোগে প্রমত্ত, তিনি কখনোই নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না। ভোক্তা অভিমানে ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নেই, সহনশীলতাও নেই। ভোক্তা কখনো জড়-অভিমান ও জড়-প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করতে পারেন না। বিষয়ভোগী কখনোই অন্য বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দিতে সম্মত হবেন না। তার মধ্যে মাৎসর্য প্রচুর। কিন্তু নামভজনানন্দী বৈষ্ণবই তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, নিজ প্রতিষ্ঠার প্রতি উদাসীন এবং অন্যকে প্রতিষ্ঠা দানে উদ্‌গ্রীব। এ জগতে তিনিই সর্বদা হরিনাম করার যোগ্য ও সমর্থ ব্যক্তি। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ আচার্যগুরু ও অন্য বৈষ্ণবকে যে সমস্ত সম্মানসূচক প্রতিষ্ঠা অর্পণ করেন, তা তাঁদের মানদ ধর্ম থেকেই উত্থিত হয়। পক্ষান্তরে অনুগতজনের ভজনে উৎসাহ প্রদান করার জন্য যে সমাদর, গৌরব ও স্নেহ আদি তাঁরা ব্যক্ত করেন, তা তাঁদের অমানী স্বভাবের প্রকাশ মাত্র। নামোচ্চারণকারী শুদ্ধভক্ত নিজেকে প্রাকৃত জগতের সকল প্রাণীর পদদলিত তৃণের চেয়েও নিচু ধারণা করেন, কখনোই বৈষ্ণব বা গুরুজ্ঞান করেন না; বরং জগতের শিষ্য ও সর্বাপেক্ষা হীন বলে জানেন। প্রত্যেক পরমাণু এবং প্রত্যেক অণুচিৎ জীবকে কৃষ্ণের অধিকার জেনে কোনো বস্তুকে নিজের চেয়ে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন না। তিনি জগতের কারো কাছে কোনোকিছু চান না। অন্যেরা তাঁর প্রতি হিংসা করলেও তিনি কখনো প্রতিহিংসা করেন না; উপরন্তু হিংসাকারীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন। নিজের সরলতা না থাকলেও অন্যকে প্রতারণা করার জন্য কপট দৈন্যোক্তি ও ব্যবহার সুনীচতার পরিচায়ক নয়। সাধু তা কখনো করেন না; বরং মহাভাগবতগণ কৃষ্ণনাম গ্রহণকালে স্থাবর-জঙ্গম প্রকৃতিকে ভোগ্যমূর্তিরূপে দর্শনের পরিবর্তে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবার উপযোগী জগৎরূপে দর্শন করেন। জগৎকে নিজের ভোগ্য মনে করেন না। গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র কখনোই ত্যাগ করেন না এবং নতুন কোনো মত প্রচারেও ব্যস্ত হন না। স্বরূপবিস্মৃত ইন্দ্রিয়পরায়ণ বৈষ্ণব ও গুরুবেশধারী ব্যক্তির মুখে হরিনাম কীর্তিত হতে পারে না এবং সেই কীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত শিষ্যও নাম শ্রবণের অধিকার লাভ করতে পারে না।

তাই যতদিন পর্যন্ত এ তৃণাদপি শ্লোকের তাৎপর্য অনুসারে আচরণ না হচ্ছে, ততদিন প্রেমলাভ সুদূরপরাহত। তবে যিনি যে পরিমাণে এ শ্লোকের মর্ম উপলব্ধি করে ভজনে প্রবৃত্ত হবেন, তিনি সে পরিমাণে প্রেমলাভে কৃতার্থ হবেন। যেদিন পূর্ণরূপে যাজন হবে, সেদিনই পরিপূর্ণরূপে প্রেমলাভ হবে। সুতরাং ***"প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ। / অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥"*** *(চৈ. চ. ১৭/৩৩)* সর্বদা অপরাধ সম্বন্ধে সাবধান হওয়াই সাধকের ভজন কৌশল। তা অনুসরণ করে নামগ্রহণ করতে হবে। ***"প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"*** (চৈ. চ.)– এ

মহাবাণী যাঁদের জীবনের ব্রত, তাঁরাই অপরাধমুক্ত। আর অনন্যবুদ্ধিতে নাম গ্রহণ করতে হবে– শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে–
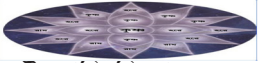
আর কোনো ধর্ম-কর্ম কভু না করিবে। / স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে অন্যে না পূজিবে ॥
কৃষ্ণনাম, ভক্তসেবা সতত করিবে। / কৃষ্ণপ্রেম লাভ তার অবশ্য হইবে ॥

শ্রীনাম গ্রহণের সময় কী চিন্তা করা উচিত

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল স্বরূপদামোদর ও শ্রীল রামানন্দ রায়কে বলেছেন– "*নামসংকীর্তন কলৌ পরম উপায়।*" (*চৈ. চ.* অন্ত্য ২০/৭) এস্থানে পরম উপায় বলতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন বুঝতে হবে। সে নাম কীভাবে গ্রহণ করলে তার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ হবে, তা শিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেছেন। নাম গ্রহণকারী সাধক নামগ্রহণকালে কী চিন্তা করবেন, তা শিক্ষাষ্টকের মর্ম অবলম্বনে প্রদত্ত হলো :

১. তৃণাদপি শ্লোকের মর্ম হৃদয়ে ধারণপূর্বক কোনো প্রকার ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ বা মুক্তির প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট না হয়ে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী প্রীতি কামনার সাথে সাথে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে রতি লাভের জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

২. শ্রীনামপ্রভুর কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে হরিনাম কীর্তনে বাধাদানকারী স্বসুখচিন্তা বা নিজের স্বার্থচিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয় থেকে দূর করতে সর্বদা যত্নবান হতে হবে। অনর্থের কারণে স্বসুখচিন্তা হৃদয়ে এসে যায়, তখন কাঁদতে কাঁদতে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীনামপ্রভুর চরণে কাতরভাবে প্রার্থনা করতে হবে। ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য কীভাবে সমস্ত সুখকে বলি দিয়েছেন, সে চিন্তা সর্বদা হৃদয়ে পোষণ করতে হবে এবং কবে সেই কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা লাভ হবে, সেজন্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা জানাতে হবে।

৩. শ্রীমন্মহাপ্রভু পরমসুখ বা পরমদুঃখ যেভাবেই রাখুন না কেন, কর্মফল অনুযায়ী সেটাই শ্রীনামপ্রভুর সমুচিত ব্যবস্থা জেনে তাতে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং কীভাবে তাঁর কৃপায় শ্রীগুরুদেবকে হৃদয়েশ্বর ও পরমসুহৃদ জ্ঞান করে তাঁর চরণে সক্রন্দন প্রার্থনা করা যায়, তা চিন্তা করতে হবে।

৪. শ্রীগুরুদেবের কৃপাদৃষ্টি জীবের ওপর পতিত হলে তার ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতত্ব দূর হবে এবং অপ্রাকৃত জিহ্বায় নামরস আস্বাদন করে অপ্রাকৃত আনন্দে বিভোর হবে। এজন্য স্বসুখচিন্তা ছেড়ে একনিষ্ঠভাবে নামের শরণ নিতে হবে।

৫. উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম উচ্চারণ করে তা শ্রবণ করতে হবে। এভাবে শ্রবণ করলে স্মরণ এমনিই হবে। কিন্তু নামগ্রহণকালে কোনো রূপাদির কৃত্রিম চিন্তা করা উচিত নয়। অশুদ্ধ মনে অপ্রাকৃত রূপের চিন্তা অসম্ভব; তাই সর্বাদৌ নামকীর্তন ও নাম শ্রবণের আবশ্যকতার কথা মহাজনগণ বারংবার বলেছেন।

নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করে এর উত্তর সাপেক্ষে আপনি নিজের পারমার্থিক অগ্রগতি যাচাই করতে পারেন :

১. আমি সেবা করতে কতটা আগ্রহী, নাকি শুধু সেবা পেতে চাই?

২. অন্যকে সম্মান দিতে আমি কতটুক আহগ্রী, নাকি শুধু অন্যের সম্মান পাওয়ার চেষ্টা করি?

৩. অন্যদের প্রতি আমি কত বেশি [illegible] যত্নেই ব্যস্ত?

৪. অন্যের উন্নতি দেখে আমি খুশি হই, নাকি হিংসা হয়?

৫. আমি সম্পূর্ণরূপে গুরুকৃষ্ণের কৃপার ওপর নির্ভরশীল, নাকি নিজের ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করি?

৬. আমি আত্মসমালোচনা করি, নাকি কেবল অন্যের সমালোচনায় ব্যস্ত থাকি?

আমাদের আর কোনো ধনই নেই। কলির জীব অত্যন্ত দারিদ্র ও অসহায় জেনেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এ নামরত্ন আমাদের প্রদান করেছেন। তাঁর কৃপায় আমরা যেন নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করতে পারি– এটাই একমাত্র প্রার্থনা। “জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম।”

পর্ব
আট

অনর্থসমূহ আমাদের জীবনে ঘন কালো মেঘের মতো, যা নামসূর্যের আলোকে আমাদের কাছে আসতেই দেয় না। এই মেঘের মতো আমাদের অনর্থসমূহ কেটে গেলে নামসূর্য স্বতঃই আমাদের সামনে প্রকাশিত হবে।

কুয়াশারূপ অজ্ঞানতা ও মেঘরূপ অনর্থসমূহ কেটে যাওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে নামসূর্যের আলো আমাদের সামনে প্রকাশিত হবে।

নামাভাস

নামতত্ত্ব বোঝার জন্য নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ– এ তিন বিষয় বুঝতে হয়। নামের আভাসকে নামাভাস বলে। আভাস অর্থ ইঙ্গিত, জ্যোতি, বা ছায়া। কোনো প্রকাশময় বস্তুর জ্যোতি বা ছায়াকেই আভাস বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণনাম চিৎসূর্যস্বরূপ, যা মায়ারূপ অন্ধকারকে নাশ করে। বদ্ধজীবের প্রতি কৃপা করেই জগতে নামসূর্য উদিত হয়েছে। কিন্তু অজ্ঞানরূপ কুয়াশা এবং অনর্থরূপ মেঘ সূর্যকে ঢেকে ফেলে। না না, তা কী করে সম্ভব? সূর্যকে ঢেকে ফেলা মেঘ ও কুয়াশার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কুয়াশা ও মেঘ আসলে বদ্ধজীবের চক্ষুকেই

ঢেকে ফেলে। সূর্য অতি বৃহৎ এবং মহাজ্যোতির্ময়, সুতরাং তাকে ঢাকার প্রশ্নই আসে না। অর্থাৎ বদ্ধজীবের চেতনাই অজ্ঞানতা ও অনর্থের দ্বারা আবৃত হয়, এজন্য চিৎসূর্য হরিনামকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। নিম্নে অজ্ঞানতা ও অনর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো :

অজ্ঞানতা : কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের অভিন্নতা, নামের চিৎস্বরূপ, কৃষ্ণের সর্বেশ্বরতা, দেব-দেবীগণের কৃষ্ণদাসত্ব, জীবের চিৎস্বরূপ এবং মায়ার জড়তা সম্বন্ধে না জানাই অজ্ঞানতা। কৃষ্ণ প্রভু, জীব তাঁর নিত্য দাস এবং মায়া জড়তত্ত্ব–এটি জানলে আর অজ্ঞানতা থাকে না।

অনর্থ : অনর্থ শব্দের অর্থ অর্থহীন, সারহীন, বিপত্তি, অনিষ্ট, অমঙ্গল, অশুভ। কিন্তু ভক্তিযোগে অনর্থ দ্বারা ভক্তিপথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী জড়-বাসনাকে বোঝায়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অনর্থকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে– "কখনো এছাড়া অন্যকিছু ভাববে না : জড় পদার্থে রচিত যা কিছু তার সবই অনর্থ, তাই তা বর্জনীয়।" ভক্তিপথে ক্রমশ অগ্রসর হওয়ার জন্য অনর্থসমূহের মূলোৎপাটন আমাদের অবশ্যই করতে হবে। শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে চার ধরনের অনর্থের কথা বলা হয়েছে; যথা :

১। **অসৎতৃষ্ণা :** কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বিষয়ে তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি লোভ। এটি চার প্রকার, যথা–
 ক. ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় লাভের বাসনা; **খ.** স্বর্গসুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা; **গ.** যোগসিদ্ধি লাভের বাসনা এবং **ঘ.** ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি বা ব্রহ্মে লীন হওয়ার বাসনা।

২। **হৃদয়দৌর্বল্য :** চার প্রকার, যথা–
 ক. কৃষ্ণসম্বন্ধহীন বিষয়ের প্রতি আসক্তি; **খ.** প্রতারণা করা ও দোষদর্শনের প্রবণতা; **গ.** মাৎসর্য এবং **ঘ.** প্রতিষ্ঠাশা

৩। **অপরাধ :** চার প্রকার, যথা–
 ক. নামাপরাধ; **খ.** সেবা অপরাধ; **গ.** বৈষ্ণব-অপরাধ এবং **ঘ.** জীব-অপরাধ বা জীবহিংসা

৪। **তত্ত্ববিভ্রম :** চার প্রকার, যথা–
 ক. স্ব-তত্ত্বভ্রম অর্থাৎ নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রম; **খ.** পরতত্ত্বভ্রম অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর সম্বন্ধে ভ্রম; **গ.** সাধ্য-সাধনতত্ত্বভ্রম এবং **ঘ.** কৃষ্ণভাবনার প্রতিকূল বিষয়সমূহ সম্বন্ধে ভ্রম।

উক্ত অনর্থগুলোই জীবের ষড়রিপু ও ষড়তরঙ্গের জন্ম দেয়। ষড়রিপু হলো– **কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য**। আর ষড়তরঙ্গ হলো– **শোক, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা ও মৃত্যু**।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনর্থ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন–

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসন।
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ *(চৈ. চ. ১৯/১৫৮-১৫৯)*

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিকে লতার সাথে তুলনা করেছেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণগুণ কীর্তনরূপ জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এ লতার উত্তরোত্তর পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন হয়। কিন্তু কেউ যদি উদাসীন হয়ে জল সিঞ্চন করে, তবে তা লতার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে অবাঞ্ছিত উপশাখাগুলোকেও পুষ্ট করে। ধীরে ধীরে এই উপশাখাগুলোই অধিক পুষ্ট হয়ে সুকোমল ভক্তিলতার বৃদ্ধি ব্যাহত করে, এমনকি রুদ্ধও করে দিতে পারে। তখন শুদ্ধনাম গ্রহণ করা যেমন অসম্ভব হয়ে পড়বে, তেমনি প্রেমরূপ ফল লাভের লক্ষ্য পূরণও ব্যর্থ হয়ে যাবে। এজন্য এসব বাধা-বিপত্তি থেকে লতাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সর্বদা সচেতন থাকার সাথে সাথে তা নির্মূল করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আবার কখনো কখনো কিছু উপশাখাকে দেখতে ভক্তিলতার মতো মনে হয় বলে তা চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু

শুদ্ধ ভক্তগণ ভক্তিলতার সাথে এসব আগাছার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন এবং তা প্রতিহতও করেন। ভক্তিলতার জন্য বিপজ্জনক নিম্নোক্ত ছয়টি আগাছা থেকে সর্বদা সাবধান থাকুন :

১। **নিষিদ্ধাচার :** শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচার (যেমন আমিষাহার, নেশা গ্রহণ, জুয়াখেলা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ)।
২। **কুটিনাটী :** দোষদর্শন, শঠতা, কূটনীতি ইত্যাদি কূটিল আচরণ;
৩। **জীবহিংসা :** পশু বা যেকোনো জীব হত্যা, তাদের ঈর্ষা-দ্বেষ;
৪। **লাভ :** জড় বিষয় লাভের প্রতি লালসা;
৫। **পূজা :** অন্যের প্রশংসা, পূজা, জনপ্রিয়তা ও সম্মান লা
৬। **প্রতিষ্ঠা :** উচ্চপদ, যশ, খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা।
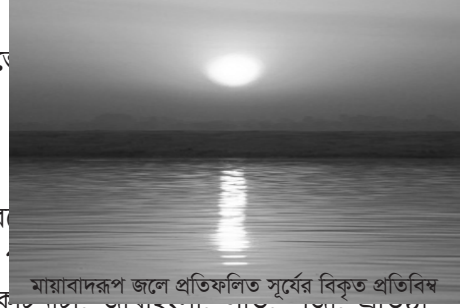
মায়াবাদরূপ জলে প্রতিফলিত সূর্যের বিকৃত প্রতিবিম্ব

এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন :

সেই বীজ লাভ করার পর, মালী হয়ে সেটিকে হৃদয়ে রোপণ কর সিঞ্চন করতে হয়। অপরাধরূপ মত্তহস্তী যাতে প্রবেশ করতে না চারদিকে বেড়া দেন। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-বাসনা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ভক্তিলতার অঙ্গে উপশাখার মতো। জল পেয়ে উপশাখাগুলো বাড়তে থাকে এবং তার ফলে ভক্তিলতা বাড়তে পারে না। হরিনাম কীর্তন করার সময় কেউ যদি অপরাধ করে, তাহলে এসব উপশাখা বাড়তে থাকে। তাই কোনো জাগতিক লাভের আশায় 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এ সম্বন্ধে বলেছেন যে, নিরপরাধে অর্থাৎ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে শ্রবণ-কীর্তন না করতে পারলে মানুষ নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে মত্ত হয়ে শুদ্ধভক্তিকে বাদ দিয়ে অবান্তর নশ্বর বস্তু লাভের জন্য নির্বোধ লোকদের বঞ্চনা করে জগতে ধার্মিক, সাধু বা মহৎ বলে পরিচিত হতে চায়, বাস্তবিক শুদ্ধ হরিসেবক হতে পারে না। (তাৎপর্য, চৈ. চ. মধ্য ১৯/১৫৩, ১৫৭-১৬০)

শুদ্ধনাম করার জন্য আরেকটি বিষয় উপলব্ধি করা অতীব প্রয়োজন। তা হলো সম্বন্ধ জ্ঞান অর্থাৎ আমি অণুচৈতন্য নিত্য কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ বিভুচৈতন্য আমার একমাত্র প্রভু আর এ জড়জগৎ আমার প্রবৃত্তিশোধক কারাগার– এ জ্ঞান যে পর্যন্ত গুরুদেবের কৃপায় উদয় না হয়, সে পর্যন্ত জীবের অজ্ঞান-অনর্থ থাকে; সুতরাং সে পর্যন্ত যে নাম উচ্চারিত হয়, তা নামাভাস হয়, শুদ্ধনাম হয় না। এ সম্বন্ধে শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে–

যাবৎ সম্বন্ধ-জ্ঞান স্থির নাহি হয়। / তাবৎ অনর্থে নামাভাসের আশ্রয় ॥

শাস্ত্রে আভাস শব্দের ব্যবহার

শাস্ত্রের অনেক স্থানে নামাভাস, বৈষ্ণবাভাস, শ্রদ্ধাভাস, ভাবাভাস, রত্যাভাস, প্রেমাভাস, মুক্তাভাস ইত্যাদি শব্দসমূহ পাওয়া যায়। সর্বত্রই আভাস শব্দটির একটি সুন্দর অর্থ আছে। তা-ই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে– প্রকৃতপক্ষে আভাস দুই প্রকার, যথা– স্বরূপ আভাস এবং প্রতিবিম্বাভাস। স্বরূপ আভাসে বস্তুর পূর্ণজ্যোতি সঙ্কুচিতভাবে প্রকাশিত হয়, যথা– মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের স্বল্পজ্যোতির স্বল্প আলোক।

প্রতিবিম্বাভাসে স্বরূপের বিকৃতি ঘটায় অন্যভাবে উদিত হয়; ঠিক যেমন জলে প্রতিফলিত হয়ে আলো বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়। নামসূর্য জীবের অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুয়াশা ও মেঘ দ্বারা যতক্ষণ আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সেই সূর্যের সঙ্কুচিত অতি সামান্য আলোক পরিদৃশ্য হয়। এ অবস্থায় নামাভাস জগতে অনেক শুভফল প্রদান করে। সেই নামাভাস মায়াবাদরূপ জলরাশি

থেকে প্রতিফলিত হলে প্রতিবিম্ব নামাভাস হয়।

এ নামাভাস একটি প্রধান অপরাধ হওয়ায় একে নামাভাস বলা যায় না। কেবল ছায়া নামাভাসকেই নামাভাস বলে বিবেচনা করে চার প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে। হেয় প্রতিবিম্ব নামাভাসকে দূরীভূত করে নামাভাসের পূজা করার কথা সর্বশাস্ত্রে দেখা যায়। অজ্ঞানজনিত অনর্থ থেকে ছায়া নামাভাস, দুষ্টজ্ঞানজনিত অনর্থ থেকে প্রতিবিম্বিত নামাভাসকে ভক্তিবাধক অপরাধ বলে বিচার করা হয়। বৈষ্ণবপ্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস ব্যক্তিকে বৈষ্ণব না বললেও তার মায়াবাদ অপরাধ না থাকা পর্যন্ত তাকে কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত ভক্ত বলে সম্মান করা যায়। কারণ সৎসঙ্গে তার শীঘ্রই মঙ্গল হতে পারে। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ তাকে বালিশরূপে কৃপা করবেন। বিদ্বেষী মায়াবাদীকে যেভাবে উপেক্ষা করেন, তাদের প্রতি তেমন করবেন না। অর্চামূর্তির প্রতি তার লৌকিক শ্রদ্ধাকে সংবর্ধিত করে ভগবৎ ও ভাগবতসেবার উপযোগী সম্বন্ধজ্ঞানপূর্ণ ভক্তি দান করবেন। কিন্তু যদি তার মধ্যে অচ্ছেদ্য মায়াবাদবিশ্বাস দেখা যায়, তবে তাকে অবশ্যই উপেক্ষা করবেন।

প্রতিবিম্ব ও ছায়া নামাভাসের মধ্যে পার্থক্য

নামকারীর মনোবৃত্তিই লক্ষণীয় বিষয়। যখন শুধুই অজ্ঞান থাকে, তখন ছায়া নামাভাস হয়। কিন্তু যখন হৃদয়দৌর্বল্য, ভুক্তি-মুক্তি বাসনা আদি অনর্থসমূহ বর্তমান থাকে, তখন প্রতিবিম্ব নামাভাস হয়। অনর্থের প্রাবল্যে নামাভাস না হয়ে নামাপরাধ হয়। নিম্নে যে চার প্রকার নামাভাসের কথা বলা হচ্ছে, তা ছায়া নামাভাস।

চার প্রকার নামাভাস

নামাভাস চার প্রকার, যথা– সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা অর্থাৎ সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলার সাথে নাম উচ্চারিত হলে নামাভাস হয়। হেলার চেয়ে স্তোভ, স্তোভের চেয়ে পরিহাস এবং পরিহাসের চেয়ে সঙ্কেত কম দোষাবহ। নিচে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো :

১. সঙ্কেত

ভগবানের নাম এবং সঙ্কেত নামাভাসের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় প্রয়োগস্থানের পার্থক্যের কারণে। সঙ্কেতে নামাভাস দুই প্রকার, যথা : (ক) ভগবানের নাম যখন ভগবানকে লক্ষ্য করে উচ্চারিত না হয়ে অন্য কাউকে লক্ষ্য করে উচ্চারিত হয়, তখন সাঙ্কেত্য নামাভাস হয়। যেমন : বিষ্ণু ভগবানের নাম হলেও যদি কোনো ব্যক্তির নাম বিষ্ণু রাখা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অন্যেরা তার নাম ধরে ডাকবে– "ওহে বিষ্ণু, একটু শোনো তো।" এভাবে ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বিষ্ণু নামে ডাকা হলে সাঙ্কেত্য নামাভাস হয়, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাম হয় না। এমন আরও উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন গঙ্গা বা তুলসীদেবীর নামেও কারো নাম হতে পারে, তখন ওই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যখন গঙ্গা বা তুলসী নামে ডাকা হয়, তখন গঙ্গা বা তুলসীর নাম হয় না, তাদের নামাভাস হয়। এ প্রসঙ্গে ভাগবতের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে–

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ (ভা. ৬/২/৪৯)

অর্থ : অজামিলের ন্যায় মৃত্যুযন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ মহাপাপীও পুত্রকে লক্ষ্য করে শ্রীনারায়ণের নাম উচ্চারণের দ্বারা ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই হরিনাম অপরাধশূন্য হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে সতত কীর্তন করলে যে জীব ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হবে সে বিষয়ে আর বলার কী আছে?

(খ) জড়বস্তুকে নির্দেশ করতে গিয়ে ভগবানের নাম হলেও তাতে সাঙ্কেত্য নামাভাস হয়। যবনেরা যখন শূকরকে নির্দেশ করে হারাম হারাম বলে, তখনো 'রাম' নামের আভাস অর্থাৎ সাঙ্কেত্য নামাভাস হয়। "*হারাম হারাম বলি, কহে নামাভাস। তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥*" (হ. চি.)

২. পরিহাস

পরিহাসছলে ভগবানের নাম উচ্চারণ করলেও নামাভাস হয়। পরিহাস বলতে ঠাট্টা-তামাশা করা বোঝায়; কিন্তু উপহাস নয়। উপহাস নিন্দার উদ্দেশ্যে করা হয়। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ পরিহাস ও উপহাস শব্দের পার্থক্য করে বলেছেন যে, পরিহাস বলতে অন্তরে প্রীতিযুক্ত অন্যের পরাজয়সূচক বাক্য, তা নিন্দাব্যঞ্জক নয়। নিন্দাগর্ভ বাক্যকে উপহাস বলা যায়। অতএব ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে যে হরিনাম গ্রহণ করা হয়, তাই পরিহাস নামাভাস। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ বলে, "হে পতিতপাবন জগন্নাথ, তোমাকে তো আমি পতিতপাবন বলছি; কিন্তু কৈ আমার মতো পতিতকে তো তুমি পাবন করতে পারলে না! তুমি কেমন পতিতপাবন?" এস্থলে পরিহাস করেই জগন্নাথের নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এর দ্বারা নামাভাস হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন বন্ধ করার জন্য নদীয়ার চাঁদকাজি যে পেয়াদাকে পাঠিয়েছিলেন, সে ফিরে এসে তাকে বলেছিল–

ম্লেচ্ছ কহে, হিন্দুরে আমি করি পরিহাস। / কেহো কেহো কৃষ্ণদাস, কেহো রামদাস ॥
কেহো হরিদাস সদা বোলে 'হরি হরি'। / জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥

(চৈ. চ. আদি ১৭/১৯১-৯২)

অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে কেউ কৃষ্ণদাস, কেউ রামদাস, আবার কেউবা হরিদাস সবসময় সবাই হরি হরি বলছে। কিন্তু হরি অর্থ তো চুরি করা; তাই বোধ হয় তারা 'চুরি করব', 'চুরি করব' বলছে। কে জানে তারা কার ঘরের ধন চুরি করবে? এভাবে অন্যকে ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে হরিনাম উচ্চারণ করলে তাতে নামাভাস হয়।

৩. স্তোভ

স্তোভ শব্দের অর্থ (গৌড়ীয়-বৈষ্ণব অভিধান) গীতালাপপূরণ। কোনো গায়ক গান গাওয়ার সময় সুর ঠিক করার উদ্দেশ্যে 'হরি...ই...ই' বলে যে সুর তোলে, তাকে গীতালাপপূরণ বলে। এভাবে গীতালাপ-পূরণকালে যে হরিনাম উচ্চারণ হয়, তাকে স্তোভ নামাভাস বলে। মঞ্চে অভিনয়ের সময় যখন অভিনেতা ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তখনো স্তোভ নামাভাস হয়। যেমন : নারদ মুনির অভিনয় করে কেউ বলতে পারে– 'নারায়ণ, নারায়ণ'। আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে বিদ্বেষভাব নিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে ভর্ৎসনা করার সময় শিশুপালেরও যে এ নামাভাস হয়েছিল, তা শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– "*অঙ্গভঙ্গী চৈদ্য সম করে নামাভাস। স্তোভ মাত্র হয় তবু নাশে ভবপাশ ॥*" (চৈদ্য– চেদিরাজ শিশুপাল)

৪. হেলা

হেলা অর্থ অবহেলা, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। হেলার দ্বারা যত্নের অভাব বুঝতে হবে। অনেক সময় হাই তোলার সময় অথবা হঠাৎ পড়ে গেলে অনেকে 'হরি হরি' বলে। এক্ষেত্রে হেলায় বা বিনাযত্নে 'হরি' বলা হলো বুঝতে হবে। একে হেলা নামাভাস বলে। শাস্ত্রে আছে–

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলানাং
সকল-নিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

(স্কন্দপুরাণ, প্রভাস খণ্ড)

অর্থ : হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, মধুর থেকেও সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হোক বা হেলায় হোক একবার মাত্র উচ্চারণ করলেও কৃষ্ণনাম যেকোনো মানুষকে ত্রাণ করবে।

শ্রদ্ধা ও হেলা নামাভাসের মধ্যে পার্থক্য : নামকারী যখন শ্রদ্ধার সাথে নাম গ্রহণ করে; কিন্তু অনর্থ থাকে, তখন শ্রদ্ধা নামাভাস হয়। আর যখন শ্রদ্ধাকে পরিহার করে কেবল হেলাভরে নাম গ্রহণ করা হয়, তখন হেলা নামাভাস হয়।

নামাভাস ও নামাপরাধের মধ্যে পার্থক্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জৈবধর্ম গ্রন্থে নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন : শুদ্ধনাম না হলেই নামাভাস হলো; এ নামাভাসই কোনো অবস্থায় 'নামাভাস' এবং কোনো অবস্থায় নামাপরাধ বলে উক্ত হয়। যেস্থলে অজ্ঞতাবশত অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদবশত নামের অশুদ্ধ লক্ষণ অভিব্যক্ত হয়, সেস্থলে কেবল নামাভাস হয়; আর যেস্থলে মায়াবাদজনিত ধূর্ততা, মুমুক্ষা ও ভোগবাঞ্ছা থেকে অশুদ্ধ নামের উদয় হয়, সেস্থলে নামাপরাধ হয়। দশবিধ নামাপরাধ যদি সরল অজ্ঞতা থেকে হয়ে থাকে, তবে তা-ই নামাভাস। তবে জানতে হবে যে, নামাভাসে যতদিন অপরাধলক্ষণ প্রকাশ না পায়, ততদিন নামাভাস বিদূরিত হয়ে শুদ্ধনাম উদয়ের আশা থাকে, কিন্তু অপরাধ থাকলে সহজে শুদ্ধ নামোদয় হয় না।

মায়াবাদই অপরাধ

শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, মায়াবাদ ও ভক্তি পরস্পর বিপরীত এবং মায়াবাদই অপরাধ। কেন মায়াবাদ অপরাধ? কারণ তা ভক্তিকে অনিত্য বলে; কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকেও মিথ্যা ও নশ্বর বলে। গ্রন্থের ভাষায়–

ভক্তিবৈরী মধ্যে মায়াবাদের গণন। / অতএব মায়াবাদী অপরাধী হন ॥
মায়াবাদিমুখে নাম নাহি বাহিরায়। / নাম বাহিরায়, তবু নামতত্ত্ব না পায় ॥
মায়াবাদী যদি করে নাম উচ্চারণ। / নামকে অনিত্য বলি লভয়ে পতন ॥
কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণদাস্য জীবের স্বভাব। / মায়াবাদ অনিত্য কল্পিত বলে সব ॥
হেন মায়াবাদ নাম-অপরাধে গণি। / মায়াবাদ হয় সর্ব বিপদের খনি ॥

এজন্য মায়াবাদীরা কখনো নিত্যসুখ পায় না–

মায়ায় মোহিত জন তাহে সুখ মানে। / সুখাভাস মাত্র সাযুজ্য নির্বাণে ॥
সচ্চিৎ আনন্দ সেবা পরম নির্বৃত্তি। / সাযুজ্যে না পায় কভু হতকৃষ্ণস্মৃতি ॥
যাঁহা নাহি ভক্তি, প্রেম, নিত্যতা বিশ্বাস। / নিত্যসুখ কৈছে তাহে হইবে প্রকাশ ॥

মায়াবাদীর অপরাধ কখন ছাড়ে?

তবে যদি মায়াবাদী ভুক্তি-মুক্তি আশ। / ছাড়িয়া করয়ে নাম হয়ে কৃষ্ণদাস ॥
তবে তার ছাড়ে মায়াবাদ দুষ্টমত। / অনুতাপ সহ হয় নামে অনুগত ॥
সাধুসঙ্গে করে পুনঃ শ্রবণ কীর্তন। / সুসম্বন্ধ জ্ঞান তবে উদয়ে ততক্ষণ ॥
অবিশ্রান্ত নাম করে, পড়ে চক্ষুজল। / নামকৃপা পায়, চিত্ত হয়ত' সরল ॥

ভক্তের জন্য মায়াবাদীর সঙ্গ পরিত্যাগ করার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা–

মায়াবাদী-সঙ্গ তেঁহ সতর্কে ছাড়িয়া। / শুদ্ধনামপরায়ণে তুষিবে সেবিয়া ॥ (তুষিবে– তুষ্ট করবে)
এইতো তোমার আজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। / সেই আজ্ঞা যেই পালে, সেই জীব ধন্য ॥
যে না পালে তব আজ্ঞা, সেই জীব ছার। / কোটি জন্মে কিছুতেই না হবে উদ্ধার ॥

অপরাধশূন্য হয়ে যেকোনোভাবে হরিনাম গ্রহণ করলেই নামাভাস হয়

প্রশ্ন হতে পারে, যদি কোনো বস্তুকে সঙ্কেত করে বা ভর্ৎসনা করে ভগবানের নাম উচ্চারণ করলে সংসারমুক্তি হয়, তবে সংসারের অধিকাংশ লোক তো নামাভাস করছে। তাদের মুক্তিলাভ হয় না কেন? এর উত্তর হলো : পূর্বের অপরাধ থাকলে নামাভাসের ফল লাভ হবে না। **নামাপরাধের মধ্যে নামে অর্থবাদ কল্পনা এবং নামপরায়ণ সাধুর প্রতি অনাদর সর্বাপেক্ষা গুরুতর**। এমন অপরাধ থাকলে নামপ্রভুর অপ্রসন্নতার কারণে নামাভাসের ফল লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং, অপরাধশূন্যতাই নামাভাসের ফল লাভের একমাত্র কারণ জানতে হবে। অপরাধ থাকলে কস্মিনকালেও নামাভাসের ফল লাভ হবে না। অজামিলের পূর্ব নামাপরাধ না থাকায় পুত্রকে লক্ষ্য করে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করায় নামাভাস হয়েছিল।

নামাভাস ও ভক্ত্যাভাস

হরিনাম কীর্তনকে ভক্তির অঙ্গ বলা হলেও তা সকল ভক্ত্যঙ্গের অঙ্গী বা মূল। সুতরাং নামাভাস ও ভক্ত্যাভাসের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভক্ত্যাভাসে ভক্তির বাহ্য আকার থাকার সাথে সাথে তা শ্রীবিষ্ণুর সাথে সম্পর্কিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু নামাভাসে তা না হলেও হয়।

এ প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুধর্ম নামক শাস্ত্রে বর্ণিত ইঁদুরের গল্পটি উল্লেখযোগ্য : এক ইঁদুর প্রতিদিন বিষ্ণুমন্দিরে প্রদত্ত প্রদীপের তেল ভক্ষণ করত। দৈবাৎ একদিন ওই জ্বলন্ত প্রদীপের তেল খাওয়ার সময় হঠাৎ করে সলতে জ্বলে উঠল এবং সে আগুনে ইঁদুরের মুখ পুড়ে যাওয়ায় সেখানেই সে মারা গেল। এর মাধ্যমে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে দীপদানরূপ ভক্ত্যাভাস হওয়ায় সে পরজন্মে রাজমহিষীত্ব লাভ করল এবং দীপদান আদি মুখ্য ভক্তিতে একনিষ্ঠ হয়ে বৈকুণ্ঠগতি লাভ করল। এক্ষেত্রে ইঁদুরের দীপদানরূপ ভক্ত্যঙ্গ সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুর সামনে হয়েছিল বলেই তা ভক্ত্যাভাসে পরিণত হয়েছে। এ কাজই যদি অন্য কোনো স্থানে হতো, তবে ভক্ত্যাভাস হতো না। তবে প্রশ্ন হতে পারে, শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে অর্পিত প্রদীপের তেল ভক্ষণ করা তো অপরাধ, তা সত্ত্বেও ইঁদুরের ভক্ত্যাভাস হলো কীভাবে? উত্তর হলো, ইঁদুর জেনে শুনে এমন অপরাধ করেনি। পশু হওয়ায় সে অপরাধের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তাই তার এ কর্ম অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে তেল খেতে গিয়ে সলতে ধরে টানলে হঠাৎ করে তা জ্বলে ওঠায় বরং দীপদানরূপ ভক্ত্যাভাস হয়েছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ লিখেছেন– "মূঢ় ও অসমর্থ ব্যক্তির প্রতি দীনদয়াল ভগবানের কৃপা অধিক প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং অল্প সাধনেও তার সিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে।" (ভ. স. ১৫৯)

কিন্তু নামাভাসে কেবল নামের আকার থাকলেই হয়। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে না হয়ে যেকোনো বস্তুকে লক্ষ্য করে উচ্চারিত হলেও নামাভাস হওয়ার ফলে মুক্তিলাভ পর্যন্ত হয়ে থাকে। নামাভাস ও ভক্ত্যাভাসের মধ্যে পার্থক্য এটিই।

এস্থলে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, একমাত্র শ্রীভগবানই শক্তিমান তত্ত্ব, অন্য সবকিছুই তাঁর শক্তি। শক্তির নাম বা অন্য যেকোনো শব্দ যদি শক্তিমানের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়, তা হরিনামের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে ভগবৎস্মরণ হেতু মঙ্গল হয়ে থাকে। পরমেশ্বরের নাম কেবল পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যেই নয়, অন্য প্রাকৃত বা মায়িক বস্তুর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলেও নামাভাস হয়– তার প্রসিদ্ধ অর্থ সম্পূর্ণ না জেনে, প্রাকৃত বস্তুকে নির্দেশ করে অথবা প্রাকৃত অপ্রাকৃত কোনো বিষয়ের কথা না ভেবে অনিচ্ছাক্রমে বা অবশচিত্তে, অর্থহীনভাবে গৃহীত হলেও তা থেকে জীবের পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হয়ে থাকে।

নামাভাসের ফল

ভগবানের নাম ভগবানের মতোই অপ্রাকৃত-চিন্ময় বলে তা যে বস্তুতেই প্রয়োগ করা হোক না কেন, তার মহিমা ক্ষুণ্ন হয় না। বহুমূল্য রত্নকে যেমন যে স্থানেই রাখা হোক না কেন, তার মূল্য কমে না। ভস্মস্তূপে থাকলেও তার মূল্য কিছুমাত্র কমে না। তদ্রূপ কেবল অপরাধ না হলে অর্থাৎ নামপ্রভু নিজে অপ্রসন্ন না হলে যেকোনোভাবে নামাভাস

হলেও নামের শক্তি প্রকাশিত হয়। এজন্য নামাভাসের মহিমাও অসাধারণ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে– "*যদ্যপি অন্যসঙ্কেতে অন্য হয় 'নামাভাস'। তথাপি নামের তেজ নাম হয় বিনাশ ॥*" (৩/৩/৫৪)

নামাভাস জীবের প্রধান সুকৃতি বলে গণ্য হয়। ধর্ম, ব্রত, যোগ, যজ্ঞ ইত্যাদি সমস্ত প্রকার শুভকর্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠ। নামাভাসেই জীবের সব ধরনের পাপ বিনষ্ট হয়ে মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/২/১৪) উল্লেখ করা হয়েছে–

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥

অর্থ : অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করেই হোক, পরিহাসছলেই হোক, সংগীত-বিনোদনের জন্যই হোক অথবা অশ্রদ্ধার সঙ্গেই হোক, ভগবানের নাম করার ফলে তৎক্ষণাৎ অশেষ পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রতত্ত্ববিদ মহাজনগণ সেকথা স্বীকার করেছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অশেষ পাপ বলতে বুঝিয়েছেন যে, পূর্বে যে পাপ করা হয়েছে, বর্তমানে যে পাপ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যে পাপ করা হবে, সমস্তই ভগবানের নামের আভাসেই নির্মূল হয়ে যাবে। অর্থাৎ পাপ, পাপবীজ ও পাপবাসনা সবই দূরীভূত হয়ে যাবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর জৈবধর্ম নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, নামাভাসেই পূর্বপাপ ক্ষয় হয় এবং নতুন পাপে রুচি জন্মে না। কিন্তু পূর্ব অভ্যাসক্রমে কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে, যা নামাভাসে ক্রমশ ক্ষয় পেতে থাকে। কদাচিৎ কোনো পাপ হয়ে পড়লে তা-ও নামাভাসে দূর হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

নামাভাস হৈতে সব পাপ ক্ষয় হয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব শাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তার অজামিল সাক্ষী ॥ *(অন্ত্য. ৩/৬১,৬৪)*

সুতরাং নামাভাসের গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফল : **১. পাপনাশ** (শুভ-অশুভ কর্মবীজ নাশ),
২. সংসারক্ষয় (অবিদ্যা নাশ),
মুখ্যফল : **৩. মুক্তি** (মোক্ষ)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও উল্লেখ আছে–

হরিদাস কহে যৈছে সূর্যের উদয়। / উদয় না হৈতে আরম্ভে তম হয় ক্ষয় ॥
চৌর, প্রেত, রাক্ষসাদি ভয় হয় নাশ। / উদয় হইলে ধর্ম, কর্ম, মঙ্গল প্রকাশ ॥
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়। / উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে। / সেই মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥
(চৈ. চ. অন্ত্য ৩/১৭৬-১৭৭, ১৮২-১৮৫)

শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থের আলোকে নিচে নামাভাসের ফলসমূহ ক্রমান্বয়ে তুলে ধরা হলো :

১. বিশ্বাস : নামাভাসের প্রাথমিক ফল জীবের মধ্যে হরিনামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন; যার দ্বারা যথাসময়ে জীব পূর্ণরূপে ভগবৎসেবা শুরু করে।

২. পাপকর্মের ফল নাশ : নামাভাস জীবের সব ধরনের পাপ নাশ করে। এক্ষেত্রে এর তুলনা ব্রত, তপস্যা,

যজ্ঞ, দান আদি কোনো শুভকর্মই কখনো হতে পারে না।

৩. কলির প্রভাব নাশ : নামাভাসেই কলহপূর্ণ কলিযুগের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়, এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই।

৪. মুক্তিলাভ : জ্ঞানযোগের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ জ্ঞানযোগীদের কাছে অতি কঠিন হলেও, নামাভাসে তা অনায়াসেই লাভ করা যায়।

৫. সর্বরোগের নিরাময় হয় : নামাভাসের ফলে সর্বরোগের নিরাময় হয়ে থাকে।

৬. সমস্ত শঙ্কা ও ভয় দূর করে শান্তি নিয়ে আসে : শান্তি লাভই জগতের জীবের সর্বোত্তম লক্ষ্য। জগতের অন্যসব পন্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও কেবল হরিনামের আভাসেই সকল আশঙ্কা ও ভয় দূরীভূত হয়ে পরম শান্তি লাভ হবে।

৭. ভূত-প্রেত, দানব-পিশাচসহ গ্রহের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি : ভূত-প্রেত, দানব-পিশাচ ও গ্রহের কুপ্রভাব দূর করার জন্য নামাভাসই অদ্বিতীয় উপায়।

৮. অনর্থ নাশ ও চতুর্বর্গ লাভ : নামাভাসেই জীবের সমূহ অনর্থ নাশ এবং চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়ে থাকে।

৯. প্রারব্ধ কর্ম নাশ ও নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি : নামাভাস হলেই জীবের প্রারব্ধ কর্ম নাশের পাশাপাশি নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ হয়।

১০. দিব্যানন্দ লাভ : এমনকি নামাভাসেই জীব বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়ে দিব্যানন্দ লাভ করতে পারে।

গ্রন্থের ভাষায়–

নামাভাস-দশাতেও অনেক মঙ্গল। / জীবের অবশ্য হয় সুকৃতি প্রবল ॥
নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত। / নামাভাসে মুক্তি হয়, কলি হয় হত ॥
নামাভাসে নর হয় সুপংক্তি-পাবন। / নামাভাসে সর্বরোগ হয় নিবারণ ॥
সকল আশঙ্কা নামাভাসে দূর হয়। / নামাভাসী সর্বরিষ্ট হৈতে শান্তি পায় ॥
যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, গ্রহসমুদয়। / নামাভাসে সকল অনর্থ দূরে যায় ॥
নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তি পায়। / সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম নামাভাসে যায় ॥
সর্ববেদাধিক সর্ব তীর্থ হইতে বড়। / নামাভাস– সর্বশুভকর্ম-শ্রেষ্ঠতর ॥
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গদাতা। / সর্বশক্তি ধরে নামাভাস জীবত্রাতা ॥
জগৎ আনন্দকর শ্রেষ্ঠপদপ্রদ। / অগতির এক গতি সর্বশ্রেষ্ঠপদ ॥
বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি নামাভাসে হয়। / বিশেষত কলিযুগে সর্বশাস্ত্র কয় ॥

নামাভাস বেদধ্যয়ন, তীর্থভ্রমণের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ; নামাভাসই প্রধান সুকৃতি এবং শুভকর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ লিখেছেন–

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥

অনুবাদ : হে গুণনিধি, তুমি পরম পাবন উত্তমশ্লোক শিরভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে সশ্রদ্ধচিত্তে অতি শীঘ্র সরলভাবে ভজনা করো; কেননা তাঁর নামরূপ সূর্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হলে মহাপাতকরূপ অন্ধকার রাশিকে বিনষ্ট করে।

কিন্তু সাধু সাবধান– যদি নামাপরাধ হয়, তবে কখনোই নামাভাসের ফল কেউ লাভ করতে পারবে না। নামাপরাধের

স্তর অতিক্রম করার পরই নামাভাসের স্তরে উপনীত হতে হয় এবং আনন্দের কথা হলো নামাভাসের স্তরে উপনীত হওয়ার পরও যদি হরিনাম জপ-কীর্তন চালিয়ে যাওয়া যায়, তবে শুদ্ধনাম কীর্তনের সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়।

নাম ও নামাভাসের ফলভেদ

শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে উল্লেখ আছে–

এক কৃষ্ণনাম যদি মুখে বাহিরায়। / অথবা শ্রবণ-পথে অন্তরেতে যায় ॥
শুদ্ধ বর্ণ হয় বা অশুদ্ধ বর্ণ হয়। / তাতে জীব তরে, এই শাস্ত্রের নির্ণয় ॥
কিন্তু এক কথা ইথে আছে সুনিশ্চিত। / নামাভাস হইতে বিলম্বে হয় হিত ॥
নামাভাসে পাপক্ষয়ে শুদ্ধ নাম হয়। / তখনই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লভয়ে নিশ্চয় ॥

স্মরণ রাখার জন্য নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরা হলো :

১. পূর্ণ নামাভাসের ফল

আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফল : ক. পাপক্ষয়, খ. সংসারক্ষয়

মুখ্যফল : ক. মুক্তি

(একাধিক নামাভাস এক নামাভাসেরই কার্য হয়ে থাকে)

১. শুদ্ধনাম আরম্ভের ফল

আনুষঙ্গিক বা গৌণফল : ক. পাপক্ষয়, খ. সংসারক্ষয় ও গ. মুক্তি

২. যৎকিঞ্চিৎ উদয়ের ফলে ক. প্রেম

৩. নাম একবার সম্পূর্ণ উদয়ের ফল : ঐ

(একাধিক শুদ্ধ নামোদয় এক বা কিঞ্চিৎ নামোদয়েরই কার্য হয়ে থাকে)

অনর্থ যত নষ্ট হয়, ততই নামাভাসত্ব দূর হয়ে নামসূর্য প্রকাশিত হয়

সর্বপাপ ও অনর্থ দূর হলে ভক্তের জিহ্বায় শুদ্ধনাম প্রকাশিত হয়। তখন শুদ্ধনাম তাঁকে কৃষ্ণপ্রেম দান করে। তাই হরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ

নামাভাস ভেদি শুদ্ধনাম লভিবারে। / সদ্‌গুরু সেবিবে জীব যত্ন সহকারে ॥
ভজনে অনর্থ নাশ যেই ক্ষণে পায়। / চিৎস্বরূপ নাম নাচে ভক্তের জিহ্বায় ॥
নাম সে অমৃত ধারা নাহি ছাড়ে আর। / নামরসে মত্ত জীব নাচে অনিবার ॥
নাম নাচে, জীব নাচে, নাচে প্রেমধন। / জগৎ নাচায়, মায়া করে পলায়ন ॥

নামাভাসের দৃষ্টান্ত

১. অজামিলের নামাভাস

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত অজামিলের ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে নামাভাসের সর্বপাপনাশকত্ব ও মুক্তিদায়কত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অজামিল প্রথমে সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণই ছিলেন। কিন্তু পরে এক বেশ্যার মোহে পতিত হয়ে পিতা-মাতাসহ সতীসাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে বেশ্যাকে নিয়ে ঘর করতে লাগলেন। বেশ্যা স্ত্রীর সন্তান ও কুটুম্বভরণের জন্য অজামিল সব ধরনের অসদুপায় ও পাপকর্মের মাধ্যমে অর্থোপার্জনে রত হয়ে মহাপাপিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। সেই স্ত্রীর কয়েক সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠটির নাম ছিল নারায়ণ, যার প্রতি অজামিল অত্যন্ত স্নেহাসক্ত ছিলেন। ওর স্নানসহ খাওয়ানো-পরানোর সব কাজ তিনি নিজেই করতেন। বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় কিছুদিনের মধ্যে অজামিলের মৃত্যুকাল

উপস্থিত হলো। নারায়ণ তখন খেলার সাথীদের নিয়ে খেলায় মগ্ন। এদিকে তিনজন ভয়ানক যমদূত এসে সামনে উপস্থিত হলে তাদের দেখে অজামিল ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উচ্চৈঃস্বরে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলে তার খেলায় নিমগ্ন পুত্রকে ডাকতে লাগলেন।

ম্রিয়মাণ অজামিলের মুখে 'নারায়ণ' উচ্চারণ শুনে তৎক্ষণাৎ চার বিষ্ণুদূত এসে যমদূতদের বাধা দিতে লাগলেন। তারপর ধর্ম ও শাস্ত্রবিচার দ্বারা তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, অজামিল অসংখ্য পাপ করে মহাপাপিষ্ঠ হলেও 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করায় তার কোটিজন্মসঞ্চিত সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। তারপর যমদূতদের বন্ধন থেকে অজামিলকে মুক্ত করে বিষ্ণুদূতগণ অন্তর্হিত হলেন।

ভগবানকে নয়, পুত্রকে উদ্দেশ্য করেই 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করার ফলে অজামিলের সাঙ্কেত্য নামাভাস হয়েছিল। তারপর বিষ্ণু ও যমদূতগণের মুখে ভাগবতধর্মের কথা শুনে অজামিল ভগবানের প্রতি ভক্তিমান হয়েছিলেন এবং পূর্বকৃত দুষ্কর্মের জন্য অনুতাপগ্রস্ত হয়েছিলেন। এরপর সংসারমুক্ত হয়ে ভগবৎপার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন হতে পারে, নামাভাসে অজামিলের মুক্তি ও পার্ষদত্ব লাভ হলে, যেকোনো নামকারীর পক্ষে তা সম্ভব হবে কিনা? উত্তর হলো, সবক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে, কারণ অজামিলের কোনো অপরাধ ছিল না; তিনি তার পুত্রকে নারায়ণ বলেও মনে করেননি। তাই জীবে ঈশ্বরজ্ঞানজনিত অপরাধও তার হয়নি। সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছিলেন বলেই তার মুক্তি লাভ হয়েছিল। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উক্তি অনুসারে পূর্বসঞ্চিত অপরাধের কারণেই মানুষ জীবে ঈশ্বরজ্ঞান করে, তার ফলে পুনরায় নতুন অপরাধ সঞ্চিত হয়, যা বার বার নামাভাসে কখনো দূর হতে পারে না; কেবল একান্তভাবে হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করলেই নামের কৃপায় অপরাধ দূরীভূত হতে পারে।

২. যবনের নামাভাস

যবনদের কাছে শূকর নিষিদ্ধ হওয়ায় তাদের ভাষায় শূকরকে 'হারাম' বলা হয়। এক যবন একবার মল ত্যাগের সময় শূকরের দ্বারা আক্রান্ত হলে উদ্ধার লাভের জন্য 'হারাম' 'হারাম' বলে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শূকরের দাঁতের দ্বারা আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করার সময় 'হারাম' উচ্চারণের দ্বারা সাঙ্কেত্য নামাভাস হওয়ায় সে মুক্তিলাভ করেছিল। কারণ 'হারাম' উচ্চারণের ফলে 'রাম' নাম উচ্চারণ হওয়ায় তার নামাভাস হয়েছিল। যেহেতু ভগবানের নাম সর্বাবস্থায় তার স্বরূপগত ধর্ম প্রকাশ করে। ঠিক যেমন, অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত জল অগ্নিনির্বাপণ করে থাকে।

নামগ্রহণ বিচার

এ জড়জগতে সবকিছুই মায়াজাত, জড়ময়। জীব কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে এখানে বদ্ধ হয়েছে। জীবই জড়জগতের একমাত্র চিন্ময় বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ নামরূপে অবতীর্ণ হয়ে এ জগতে দ্বিতীয় চিন্ময় বস্তু প্রকাশ করেছেন। অতএব এ

জগতে দুটি মাত্র চিৎতত্ত্ব– জীব ও কৃষ্ণনাম।

পরমেশ্বর ভগবানের মুখ্য ও গৌণ নাম সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন উভয় প্রকার নামের ফল বিচার করা হলো : পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা প্রকাশক– গোবিন্দ, গোপাল, শ্রীনন্দনন্দন, রাধানাথ, হরি শ্যামসুন্দর, মাধব, গোপীনাথ ইত্যাদি মুখ্য নামসমূহ কীর্তন করলে জীব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে। আর জড়া প্রকৃতির পরিচয়জ্ঞাপক– সৃষ্টিকর্তা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, জগৎসংহর্তা ইত্যাদি গৌণ নামসমূহ কীর্তন করলে জীব পুণ্য ও মোক্ষ লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য নামই কেবল প্রেমদানে সমর্থ; গৌণনামে কখনোই প্রেম লাভ সম্ভব নয়।

শ্রীভগবৎবাচক নিত্যসিদ্ধ নামসমূহের তিন প্রকার ব্যবহার রয়েছে; যথা :

১. ভজনের অভিপ্রায় নিয়ে অনুকূলভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীনাম গ্রহণ : অর্থাৎ ভয়, দুঃখ ও বিপদাদি থেকে পরিত্রাণের জন্য আর্তভাবে, সংসার থেকে মুক্তিকামনায় অথবা অহৈতুকী প্রেমভক্তি লাভের ইচ্ছায় যদি কোনো ব্যক্তি সকাতরে হে কৃষ্ণ, হে হরে, হে গৌরাঙ্গ, হে গোবিন্দ, হে মথুরানাথ, হে রাম প্রভৃতি মুখ্য নাম ঐকান্তিকতার সাথে গ্রহণ করেন, তবে এর ফল সম্বন্ধে শাস্ত্র বলছে–

মম নামানি লোকেহস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্তয়েৎ।
তস্যপরাধকোটিস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥

(হ. ভ. বি. ১১/১৭৯)

অর্থ : এ সংসারে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে ব্যক্তি আমার নামসমূহ কীর্তন করেন, তার সেবা ও নাম বিষয়ক কোটি কোটি অপরাধ আমি ক্ষমা করে থাকি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভগবান নিজেই এ কথা বলেছেন।

২. ভজনের অভিপ্রায়ে কিংবা অনুকূল বা প্রতিকূল কোনোভাবে নয়, শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধার সাথেও নয়, কেবল বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে নিরপেক্ষভাবে নামগ্রহণ; যেমন : সেখানে হরেকৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গ নাম কীর্তন হয়, হিন্দুরা পত্রের শিরোদেশে 'শ্রীহরি', 'শ্রীরাম', ইত্যাদি লেখে থাকেন। কথা প্রসঙ্গে, অভিনয়ে, গীতে– যেমন : 'তোরা তো খুব হরিনাম আওরাতে লেগে গেছিস।' এমন সব বিষয়ে নামগ্রহণের ফল সম্বন্ধে শাস্ত্র বলছে–

শ্রুতং সংকীর্তিতং বাপি হরেরাশ্চর্যকর্মণঃ।
দহত্যেনাংসি সর্বাণি প্রসঙ্গাৎ কিমু ভক্তিতঃ ॥

(হ. ভ. বি. ১১/২৫৫)

অর্থ : বিচিত্রকর্মা শ্রীহরির নাম কেবল কথা প্রসঙ্গে শ্রবণ বা কীর্তন করলে যখন সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে থাকে, তখন ভক্তি সহকারে সে নাম শ্রবণ-কীর্তনে যে কী ফল লাভ হয়, তা আর কী বলব।

এছাড়া যাঁরা শয়নে, ভোজনে, গমনে, উপবেশনে, দণ্ডায়মান অবস্থায় যারা মুখে হরি বলেন, তাদের সতত নমস্কার। সাঙ্কেত্য, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা নামাভাস সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ভজনের অভিপ্রায়ে নয়, প্রতিকূলভাবে উপহাস, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের সাথে ভগবানের নাম গ্রহণ যেমন : 'দেখি তোর হরিনাম তোকে এবার কীভাবে রক্ষা করে'– এমন উপহাস, 'হরিনাম শোনার আমার সময় নেই'– এমন অবজ্ঞা এবং 'এটা হরি হরি করার জায়গা নয়'– এমন বিদ্বেষ ভাব নিয়ে ভগবানের নাম গ্রহণ করলেও জীব কৃতার্থ হতে পারে। শাস্ত্রে আছে–

অপ্যন্যচিত্তঃক্রুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্তয়েদ্ধরিম্।
সোহপি বন্ধক্ষয়ান্মুক্তিং বশতঃ লভেচ্চেদিপতির্যথা ॥ (পাদ্মে)

অর্থ : ভয় ও বিদ্বেষবশত শ্রীভগবান চিত্তে স্ফুরিত হলে যেমন মুক্তিলাভ হয়, তেমনি ভগবান ও ভগবন্নাম অভিন্ন বলে বিদ্বেষবশত ক্রুদ্ধ হয়ে গালি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবন্নাম গ্রহণ করলেও মুক্তি লাভের কথা শাস্ত্রসিদ্ধ। চেদিরাজ শিশুপাল তার দৃষ্টান্ত।

ব্যবহিতরহিত, ব্যবহিত ও রহিত নামের ফল

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১১/২৮৯) পদ্মপুরাণ থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে–

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা।
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়েত্যেব সত্যম্ ॥

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর টীকা অনুযায়ী শ্লোকার্থ : ভগবানের একটি নাম যদি কারো মুখে উচ্চারিত হয়, অথবা স্মৃতিপথে উদিত হয় কিংবা শ্রুত হয়, তা সমূহ পাপ ও সংসার থেকে জীবকে উদ্ধার করে। সে নাম শুদ্ধবর্ণ হোক বা অশুদ্ধ (কৃষ্ণ স্থলে কেষ্ট); কিংবা যদি নামের অক্ষরগুলো ব্যবহিতরহিত হয়ে গৃহীত হয়, তবু নাম সেই ব্যক্তিকে সকল পাপ ও সংসার বন্ধন থেকে সত্যই পরিত্রাণ করে থাকে।

ব্যবহিতরহিত কথাটির যথাক্রমে তিনটি অর্থ টীকায় প্রকাশ করা হয়েছে; যথা :

(১) ব্যবহিতরহিত : একটি সম্পূর্ণ নাম যদি শব্দ বা অক্ষর দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত না হয়ে গৃহীত হয়। এটি বোঝার জন্য (২) **ব্যবহিত** শব্দের অর্থ বুঝতে হবে। এর অর্থ সম্পূর্ণ নাম যদি কোনো শব্দ বা অক্ষর দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হয়; যেমন : হলরিক্ত– 'হ' ও 'রি' = হরি নামের মধ্যে 'ল' ব্যবধান সৃষ্টি করেছে এবং রাজমহিষী শব্দে 'রা' ও 'ম' = রাম নামের মধ্যে 'জ' ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। এমন ব্যবধান না থাকলে সে নাম ব্যবহিতরহিত। আর (৩) **রহিত** শব্দের অর্থ হলো, একটি ভগবন্নামের কিছু অংশ গ্রহণ করার পর যদি বাকি অংশ আর কোনো কারণে গৃহীত নাও হয়। যেমন নারায়ণ বলার অভিপ্রায়ে নারায় বা নারা বলার পর যদি বাকি অংশ গ্রহণ নাও হয়ে থাকে; তবু নিখিল পাপ ও সংসার বন্ধন থেকে পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে–

"*নামের অক্ষর সভের এই ত স্বভাব। / ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব ॥*"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে তত্ত্বব্যবধানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন– "তত্ত্বব্যবধান অতিশয় দুষ্ট। বস্তুত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামে কোনো ভেদ নেই। যদি কেউ মায়াবাদ গ্রহণপূর্বক কৃষ্ণনামকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক কল্পনা করে, তবে তত্ত্বব্যবধান হয়। তাতে তার সর্বনাশ হয়– "*তত্ত্বব্যবধান মায়াবাদ দুষ্টমত। কলির জঞ্জাল এই শাস্ত্র-অসম্মত ॥*"

শ্রদ্ধাই শুদ্ধনাম গ্রহণের যোগ্যতা– দেশ-কাল-অশৌচাদির বাধা নেই

দান, যজ্ঞাদি কর্মে দেশ, কাল, পাত্র শুদ্ধ-অশুদ্ধির বিচারে অধিকার জন্মে। কিন্তু কৃষ্ণনাম কীর্তনে শ্রদ্ধাই একমাত্র অধিকার, অন্য কোনো বিচার নেই। শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে আছে–

নামে অধিকার নরমাত্রে কৈলে দান। / সর্বশক্তি নামে প্রভু করিলে বিধান ॥
যার শ্রদ্ধা হয় নামে, সেই অধিকারী। / যার মুখে কৃষ্ণনাম সেই সে আচারী ॥
দেশ কাল অশৌচাদির নিয়ম সকল। / শ্রীনাম-গ্রহণে নাই, নাম সে প্রবল ॥
দানে, যজ্ঞে, স্নানে, জপে আছে ত বিচার। / কৃষ্ণ সংকীর্তনে মাত্র শ্রদ্ধা অধিকার ॥

হরিভক্তিবিলাসে আছে–

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥ (১১/২০৪)

অর্থ : হে লুব্ধক, শ্রীহরির নামগ্রহণে দেশ ও কালের নিয়ম নেই, এমনকি উচ্ছিষ্ট মুখে নামগ্রহণেও কোনো নিষেধ নেই।

নো দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।

কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদ্ ॥ (১১/২০৪)
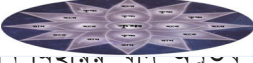
অর্থ : এই ভগবানের নাম গ্রহণে দেশ, কাল কিংবা অবস্থা বিষয়ে শুদ্ধাদির কোনো অপেক্ষা নেই; তা স্বতন্ত্র এবং সর্বাভীষ্টপ্রদ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও একই কথা বলা হয়েছে– "*খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। / দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥*" (৩/২০/১৪) আবার সর্বক্ষণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অবসন্নতা ও আলস্যবশত যদি নামকীর্তনে অসমর্থ হয়, তবে তা শ্রবণেও মানুষ উদ্ধার লাভ করবে। এমনকি যদি শ্রবণেরও সুযোগ না ঘটে, তবে হরিনাম মনে মনে স্মরণ করলেও সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে (*নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা*"– *পাদ্মে*)

সতরাং জগতে এমন পরম কৃপাময় শ্রীহরিনাম থাকতে কারো পক্ষে কোনোভাবেই হতাশ হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শ্রীনামের অব্যর্থ ফলোদয়ের ব্যতিক্রম কেবল নামাপরাধ অর্থাৎ শ্রীনামের অপ্রসন্নতা সংঘটন।

পাপী ও অপরাধীর দ্বারা উচ্চারিত হরিনামও অপ্রাকৃত

হরিনাম শ্রীহরি থেকে অভিন্ন এবং শ্রীহরির সমস্ত শক্তি তাতে অর্পিত হয়েছে। তাই কোনো অসৎ ব্যক্তির প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত নাম কখনোই প্রাকৃত হয়ে যায় না। অপবিত্র বস্তুতে আগুন ধরিয়ে দিলে যেমন আগুন অপবিত্র না হয়ে দহনের দ্বারা অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র করে, তেমনি অসদাচারী ও নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তির জিহ্বায় উচ্চারিত হরিনাম পাপাদি দূর করে তাকে শুদ্ধ করে তোলে। অজামিল তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যদিও অজামিলের কেবল নামাভাস হয়েছিল। সুতরাং তা হরিনামেরই অলৌকিক শক্তি বা মহিমা। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীতে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকে বলেছিলেন– "*নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ– তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দস্বরূপ ॥*" (চৈ. চ. মধ্য ১৭/১২৭)

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি তাই হয়, তবে সরাগবক্তার হরিকথা শুনলে মঙ্গল হবে না বলে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কেন বলা হলো? "সরাগো লোলুপঃকামী তদুক্তং হৃন্ন সংস্পৃশেৎ।" (ভ. স. ২০৩ অনু.) এর উত্তর হলো : সরাগবক্তার হৃদয় সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তার উচ্চারিত হরিনাম বা হরিকথাও ত্রিগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। এর ফলে সে নিজে হরিনামামৃত [illegible] য় এবং শ্রোতাকেও তা আস্বাদন বা অনুভব করাতে পারে না। পিত্তদোষযুক্ত জিহ্বা যেমন মিছরির স্বাদ অনুভব করতে পারে না, সেরূপ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে সূর্যের আলোকদান ও উত্তাপদানের প্রভাব অনুভূত হয় না। তাই বলে কি বলা যাবে যে, সূর্যের অস্তিত্ব নেই অথবা সূর্যের আলোকদান ও উত্তাপদানের ক্ষমতা নেই? না, সূর্য, সূর্যালোক ও সূর্যের উত্তাপ অবশ্যই আছে; কেবল প্রতিবন্ধক মেঘের জন্য তা অনুভূত হচ্ছে না। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়, অন্ধকার ঘরে কোনো আলোককে যদি একটি লোহার বাক্সে আবদ্ধ রাখা হয়, তবে আলোক থাকলেও ঘরে অন্ধকার থাকবেই। কিন্তু বাক্সের আবরণ সরানো মাত্র আলোকের গুণ প্রকাশ পাবে। আর এ কাজটা করতেও হবে অন্ধকারের মধ্যে থেকেই। একইভাবে পিত্তদোষযুক্ত অবস্থায় বার বার মিছরি আস্বাদন করলে পিত্তদোষ দূর হয়ে মিছরির স্বাদ অনুভব হবে। তদ্রূপ মায়াগ্রস্ত জীব যে ভূমিকাতেই থাকুক না কেন, তা থেকেই তাকে ভক্তি অনুশীলন আরম্ভ করতে হবে। গুণবদ্ধ অবস্থায় তার ভক্তি ত্রিগুণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে বলে সে অবস্থার ভক্তিকে গুণযুক্ত ভক্তি (তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী) বলা হয়। প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হরিনাম স্বরূপত অপ্রাকৃত হলেও উচ্চারণকারীর গুণবদ্ধ অবস্থার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় স্বরূপ অনুভূতির বিষয় হয় না। কিন্তু শ্রদ্ধা সহকারে বার বার হরিনাম শ্রবণ-কীর্তন করলে উক্ত গুণবদ্ধ অবস্থা দূর হয়ে হরিনামের মাহাত্ম্য উপলব্ধির সাথে সাথে তা আস্বাদনীয় হয়ে ওঠে। কীর্তনকারীর অনুভূতির তারতম্য অনুসারে শ্রোতার মঙ্গলের তারতম্য হয়ে থাকে। যিনি ভগবানের সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে হরিনাম কীর্তন করেন, অথচ

গুণের প্রভাব এখনও দূর হয়নি, তাঁর কীর্তিত হরিনাম ও হরিকথা শ্রবণ করলে যতটুকু মঙ্গল হবে, তার চেয়ে অধিক মঙ্গল হবে কোনো নির্গুণ ব্যক্তির হরিনাম বা হরিকথা শ্রবণের দ্বারা। আর যিনি মহৎ বা ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, তাঁর হরিকথা শ্রবণমাত্রই যে তৎক্ষণাৎ মঙ্গল হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ তিনি নিরাগ বা বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত ও চিদনুভববিশিষ্ট হওয়ায় শ্রদ্ধালু শ্রোতার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করে তাকে শ্রবণযোগ্যতা দিয়ে থাকেন। তাই শ্রোতা তাঁর কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে অনুভবও করতে পারে। এজন্য ভাগবতে শ্রীনারদ মুনি প্রাচীনবর্হিকে বলেছেন–

তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্রপীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥

(ভা. ৪/২৯/৪১)

অর্থ : হে রাজন, মহৎগণের শ্রীমুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথামৃত যাঁরা অভিনিবিষ্ট কর্ণের দ্বারা পান করেন, তাঁদের ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক ও মোহ স্পর্শ করতে পারে না।

নামোদয়-ভূমিকা

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর হরিনামের উদয় সম্বন্ধে বলেছেন–

হরিদাস কহে– যৈছে সূর্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥

চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম-কর্ম-মঙ্গল প্রকাশ ॥
*তৈছে **নামোদয়ারম্ভে** পাপাদির ক্ষয়।*
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥

(চৈ. চ. অন্ত্য ৩/১৭৩-৭৫)

হরিনামকে সূর্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সূর্যোদয়ের আরম্ভের পূর্বে অরুণোদয়েই সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং চোর, দস্যু ও ভূতপ্রেতাদির ভয় থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। তদ্রূপ নামসূর্যের উদয়ারম্ভ হতেই পাপাদির ক্ষয়সহ সংসারভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

অনেকেই এ নামোদয়ারম্ভকে নামাভাস বললেও নামাভাস ও নামোদয়ারম্ভের মধ্যে পার্থক্য আছে। নামোদয়ারম্ভের পূর্বে সাধকের অপরাধ থাকে। কিন্তু অপরাধ থাকলে নামাভাস হবে না। নামাভাসের যোগ্যতা অপরাধশূন্যতা। সাধারণত, যারা শ্রীহরি ও হরিনামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তারা যদি নিরপরাধ হয়, তবে অন্য কোনো বস্তুকে লক্ষ্য করে, পরিহাস বা হেলায় হরিনাম গ্রহণ করলে নামাভাস হয় এবং সেই নামাভাসের ফলে তাদের মুক্তিলাভ হয়।

কিন্তু হরিনাম আশ্রয়কারী ভক্তিসাধকের নামাভাসের পর্যায়কে নামের উদয়ারম্ভ-ভূমিকা বলা হয়। জ্ঞানসাধক জ্ঞানসাধনের চরম ফলস্বরূপ যে মুক্তি লাভ করে, ভক্তিসাধক নামের উদয়ারম্ভেই সে মুক্তি লাভ করলেও তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাবাসনা থাকায় মুক্তি তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকপিলদেব বলেছেন—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ (ভা. ৩/২৯/১৩)

অর্থ : ভগবান কপিলদেব মাতাকে বলছেন, "আমার অপ্রাকৃত নিত্যসেবা ব্যতীত আমার ভক্তগণের আর অন্য কোনো অভিলাষ না থাকায় সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও একত্ব বা সাযুজ্য মুক্তি তাঁদের প্রদান করা হলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন হতে পারে, নামাভাসে তো বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিও হয়, ভক্ত তাকেও স্বীকার করেন না কেন? উত্তরে বলা যায়, নামাভাসের ফলে বৈকুণ্ঠে যে চতুর্বিধ মুক্তি লাভ হয়, তাতে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাবাসনা না থাকায় ভক্ত তাকে দূর থেকেই ত্যাগ করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, ভক্তিসাধক সাধনের আরম্ভ থেকেই মহৎকৃপালব্ধ প্রাক্তন ও বর্তমান সংস্কারবশত অনর্থযুক্ত অবস্থায়ই কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাবাসনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাকেন। সেই সেবাবাসনা তাঁর হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় থাকায় মুক্তি কিংবা অন্য কোনো বাসনা সেখানে স্থান পেতে পারে না। এজন্য নামাভাসের ফল মুক্তিকে ভক্ত ঘৃণা করেন। নামাভাসের অলৌকিক ফল সংসারমুক্তির কথা শ্রবণের দ্বারা তাঁর হৃদয়ে নামের মাহাত্ম্য অধিক স্ফুর্তি লাভ করায় তিনি নামভজনের প্রতি আকৃষ্ট হন।

এভাবে অন্যাভিলাষশূন্য হয়ে হরিনাম গ্রহণ করতে করতে ক্রমেই তাঁর অবিদ্যাদি দূর হয়; অর্থাৎ রজস্তমোগুণ দূর হয়ে চিত্তশুদ্ধি ঘটে, যা নামোদয়ারম্ভেরই ফল। এরপর হ্লাদিনীশক্তি তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁর ইন্দ্রিয়কে তদাত্ম্যপ্রাপ্ত করিয়ে তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণসুখেকতাৎপর্যময়ী সেবাবাসনার যথার্থ রূপ দেন। এর ফলে তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়। এ অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলেছেন—

ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥
জীবনীভূত গোবিন্দ-পাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।

প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্ ॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা ।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি ।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥

(ভ. র. সি. ২/১/৭-১০)

অর্থ : ভক্তির প্রভাবে নিখিল দোষ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাঁদের চিত্ত প্রসন্ন (শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্য) এবং উজ্জ্বল (সর্বজ্ঞানসম্পন্ন) হয়েছে, যাঁরা ভগবৎসম্বন্ধীয় বিষয়েই কেবল অনুরক্ত, রসিক ভক্তগণের নিত্য সঙ্গেই যাঁদের উল্লাস, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ভক্তিজনিত সুখসম্পদ যাঁদের জীবনস্বরূপ এবং যাঁরা সর্বদা কেবল প্রেমের অন্তরঙ্গ কৃত্যসমূহের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভক্তগণের হৃদয়ে রতি সর্বদা বিরাজমানা থাকে। সেই আনন্দরূপা রতিই পূর্ব ও বর্তমান শুদ্ধ বাসনারূপ দুই সংস্কার দ্বারা উজ্জ্বলা হয়ে অনুভবমার্গে শ্রীকৃষ্ণবিভাবাদির দ্বারা আস্বাদনীয় হয়ে প্রৌঢ়ানন্দের চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। প্রেমের অন্তরঙ্গ কৃত্য বলতে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ এবং সাধক যে রসের ভক্ত, সেই রসোচিত কৃষ্ণনামসমূহের কীর্তনকে বোঝায়। এটিই নামোদয়-ভূমিকা।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, নামভজনের প্রথম পর্যায়ে নাম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায়, জ্ঞাতসারে হোক অথবা অজ্ঞাতসারে নামগ্রহণকারীর অপরাধ হয়। তারপর গুরুগ্রহণ করলে গুরুদেবের কাছ থেকে নামাপরাধ সম্বন্ধে জানতে পেরে সে ব্যাপারে সচেতন হয়। তখন জ্ঞাতসারে আর অপরাধ করে না। হরিনাম গ্রহণের ফলে ক্রমশ নামোদয়ারম্ভে তার পাপ ও অপরাধ দূর হয়ে সংস্কারমুক্তি হয়। একে শাস্ত্রে কোনো কোনো স্থানে নামাভাস ভূমিকা বলা হলেও বাস্তবে তা নামের উদয়ারম্ভ অবস্থা– *"তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়" (চৈ. চ. অন্ত্য ৩/১৭৫)*। এরপর সম্পূর্ণ নামোদয়ে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাবাসনা হৃদয়ে দৃঢ় হয়ে প্রেম লাভ হয়। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ভক্তের এমনভাবে আত্মবিস্মৃতি ঘটে যে, নিজের স্বতন্ত্র সত্তার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে সাধক শ্রীকৃষ্ণের সেবাকেই নিজের সত্তা বলে অনুভব করেন। এটিই ভাগবতোক্ত *'কৈবল্যৈক প্রয়োজনম'* শ্লোকাংশের নিদর্শন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এ সম্বন্ধে বলেছেন– "শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ... শুদ্ধ ভক্তিতে রুচি হয়, তখন যে নাম জিহ্বায় আবির্ভূত হন, সে নাম ' ... ঙ্গও পরিত্যাগ করার যত্ন করা আবশ্যক, কেননা সেরূপ সঙ্গ থাকলে শুদ্ধন ... য়)

শুদ্ধনাম

শুদ্ধনামের স্বরূপ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর জৈবধর্ম নামক গ্রন্থে বলেছেন– "অন্যাভিলাষ থাকলে কখনোই শুদ্ধনাম হতে পারে না। যতদিন নামগ্রহণকারী কর্ম, জ্ঞান, যোগ সাধনের ফল ভোগের বাসনা করতে থাকে, ততদিন সে শুদ্ধনাম গ্রহণ

করতে পারে না। হৃদয়ের সকল প্রতিকূল ভাব বর্জন করে যখন আনুকূল্যের সাথে হরিনাম গ্রহণ করা হয়, কেবল তখনই শুদ্ধনামের উদয় হয়। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন যে, শুদ্ধনাম হলো সেই নাম যা অপরাধ ও নামাভাস থেকে মুক্ত।”

নিখুঁত উচ্চারণ আর আকর্ষণীয় সুর সংযোগ করলেই শুদ্ধনাম হয় না, শুদ্ধনাম গ্রহণের সামর্থ্য লাভ হয় ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধভক্তের কৃপার মাধ্যমে। তাই ভগবান ও নামপরায়ণ শুদ্ধভক্তগণের কৃপায় অনর্থ ও অপরাধমুক্ত হয়ে যাঁদের চিত্ত ভক্তিরসের দ্বারা সিক্ত হয়েছে, তাঁদের দ্বারাই শুদ্ধনাম গৃহীত হয়।

এ প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন–

কেবল জিহ্বা আর ঠোঁট সঞ্চালনের দ্বারা হরিনাম উচ্চারণ করা যায় না। কৃষ্ণনাম হৃদয় দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়, কেবল ঠোঁট ও জিহ্বা দিয়ে নয়। চরমে হরিনামের ধ্বনি হৃদয়ের সীমানা পেড়িয়ে কৃষ্ণলোকে পৌঁছায়।

নামাক্ষররূপে যখন কৃষ্ণ অবতরণ করেন, তখন তিনি ভক্তের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে ঠোঁট ও জিহ্বাকে আন্দোলিত করতে থাকেন। এভাবে ভক্তের শ্রীমুখ থেকে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাই হরিনাম। অর্থাৎ চিন্ময় গোলোকধাম থেকে শ্রীকৃষ্ণই শব্দরূপে অবতরণ করে ভক্তের হৃদয় থেকে উৎসারিত হন এবং ভক্তের সমস্ত স্নায়ুকোষসহ সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণপূর্বক তাঁর ঠোঁট ও জিহ্বায় নৃত্য করতে থাকেন– এটিই কৃষ্ণনাম।

হরিনামের ধ্বনি জড় জগতের কোনোকিছু থেকে উৎপন্ন হয় না। তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন। কিন্তু আমরা এত সহজে তাঁর সমীপবর্তী হতে পারি না। সুতীব্র সেবাবাসনা ও ব্যাকুল হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আর্তি নিয়ে আমরা তাঁর শরণাগত হতে পারি মাত্র।

তখন কৃষ্ণ অহৈতুকী করুণা করে শব্দরূপে আমাদের জিহ্বায় নৃত্য করতে পারেন। সেটাই কৃষ্ণের শুদ্ধনাম। আমরা ঠোঁট নাড়িয়ে তা উচ্চারণ করতে পারি না। আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে যে শব্দ উচ্চারণ করি, তা যান্ত্রিক বা জড় শব্দ, কৃষ্ণ নন। কৃষ্ণ জড় শব্দের অতীত। তবু তিনি যেহেতু সবকিছুর নিয়ন্তা ও সর্বশক্তিমান, তাই তিনি যেকোনো রূপে, যেকোনো দেশে এবং যেকোনো শব্দের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারেন। (শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা)

এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে–

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখো হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অর্থ : অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনোই প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ আদির দ্বারা গ্রাহ্য নয়। জীব যখন সেবোন্মুখ হয়, অর্থাৎ চিৎস্বরূপে স্থিত হয়ে কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন অপ্রাকৃত জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনাম স্বয়ংই স্ফুর্ত হয়।

শুদ্ধনাম গ্রহণের সাথে সাথে ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলারও উদয় হয়। কারণ ভগবানের নাম ও ভগবান অভিন্ন এবং তাঁর নামেই তাঁর সমস্ত রূপ, গুণ, লীলা-পরিকর বর্তমান।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে–

চিচ্ছক্তিস্বরূপে প্রকাশয়ে বস্তুরূপ। / বস্তুনাম, বস্তুধাম, তৎক্রিয়া-স্বরূপ॥
কৃষ্ণ সে পরম বস্তু, শ্যাম তাঁর রূপ। / কৃষ্ণধাম গোলোকাদি, লীলার স্বরূপ॥

নাম, ধাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি যত। / সকলই অখণ্ডাদ্বয় জ্ঞান অন্তর্গত ॥
বিচিত্রতা যত সব পরাশক্তি কর্ম। / কৃষ্ণ ধর্মী, পরাশক্তি কৃষ্ণ-নিত্যধর্ম ॥

রস নামস্বরূপ

নামতত্ত্বের চরম লাভই রস। সাধারণ অলঙ্কারিদের যে রস, তা জড়ধর্মবিশিষ্ট। বস্তুত তা রস নয়, রসের বিকৃতিমাত্র। প্রকৃতির চব্বিশ তত্ত্বের অতীত চিন্ময় শুদ্ধতত্ত্বই প্রকৃত রস। শুদ্ধসত্ত্বের চিদ্বিশেষত্বই নিত্যরস। সেই শুদ্ধসত্ত্বগত অখণ্ডরস নামরূপে পুষ্পকলিকার ন্যায় কৃষ্ণকৃপায় (শ্রীমন্মহাপ্রভু) জগতে প্রচারিত হয়েছে। সেই নামরূপ কলিকা স্বল্পস্ফুট হতে হতেই কৃষ্ণের মনোহর চিন্ময়রূপ বিকশিত হয়; তাঁর চৌষট্টিগুণসহ সৌরভাদি সবই অনুভূত হয়। নামপুষ্প পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হলে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় চিন্ময় নিত্যলীলা প্রকৃতির অতীত হয়েও জগতে উদিত হয়। কৃপাক্রমে জীবের সত্তাগত ক্ষুদ্রসম্বিৎ ও হ্লাদশক্তিতে স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী সম্বিতের সমবেতসার এসে ভক্তিস্বরূপিনী বৃত্তি হয়ে থাকে। সেই সর্বেশ্বরী শক্তি আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণনামে রসের সামগ্রীসমূহ প্রকাশ করেন। যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি রসের আশ্রয়; কৃষ্ণ স্বয়ং বিষয়। কৃষ্ণের রূপ-গুণাদি উদ্দীপন। আশ্রয়রূপ ভক্ত সেই রসের রসিক হয়ে পড়েন। সে রস সর্বসার ব্রজরস এবং জীবের পরম পুরুষার্থ।

উল্লেখ্য, রসস্বরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুই রূপে রসের আস্বাদন করেন– প্রেমের বিষয়রূপে ও প্রেমের *আশ্রয়রূপে। প্রেমের বিষয়রূপে তিনি ব্রজবিহারী শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ; আর প্রেমের আশ্রয়রূপে তিনিই শ্রীগৌরসুন্দর–* ***'রাধাকৃষ্ণ মিলিত স্বরূপ, 'রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।'*** রস শব্দের দুটি অর্থ, যথা : "*রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ এবং রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ।*" অর্থাৎ যাকে আস্বাদন করা যায়, তা রস এবং যিনি আস্বাদন করেন, তিনিও রস। এ উভয় প্রকার রসত্ব পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে বত্যমান। অর্থাৎ তিনি আস্বাদ্য ও আস্বাদক উভয়ই। এর কোনোটির হানি হলে তাঁর পরমব্রহ্মত্বের হানি হয়। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অসীম হওয়ায় তাঁর আস্বাদ্যত্ব ও আস্বাদকত্বও অসীম। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্বৈশ্বর্য-সর্বশক্তি-সর্বরসপূর্ণ ॥ (মধ্য ৮/১০৮)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "*স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ।*" (১/১/৩) অর্থাৎ তিনি রসগণের মধ্যে পরম ও রসতম। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও বলা হয়েছে– "*ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।*" (৬/৮) অর্থাৎ তাঁর সমান বা তাঁর চেয়ে অধিক কাউকে দেখা দেখা যায় না। সুতরাং পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সমান বা তাঁর চেয়ে অধিক আস্বাদ্য ও আস্বাদক আর নেই । অর্থাৎ তিনি আস্বাদ্য ও আস্বাদক বা রস ও রসিক হিসেবে অদ্বিতীয়। এজন্য নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায় কৃষ্ণনামও সর্বরসের সার, যা সাধকের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে বিকশিত হতে থাকে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'শরণাগতির শ্রীনামমাহাত্ম্যে' শুদ্ধনাম বিকাশের কথা ব্যাখ্যা করেছেন–

প্রেমের কলিকা নাম অদ্ভুত রসের ধাম
হেন কালে করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুনঃ দেখায় নিজ রূপ-গুণ
চিত্ত হরি, লয় কৃষ্ণপাশ ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা ব্রজে মোরে যায় লঞা
দেখায় মোরে স্বরূপবিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া কৃষ্ণ পাশে রাখে গিয়া
এ দেহের করে সর্বনাশ ॥

রস লাভের ক্রম

বিষয়ী, কর্মী ও জ্ঞানী তিন ধরনের ব্যক্তিই বহির্মুখ; কারণ মিথ্যা স্বার্থসুখের জন্য তারা সর্বদা সচেষ্ট। বিষয়ীমাত্রই ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা। পরকালে ইন্দ্রিয়তর্পণই কর্মীর চেষ্টা। আর নিজের সমস্ত কষ্ট দূরীকরণই জ্ঞানীর চেষ্টা। এ তিন স্তর অতিক্রম করে মানুষ অন্তর্মুখ হয়। অন্তর্মুখ জীবগণের মধ্যে অতি ভাগ্যবান যাঁরা, তাঁরাই সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লাভ করেন। যাঁরা তেমন ভাগ্যবান হতে পারেনি, তারা কর্ম ও জ্ঞানমার্গের পথে বহু দেব-দেবী ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের আরাধনা করে। আবার সংসার ভ্রমণ করতে করতে জীবের দৈবক্রমে ভক্তিপ্রদ সুকৃতি হয়। শুদ্ধভক্তির যে সকল অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে, তার কোনোটি না কোনোটির কার্য মনুষ্যজীবনে দৈবাৎ করা হয়ে যায়, যথা : ঘটনাক্রমে একাদশাদি দিবসে উপবাস, ভগবানের লীলাস্থলীর দর্শন ও সংস্পর্শ, অতিথিবোধে শুদ্ধভক্তের উপকার, নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিনামাদির কথা বা কীর্তন শ্রবণ। তবু এসব কার্যে যদি ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা থাকে, তবে তাদের ভক্তিপ্রদ সুকৃতি হয় না। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি ঘটনাক্রমে বা লোকদৃষ্টিতে ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহাশূন্য হয়ে এ সমস্ত কাজ করে, তবে ভক্তিপ্রদ সুকৃতি হয়।

এমন বহু জন্মের ভক্তিপ্রদ সুকৃতি পুঞ্জীভূত হলে তা অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় করায়। কৃষ্ণভক্তি করলে সর্বকর্ম কৃত হয়– এ কথার প্রতি বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। এ শ্রদ্ধার ফলে শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গ করার স্পৃহা জন্মে। তখন সাধুগুরু লাভ হয় এবং গুরুদেবের কৃপায় যুগলনামরূপ মাহমন্ত্রপ্রাপ্তি হয়। তুলসীমালায় তা সংখ্যারক্ষণপূর্বক স্মরণ ও কীর্তনই সকল লাভের মূল। ঐকান্তিক ভক্তগণের প্রবৃত্তি অর্চন অপেক্ষা নাম স্মরণ-কীর্তনের প্রতি বেশি প্রবল হয়। সাধুসঙ্গে নামভজন করতে করতে অপরাধ ও অনর্থসমূহ দূর হয়। অনর্থ দূর হলে পূর্বে যে শ্রদ্ধা ছিল তা নির্মল হয়ে নিষ্ঠায় পরিণত হয়। নিষ্ঠা ক্রমশ অধিক নির্মল হয়ে রুচি জন্মে; রুচি ভক্তির সৌন্দর্যে বদ্ধ হয়ে আসক্তিতে পরিণত হয়। আসক্তি ক্রমে পূর্ণতা লাভ করলে ভাব বা রতি হয়। রতি সামগ্রীযোগে রসে পরিণত হয়– এটাই রস লাভের ক্রম। রস পাঁচ প্রকার; যথা : শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য।

অপরাধশূন্য হয়ে শুদ্ধনাম কীর্তন করার সাথে সাথে সমস্ত অনর্থ দূর হয়ে যায়। অন্যথায় অনর্থ নষ্ট হয় না। অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি এবং ভাবের পর প্রেম উৎপন্ন হয়। এ প্রেমই জীবের চরম সাধ্য, চরম প্রয়োজন। প্রেম উত্তরোত্তর ঘনীভূত হতে থাকলে প্রেম বর্ধিত হয়ে ক্রমান্বয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব স্তরে উন্নতি হয়। এ মহাভাবই সর্বোচ্চ স্তর। এ মহাভাবই প্রেমভক্তির সার উন্নতোজ্জ্বল রস। এটিই সাধ্যভক্তির 'শ্রী' যা মাদনাক্ষ-মহাভাব নামে পরিচিত। শ্রীমতি রাধারাণী হলেন এ মাদনাক্ষ মহাভাবের মূর্তিমতি বিগ্রহ। তাই তিনি মাদনাক্ষ-মহাভাবময়ী নামে পরিচিতা।

শ্রীগৌরসুন্দর এ সর্বোত্তম রাধাপ্রেম নিজে আস্বাদনপূর্বক জগতের জীবের মধ্যে বিলানোর জন্য এ কলিযুগে এসেছেন। এজন্যই ধন্যকলি। সেই প্রেম বিতরণ করেছেন তিনি প্রেমনামের মাধ্যমে। তাই তিনি যে নাম প্রচার করেছেন, তা প্রেমনাম, সাধারণ নাম নয়। 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রের প্রত্যেকটি নাম প্রেমরূপ সূতার দ্বারা গাঁথা। তাই তা নামপ্রেম। তিনি স্বয়ং প্রেমনাম-সংকীর্তন রস আস্বাদন করেছেন। সেইসাথে অধিকার অনধিকার বিচার না করে তা আচণ্ডালে বিলিয়েছেন। প্রেমভক্তির এ নাম-সংকীর্তন শ্রীমতি রাধারাণী করতেন। তাই তা গোলোক-বৃন্দাবনের সুগুপ্ত ধন (*গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন*)। ব্রজাঙ্গনাগণ যখন নামী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তীব্র জ্বালা ও বেদনা অনুভব করতেন, তখন তাঁরা শ্রীমতি রাধারাণীর পরিচালনায় সবাই প্রেমনাম-সংকীর্তন করতেন। একারণে এ প্রেমনাম-সংকীর্তনই জীবের পরম সাধ্য, অন্তিম লক্ষ্য। সুতরাং মহাপ্রভুর করুণা আর উদারতার কথা ভাবা যায়? আর এজন্যই "*গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, / সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।*"

শ্রীরাধার শ্যামনাম

শ্রীউদ্ধব দাঁড়িয়ে থেকে বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে লাগলেন মহাভাবময়ী রাধারাণীর বিরহকাতর নিদারুণ মূর্তি,

উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন উন্মাদিনীর প্রলাপ-উক্তি– ক্ষণকাল নীরব থেকে শ্রীমতি রাধারাণী অষ্টসখিদের বললেন, "হে প্রিয় সখিগণ, যমুনার কূলে কেলিকদম্বের মূলে আমাকে শীঘ্র নিয়ে চলো। কারণ যমুনা আর কেলিকদম্ব আমার ছোটবেলার বন্ধু। তারপর যমুনার কিছু মাটি নিয়ে এসে আমার সমস্ত দেহে লেপন করো। তাতে শ্যামনাম লিখে তুলসীমঞ্জরী ছড়িয়ে দাও। কারণ শ্যাম ও শ্যামনাম অভিন্ন। তারপর আমার চারপাশে বসে তোমরা সবাই উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করো।"

রাধারাণীর এ উন্মাদগ্রস্ত অবস্থার নাম উদ্‌ঘূর্ণা দশা। শ্রীরাধার এ ভাবে বিভোর শ্রীমন্মহাপ্রভুরও এমন দশা হতো– প্রেমোন্মাদ হয়ে তিনি কখনো হাসতেন, কখনো কাঁদতেন, কখনো পাগলের মতো প্রলাপ বকতেন এবং একইসাথে সেই সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম আবার তিনি নির্বিচারের জগতের জীবকে দান করেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের এমনই দয়া, এমনই উদারতা। সেজন্য গৌরনামও আরো বেশি কৃপালু, আরো বেশি উদার; অপরাধের কোনো বিচার তার কাছে নেই। কর্মীরাও এ নাম গ্রহণ করে সহজেই রজস্তমোগুণমুক্ত হয়ে শ্রদ্ধা লাভ করতে পারে। তাই গৌরভজন সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন–

যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাউ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন–

গৌরনাম না লইয়া যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া
সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই
অপরাধ নাহি রহে তায় ॥

তিনি আরো বলেছেন,

দয়াল নিতাই-চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন।
অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন॥
কৃষ্ণনামে রুচি হবে ঘুচিবে বন্ধন।
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পাবে দরশন ॥

সুতরাং শ্রীগৌর ও কৃষ্ণনামের যুগপৎ ভজনই প্রেমপ্রাপক।

শুদ্ধনামের ফল

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের শক্তি ও মহিমার পরিচয় জেনে অন্যের পক্ষে যাই হোক, রসিক ভক্তের পিপাসা বা প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কখনোই সমাপ্ত হয় না, বরং নামের অশেষ সৌন্দর্য-মাধুর্য আদি কল্যাণগুণাত্মক স্বরূপ লক্ষণের সাথে অন্তরের পরিচয় ঘটানোর জন্য পিপাসা বলবতী হতে থাকে এবং শ্রবণের সাথে সাথে পরমোল্লাসও হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তাঁর বিদগ্ধমাধব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্। (১/১৫)
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

অর্থ : আহা, কৃষ্ণনামের এ 'কৃ' ও 'ষ্ণ' বর্ণ দুটি না জানি কত অমৃত দিয়ে গড়া; তা উচ্চারণমাত্র মনে হয় যেন

জিহ্বায় তা নৃত্য করছে। তখন বহু বহু জিহ্বা লাভের ইচ্ছা হয়। আবার যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্বুদসংখ্যক কর্ণ লাভের স্পৃহা হয় এবং চিত্তপ্রাঙ্গনে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়ে তা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে স্তিমিত করে দেয়।

শ্রীল যদুনন্দন দাস ঠাকুরকৃত উক্ত শ্লোকটির মর্মানুবাদও উল্লেখ করা হলো :

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম,
　　আরতি বাড়ায়
নাম সুমাধুরী পাইয়া,
　　অনেক তুণ্ডের
　　কী কহব নামে
কেমন অমিয়া দিয়া,
　　'কৃষ্ণ' এই দু
আপন মাধুরী গুণে,
　　তাতে কালে ত
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ,
　　মাধুরী করিয়ে
'কৃষ্ণ' দু-আখর দেখি,
　　অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি,　　তবে কৃষ্ণরূপ দেখি,
　　নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥
চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে,　　প্রবেশ করয়ে তবে,
　　বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ,　　করে অতি আহ্লাদন,
　　নামে করে প্রেম-উন্মাদ ॥
যে কাণে পশয়ে নাম,　　সে তেজয়ে আন্ কাম,
　　সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য-স্থান,　　সব রস কৃষ্ণনাম,
　　এ যদুনন্দন দাস কয় ॥

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী তাঁর অলঙ্কার-কৌস্তুভ গ্রন্থে কৃষ্ণনামে শ্রীমতি রাধিকার অনুভূতির কথা বর্ণনা করেছেন–

তমালনীলং কিমপি ত্বদুক্তাদ্‌বিম্বোষ্ঠি কৃষ্ণেতি পদাদুদীর্ণম্।
অন্তঃপ্রবিশ্য শ্রুতিবর্ত্ম না মে ন বেদ্মি তদ্ধাম কিমাতনোতি ॥

অর্থ : কোনো এক সখির কাছে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করে শ্রীমতি রাধিকা বললেন, "হে বিম্বাধরে, তুমি যে 'কৃষ্ণ' নামটি এইমাত্র উচ্চারণ করলে, তা থেকে উদিত এক তমাল নীলকান্তি অপূর্ব সুন্দর মূর্তি শ্রুতিপথের মধ্য

দিয়ে আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে কী যে এক অনির্বচনীয় ভাব বিস্তার করছে, তার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।"

অর্থাৎ কৃষ্ণনাম শ্রবণ করামাত্র শ্রীমতি রাধিকা ভাবাবেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কৃষ্ণের শক্তি ও মাধুর্য তিনি কৃষ্ণনামেই অনুভব করেছিলেন। এমনকি সেই নামকে তিনি তমাল-নীলদ্যুতিময় মূর্তিবিশেষ ব কৃষ্ণকে দর্শন করেননি। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে (১৪) আছে- কমলনয়না রাধারাণীর শ্রুতিপথে তোমার নামের অর্ধেকমাত্র অঙ্গ সিক্ত হয়ে যায়।"

রসিকশেখর, রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ রসনির্যাস আস্বাদন আস্বাদন করানোর জন্য গোলোকস্থ বৃন্দাবনলীলাকে ভুবনে প্র বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণবল্লভা, মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীমতি রাধিকার নবীন অনুরাগের কথা শ্রবণ করুন–

সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

(পদকল্পতরু)

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আবার সেই কৃষ্ণনামই যে শ্রীমতি রাধারাণীর একমাত্র অবলম্বন, তা শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন,

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দি দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা ॥

অর্থ : কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলা নববালা শ্রীরাধিকার অবস্থা দেখে কোনো এক সখি শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলছেন, হে গোবিন্দ, শ্রীরাধা অশ্রুসিক্ত নয়নে মধুরস্বরে কেবল তোমার নামাবলী গান করছেন।

যিনি শুদ্ধনাম করেন, তাঁর হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তাঁর চোখে কৃষ্ণপ্রেমরূপ অঞ্জনলিপ্ত হয়, তখন নামোচ্চারণের সাথে সাথে কৃষ্ণস্ফূর্তি হয়। তাই ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে–

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থ : প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন–

শ্রীনাম স্মরিলে রূপ আইসে সঙ্গে সঙ্গে।
রূপ নাম ভিন্ন নয় নাচে নানা রঙ্গে ॥

শিক্ষাষ্টকে বর্ণিত প্রেম লাভের ক্রম

স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজে বিশেষ কোনো গ্রন্থাদি রচনা না করলেও জীবজগতের পরম শ্রেয়োলাভের জন্য সমস্ত ভক্তিসিদ্ধান্তের সমাবেশ শিক্ষাষ্টকেই অতীব সূক্ষ্ম ও সার সূত্রাকারে সমস্ত ভক্ত্যঙ্গকে সংশ্লিষ্ট করে অঙ্গী কৃষ্ণনামসংকীর্তনের জয়গান করেছেন। জীবের পরম প্রয়োজন প্রেম লাভের ক্রমও সেখানে ফুটে উঠেছে, যথা :

১। শ্রদ্ধা : প্রথম শ্লোকে নামসংকীর্তনের সাতটি মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে, যা শ্রবণ করলে নামের প্রতি বদ্ধজীবের শ্রদ্ধার উদয় হয়।

২। সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি : শ্রদ্ধা উদিত হলে জীব সাধুসঙ্গ করে, সাধুসঙ্গের ফলে ভজন শুরু হয়, দ্বিতীয় শ্লোকে অপরাধরূপ দুর্দৈবের কথা স্মরণ করিয়ে নামভজনকালে সাধকের অনর্থনিবৃত্তির কথা বলা হয়েছে।

৩। নিষ্ঠা : তৃতীয় শ্লোকে নিষ্ঠা-স্তরের কথা বলা হয়েছে। অবিচল নিষ্ঠার কারণেই সাধক স্বাভাবিকভাবে তৃণের চেয়ে নীচ, বৃক্ষবৎ সহিষ্ণু এবং অমানী হয়ে সকলকে যথাযথ সম্মানদানপূর্বক সর্বদা নামভজনে রত থাকেন।

৪। রুচি : চতুর্থ শ্লোকে রুচি স্তরের কথা বলা হয়েছে। ভক্তিরসের প্রতি রুচি লাভ করার কারণেই সাধক ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রীসহ সব জড়বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে কেবল শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করেন।

৫। আসক্তি : পঞ্চম শ্লোকে ভক্তের আসক্তি স্তরের কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রবল আসক্তির কারণেই ভক্ত এ পর্যায়ে নিজেকে পতিত ও কৃষ্ণের নিত্য কিঙ্কর মনে করে কান্না করতে করতে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেন।

৬। ভাব : ষষ্ঠ শ্লোকে ভাবস্তরের কথা বলা হয়েছে, যখন ভক্তের মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ হওয়ায় ভক্ত নামগ্রহণের সময় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ ও লীলা দর্শন করতে পারেন, তার ফলে অঝোরে অশ্রুপাত, গদগদস্বর, স্বেদ, কম্প, স্তম্ভ আদি শুদ্ধসাত্ত্বিক বিকারসমূহ হয়ে থাকে।

৭। বিপ্রলম্ভ প্রেম : সপ্তম শ্লোকে প্রেমপ্রাপ্ত ভক্তের সুগভীর বিরহ বা বিপ্রলম্ভ ভাবের কথা বলা হয়েছে, যখন গোবিন্দ অদর্শনে ভক্তের এক নিমেষ এক যুগ বলে প্রতিভাত হয় এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বলে

মনে হয়।

৮। সম্ভোগ প্রেম : অষ্টম শ্লোকে প্রেমিক ভক্তের সম্ভোগাত্মক মাধুর্যের কথা বলা হয়েছে, যখন ভক্ত তাঁর হৃদয়বল্লভের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যসঞ্জাত মধুর দিব্যানন্দ আস্বাদন করেন। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করেন, যা নিঃস্বার্থ শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ।

নিম্নে শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকের উপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ভজনগীতির কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :

বন্ধুগণ শুনহ বচন মোর।
ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন,
দেখা দেয় চিত্তচোর ॥
বিচক্ষণ করি, দেখিতে চাহিলে,
হয় আঁখি-অগোচর।
পুনঃ নাহি দেখি, কাঁদয়ে পরাণ,
দুঃখের নাহি থাকে ওর ॥

জগতের বন্ধু সেই, কভু মোরে লয় সাথ।
যথা তথা রাখু মোরে, আমার সেই প্রাণনাথ ॥

দর্শন-আনন্দ দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে,
বলে মোরে প্রণয়-বচন।
পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া,
প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন ॥

যাহে তা'র সুখ হয় সেই সুখ মম।
নিজ সুখে-দুঃখে মোর সর্বদাই সম ॥

ভকতিবিনোদ, সংযোগে বিয়োগে,
তাহে জানে প্রাণেশ্বর।
তা'র সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ,
সে কভু না হয় পর ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সার 'হরিনামে সর্বসিদ্ধি'র প্রমাণ

নামগ্রহণে চার ধরনের ফল লাভ হয়–

*** নামাভাসে**

১. পাপনাশ,

২. সংসারনাশ বা মায়ামুক্তি।

*** শ্রদ্ধাযুক্ত নামে**

১. চিত্তশুদ্ধি,

২. সর্বভক্তিসাধন উদগম।

*** অপরাধশূন্য নামে**
১. কৃষ্ণপ্রেমোদগম,
২. প্রেমামৃত আস্বাদন।

*** সেবাসংকল্প সহকারে নাম গ্রহণে :**
১. কৃষ্ণপ্রাপ্তি,
২. কৃষ্ণসেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন।

চার প্রক্রিয়ায় নাম গ্রহণের ফলে আটটি সাধ্যবস্তু লাভ হয়ে থাকে। মঙ্গলকামী জীবমাত্রই এ সাধ্যবস্তুগুলোর কোনো না কোনোটি পাওয়ার জন্য লালায়িত হয়ে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলেছেন, একমাত্র নামসংকীর্তনের দ্বারা উল্লিখিত সমস্ত সাধ্যবস্তুই লাভ হবে। সপ্তম সাধ্যবস্তু হিসেবে যে কৃষ্ণপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, তা বহু প্রকার এবং তা লাভের তারতম্যও আছে; যথা : "*কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্যও আছয় ॥*" (চৈ. চ.) তার মধ্যে ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এ চার রসে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও কৃষ্ণসেবা লাভ হয়। আবার চার প্রকার ব্রজরসের মধ্যে পারকীয় মধুর রসে কৃষ্ণপ্রাপ্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার মধুর পারকীয় রসে শ্রীরাধার দাসী হয়ে সখি অনুগতভাবে যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি, তাই কৃষ্ণপ্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে, "*পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।*" সুতরাং মধুর পারকীয় রসে শ্রীরাধার দাসী হয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও কৃষ্ণসেবার অধিক সাধ্য আর কিছুই নেই। এটিই সাধ্যের পরাকাষ্ঠা। হরিনাম চিন্তামণি; যিনি যে রসে কৃষ্ণপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, সে ভাব নিয়ে সংকল্পপূর্বক নামাশ্রয় করলে সিদ্ধিলাভও করবেন। পরমকরুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুও রাধাপ্রেমকেই জীবের চরম সাধ্য বলে প্রদর্শন করেছেন। তাই বুদ্ধিমান যারা, তাদের কেবল এর জন্যই সচেষ্ট হওয়া উচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু তো তা দিতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সুতরাং রাধাদাস্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম সাধ্যবস্তু। এ রাধাপ্রেমে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও রাধাদাসী হয়ে নিগূঢ় নিকুঞ্জ সেবালাভের আকাঙ্ক্ষা থাকলে সেভাবে সংকল্প করে নামকল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে পদ্মপুরাণেও পূর্ণনিশ্চয়তার সাথে বলা হয়েছে–

দ্বাত্রিংশদক্ষরং মন্ত্রং নামষোড়শকান্বিতং।
প্রজপন্ বৈষ্ণবো নিত্যং রাধাকৃষ্ণস্থলং লভেৎ ॥

অর্থ : যে বৈষ্ণব ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত এ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র অবিশ্রান্তভাবে জপ-কীর্তন করেন, তিনি নিশ্চিত রাধাকৃষ্ণের আবাস ব্রজধাম লাভ করবেন।

শুধু তাই নয়, ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট জীব যে যা চায়, তাকে তদ্রূপ সিদ্ধি প্রদান করে এক হরিনামই। মহাপ্রভুর শিক্ষার সার এই যে, আপনি ধনজন আরোগ্য আদি সুখ চান, তবে নামাশ্রয় করুন; সহজে স্বর্গসুখ চান, নামাশ্রয় করুন; পাপনাশ করতে চান, নামাশ্রয় করুন; ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াতে চান, নামাশ্রয় করুন; মোক্ষ চান ও চিত্তশুদ্ধি চান, তবু নামাশ্রয় করুন; যদি প্রেম চান, তবে নিরপরাধে নামাশ্রয়ই করুন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের যেকোনোটা কামনা করে কেবল হরিনাম করেই তা প্রাপ্ত হোন। মোটকথা আপনি যা-ই চান না কেন, কেবল নামাশ্রয়েই তা অতি অনায়াসে লাভ করবেন। এক্ষেত্রে অন্য কোনো পন্থার তুলনাও চলে না। এ সম্বন্ধে ভাগবতে বলা হয়েছে– "*এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগীনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥*" *(ভা: ২/১/১১)* অর্থাৎ "শুকদেব বললেন– হে রাজন, শ্রীহরির নামকীর্তনে ফলাকাঙ্ক্ষীদের ফল প্রাপ্তি, মুমুক্ষুদের মোক্ষলাভ এবং জ্ঞানীগণের জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটে থাকে; মোটকথা, কী সাধক, কী সিদ্ধ কারো পক্ষেই এটি ভিন্ন অন্য কোনো মঙ্গল দেখা যায় না।

তাই শ্রীনামের শক্তি সম্বন্ধে তর্ক বা বিচার করার চেয়ে তাকে আশ্রয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? হরিনাম মায়াতীত বস্তু হওয়ায় তা বিচারের বা তর্কের বিষয় নয়, আস্বাদনের বস্তু। আর তাতে কোনো ক্ষতিও নেই; কোনো কাজের হানি হবে না, সময় নষ্ট হবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা তো তেমনই–

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।

দেশকালনিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥ (চৈ. চ. অন্ত্য ২০)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন–

জীবন অনিত্য জানহ সার, তাহে নানাবিধ বিপদভার,
নামাশ্রয় করি যতনে তুমি, থাকহ আপন কাজে।
কৃষ্ণনাম সুধা করিয়া পান, জুড়াও ভকতিবিনোদ প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দ ভুবন মাঝে ॥
(অরুণোদয় কীর্তন)

নামরস সম্বন্ধে শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা

* সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে নিষ্ঠা সহকারে ভজন-সাধন করলেই এ রস সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সাথে সাথে তা আস্বাদন করা যায়। কৃপা ব্যতীত এ অনির্বচনীয় তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না। এটি জড়বিষয়ক তর্কের অতীত এবং অত্যন্ত বিরল।

* কর্ম, জ্ঞান, যোগ আদি পরিত্যাগ করে অনন্য ভক্তির সাথে নামভজনই সুলভ ধন। এক্ষেত্রে নৈপুণ্য এই যে, কুসঙ্গ একেবারেই ত্যাগ করে সাধুসঙ্গে ভজন করতে হবে। প্রেম পরমশুদ্ধ চিৎধর্মবিশেষ। সাধুচিত্তই তা গ্রহণের যোগ্য। অসাধুচিত্ত তার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না হলে সেই ফল কখনোই জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। ঠিক যেমন বিদ্যুৎ কুপরিবাহী বা অপরিবাহী পদার্থের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে না। কিন্তু পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে সহজেই প্রবাহিত হয়, যদিও বিদ্যুৎ একটি জড় পদার্থ।

* অতএব যারা নামগ্রহণের ফল লাভ করতে চান, তাদের তিনটি বিশেষ আগ্রহ থাকা দরকার, যথা : সাধুসঙ্গ, নামভজনের জন্য অনুকূল পরিবেশ এবং নিজের সুদৃঢ় ভাব বা পরাকাষ্ঠা, যাকে নির্বন্ধ বলা যায়।

* দৈন্যই প্রেমের অলঙ্কার। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের মধ্যেই সত্যিকার অর্থে প্রকৃত দৈন্যভাব দেখা যায়।

* সুতরাং যার ওপর আর উপদেশ হতে পারে না সেই চরম উপদেশ হলো– সাধুসঙ্গে নামানুশীলন।

* জীব যদি নিজের সুকৃতিবলেই ভক্তি লাভ করে, তবে ধর্মপ্রচারের তাৎপর্য কী? এর উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন– যে সকল জীব সুকৃতিবলে হরিনামের প্রতি শ্রদ্ধা করবে, তাদের ভক্তি দৃঢ় করার জন্যই আমি নামকে যুগধর্ম বলে প্রচার করেছি। **বস্তুত হরিনামই জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম।**

গ্রন্থের ভাষায়–

অতএব নাম মাত্র বৈষ্ণবের ধর্ম।
নামে প্রস্ফুটিত হয় রূপ, গুণ, কর্ম ॥
কৃষ্ণের সমগ্র লীলা নামে বিদ্যমান।
নামে সে পরম তত্ত্ব তোমার বিধান ॥

সুতরাং শুদ্ধনামই আমাদের সকলের পরম কামনার বস্তু। কিন্তু অপরাধমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধনামের প্রশ্নই আসে না– "*অপরাধ গতে শুদ্ধনামের উদয়। শুদ্ধনাম ভাবময় আর প্রেমময় ॥*" এজন্য সর্বদা অনুতাপ সহকারে কান্নার ভাব নিয়ে নাম ও নামীর কাছে আমাদের আকুলভাবে প্রার্থনা নিবেদন করতে হবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সে দৃষ্টান্তই তুলে ধরেছেন তাঁর নিম্নোক্ত প্রার্থনায়–

কবে হবে বল সে-দিন আমার।
(আমার) অপরাধ ঘুচি, শুদ্ধনামে রুচি,
কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার ॥
তৃণাধিক হীন কবে নিজে মানি,

সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি ।
সকলে মানদ, আপনি অমানী,
হয়ে আস্বাদিব নাম-রস-সার ॥
ধন জন আর, কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ সুখকরী ।
জন্মে জন্মে দাও, ওহে গৌরহরি!
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার ॥

এখানে যে দৈন, সহিষ্ণুতা ও অমানী-মানদ গুণের কথা বলা হয়েছে, তা ভক্তের ভাবস্তরের স্বাভাবিক গুণ, তা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ও গুণাতীত। তাই তা শুদ্ধনাম গ্রহণের পর প্রেমোৎপত্তির পরই ভক্তের মধ্যে ফুটে ওঠে। এ ভাব নিয়ে নিরন্তর হরিনাম গ্রহণের কথাই শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে। শুদ্ধনামের স্তরে পৌঁছালে ভক্তের চিত্ত একেবারেই নির্মল হয়ে যায়, তাঁর দ্বারা আর কখনো অপরাধ সংঘটিত হয় না, কৃষ্ণপ্রেমের জন্য পাগল এমন ভক্ত হরিনাম কীর্তন করেন কেবল প্রেম লাভের জন্যই। কৃষ্ণপ্রীতি ছাড়া আর অন্য কোনো বাসনা তাঁর হৃদয়ে ঘুণাক্ষরেও থাকে না।

শুদ্ধ নাম যার মুখে তাঁর দৃঢ় মন।
কৃষ্ণ হৈতে বিচলিত নহে এক ক্ষণ ॥

কৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

কৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব

নববিধা ভক্তির মধ্যে কীর্তনাখ্যা ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্য আট প্রকার ভক্তি কীর্তনাখ্যা ভক্তির সহযোগেই সাধিত হয়। কৃষ্ণকীর্তন মলিনচিত্ত জীবের হৃদয়-দর্পণকে মার্জন করে, ভবসমুদ্ররূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাপণ করে, জীবের পরম মঙ্গলরূপ কল্যাণকিরণ বিস্তার করে, অপ্রাকৃত অনুভূতির প্রাণস্বরূপ জীবের কৃষ্ণসেবানন্দ বর্ধন করে, পদে পদে পূর্ণসুধা আস্বাদন করায় এবং সর্বাত্মার স্নিগ্ধতা সাধন করে।

(কীর্তনাখ্যা ভক্তি হলো কৃষ্ণকীর্তনমূলক ভক্তি। হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের আলোকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে দুটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে– মহাভাগবত ভরত দ্বিতীয় জন্মে হরিণদেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হরিণদেহ ত্যাগের সময় তিনি পূর্বসংস্কারবশত উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করেছিলেন। আবার গজরাজ গ্রাহগ্রাসকালে (গ্রাহ– কুমির) আসন্ন মৃত্যু জেনে ভগবানের গুণকীর্তন করেছিলেন। মৃত্যুকালে পশুদেহে সুস্পষ্টভাবে নামকীর্তন অসম্ভব হলেও এ দুজন যেহেতু করেছেন, তাতে এ সিদ্ধান্তই প্রতিপাদিত হয় যে, **কীর্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ংপ্রকাশ, স্বরূপশক্তির বৃত্তি হওয়ায় জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না করেই স্বয়ং স্ফুরিত হয়।** শ্রীমন্মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ডের বনপথে চলতে চলতে বনের সমস্ত পশুকেও হরিনাম কীর্তন ও নৃত্য করিয়েছিলেন, এ ঘটনা থেকেও সে কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়।)

কৃষ্ণকীর্তনের যোগ্যতা

এ কৃষ্ণনাম কৃত্রিমভাবে হয় না। কীর্তনকারী নিজের শুদ্ধ অপ্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা চিন্ময় কৃষ্ণনাম কেবল সেবোন্মুখ হয়ে গান করতে সমর্থ। যেখানে গায়কের বৃত্তি অন্যাভিলাষময়ী অথবা কর্মজ্ঞানাচ্ছন্ন, সেখানে কৃষ্ণকীর্তন ফলানুসন্ধান করায় ভক্ত্যঙ্গ থেকে বিদায় গ্রহণ করে। সেজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে যে একমাত্র উপদেশ দিয়েছেন, তা হলো– "*তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা...*" অর্থাৎ প্রাকৃত সকল প্রকার অহঙ্কার রহিত হয়ে প্রাকৃত সর্বনিম্ন স্তরের তৃণের থেকেও নিজেকে সুনীচ জ্ঞানে তরুর মতো সহ্যগুণসম্পন্ন হয়ে নিজেকে সকল প্রকার প্রাকৃত অভিমান থেকে

বিমুক্ত করে অপরের প্রাকৃত অভিমানসমূহকে সম্মানপূর্বক জীব নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করবে। প্রাকৃত অভিমানের বশবর্তী হলে, নিজেকে প্রাকৃত জ্ঞান করলে, নিজেকে প্রাকৃত বস্তুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার যোগ্য মনে করলে, প্রাকৃত সম্মান লাভের লোভ করলে অথবা অন্য প্রাকৃত বস্তুর অসম্মান করলে অপ্রাকৃত হরিনাম সর্বদা কীর্তিত হয় না।

এ প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের একটি শ্লোক অর্থসহ উল্লেখ করা হলো–

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ (১/৩/২৫-২৬)

অর্থ : শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভাবের অঙ্কুর যাঁর বিকশিত হয়েছে, তাঁর ব্যবহারে নিম্নোক্ত নয়টি লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা– ক্ষমাশীলতা, মুহূর্তকাল যেন বৃথা না যায় সে ব্যাপারে সর্বদা সচেতনতা, ভোগে বিরক্তি, মিথ্যা অহঙ্কারশূন্যতা, আশাবন্ধঃ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির দৃঢ় সম্ভাবনা, উৎকণ্ঠা (শ্রীকৃষ্ণের জন্য), কৃষ্ণনামগানে সর্বদা রুচি, ভগবানের দিব্য গুণ বর্ণনায় আসক্তি এবং ভগবানের বসতিস্থলে অর্থাৎ মন্দির বা বৃন্দাবনাদি তীর্থের প্রতি প্রীতি। এদের অনুভাব বলা হয় অর্থাৎ ভাবের অধীনস্থ লক্ষণ। যে ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর জাত হয়েছে, এ গুণসমূহ তাঁদের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণকীর্তনের অযোগ্যতা

যে ব্যক্তি প্রাকৃত জন্ম-মাহাত্ম্যে মহিমান্বিত হয়ে আত্মশ্লাঘা বা আত্মপ্রশংসা করে, যিনি অতুল ঐশ্বর্য লাভ করে নিজেকে ধনী জ্ঞান করেন, যিনি বিপুল পরিশ্রম করে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন এবং যিনি কন্দর্পসদৃশ সৌন্দর্য লাভ করে নিজের রূপ-গরিমার আস্ফালন করেন, তিনি পদে পদে প্রাকৃত মাহাত্ম্যে মত্ততাক্রমে মূঢ় হয়ে যান। তিনি কখনোই অকিঞ্চনের মতো নিষ্কপট চিত্তে কৃষ্ণনাম করতে পারেন না। সুর-তালে আচ্ছন্ন ব্যক্তিও নামগানের অনধিকারী। যে ব্যক্তি সুর, তাল, লয়, মান প্রভৃতির সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন হয়ে নামরস আস্বাদন করতে বঞ্চিত হয়, তারাও কৃষ্ণনাম গানের অধিকার লাভ করতে পারে না। যিনি পরম আদরের সাথে কৃষ্ণগানের প্রতি উৎসাহী নন, তিনিও নামগানের অধিকারী হতে পারেন না। যিনি অবাস্তব উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে প্রতিষ্ঠার বশে নামকীর্তনে দম্ভ প্রকাশ করেন, তিনিও নামগানের অধিকারী হতে পারেন না। কেবল জড়বিষয়ে উদাসীন, অপ্রাকৃত সেবাপরায়ণ হয়ে নিষ্কপটচিত্তে যিনি একমাত্র নামগানে রত, তিনিই কৃষ্ণনাম গানের যথার্থ অধিকারী।

এখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর ঠাকুরের কিছু উপদেশ তুলে ধরা হলো–

১। নিষ্ঠার সাথে নিরন্তর হরিনাম করলে সকল অনর্থ বিদূরীত হয়। তখন শ্রীনামের রূপ, গুণ ও লীলা স্বয়ংই প্রকাশিত হয়। ভগবান যে তাঁর নাম থেকে অভিন্ন তা কেবল তখনই অনুভব করা যাবে, যখন সকল প্রকার অনর্থ দূর হবে। নিরপরাধে নাম গ্রহণ করতে পারলে অনর্থ সহজেই বিদূরিত হবে।

২। নামজপের সময় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে আহ্বান করা উচিত। প্রাথমিক অবস্থায় বিষয়চিন্তা আসতেই পারে, তাই হতোদ্যম না হয়ে অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সাথে নামগ্রহণের অভ্যাস করতে হবে। হরিনামের প্রতি প্রীতি জন্মালে বিষয়চিন্তার অবসান হবে এবং কায়মনোবাক্যে নাম গ্রহণের ফলে অচিরেই নামী পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ ও লীলার স্ফুর্তি হবে।

৩। শুদ্ধনাম গ্রহণের ফলে নামগ্রহণকারী ভক্তের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের প্রভাব নাশ হয়ে স্বরূপ প্রকাশিত হবে।

৪। নামাপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিরন্তর নামই গ্রহণ করতে হবে এবং সেইসাথে গুরু-গৌরাঙ্গ ও শুদ্ধভক্তগণের কৃপা প্রার্থনা করতে হবে।

৫। অসৎসঙ্গের প্রভাবমুক্ত হওয়ার সর্বাপেক্ষা ভালো উপায় হলো হরিনাম জপের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। সেইসাথে শ্রমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত আদি ভক্তিবিষয়ক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা।

৬। জীব যতদিন না কৃষ্ণনাম ভজনের প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে, ততদিন তার মঙ্গল হতে পারে না। সম্বন্ধজ্ঞানের সাথে হরিনাম গ্রহণ করলে সাধ্য লাভের পথ থেকে তাকে কোনো বাধাই ভ্রষ্ট করতে পারবে না।

৭। সংখ্যারক্ষণপূর্বক গভীর নিষ্ঠা ও পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে নাম গ্রহণ করতে থাকলে ভক্ত ধীরে ধীরে নাম ও নামী এবং গৌর ও কৃষ্ণের অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারবে। শ্রীগৌরাঙ্গই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা অপার আর শ্রীকৃষ্ণের মাধুরীমা অন্তহীন।

৮। পারমার্থিক প্রগতির জন্য বৈষ্ণবগণের সেবা, বদ্ধজীবদের কাছে ভক্তির প্রচার (জীবে দয়া) এবং নামভজন করা অত্যাবশ্যক। এ তিন কার্যের অনুকূল যা কিছু তা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিকূল হলে বর্জন করতে হবে।

৯। অনর্থনিবৃত্তির স্তরে অষ্টকালীন লীলাস্মরণের মতো উচ্চতর বিষয়সমূহ নিয়ে চর্চা করা উচিত নয়। প্রগাঢ় নিষ্ঠার সাথে নাম গ্রহণ করলে অবশ্যই স্বরূপ উপলব্ধি হবে। তাই ঠোঁট দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে নামগ্রহণ করতে হবে।

১০। ভবসমুদ্র অতিক্রম করার সর্বোত্তম উপায় হলো উন্নত ভক্তগণের সঙ্গে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করা। ভক্ত কতটা উন্নত, তা পরিমাপ করা যায় নামভজনের প্রতি তার আসক্তি কতটা তার ভিত্তিতেই।

"কৃষ্ণনামই সমস্ত বিদ্যা ও জ্ঞানের চরম পরিণতি। নিষ্ঠার সাথে কৃষ্ণনাম গ্রহণই ভগবদ্ভক্তি। যিনি নিরপরাধে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তিনি অচিরেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবেন।" –আর্ট অব্ ডিভোশন।

"শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভের পরই ভক্তিলতা প্রেমফল প্রদান করে। তার আগ পর্যন্ত মালি (নামসাধক) হরিনাম শ্রবণ-কীর্তনরূপ জল সে লতায় সিঞ্চন করতে থাকেন।"

শুদ্ধনাম সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ

'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে অপ্রাকৃত চেতনার উন্মেষ হয়। চিন্ময়স্বরূপে আমরা সকলেই কৃষ্ণভাবনাময়। কিন্তু অনাদিকাল ধরে জড় সঙ্গের ফলে আমাদের চেতনা কলুষিত হয়েছে। অথচ এ জড় জগৎ হচ্ছে মায়া। মায়া অর্থ, যা নয়। এ জড়া প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করার অপচেষ্টাই আমাদের মায়া। প্রকৃতপক্ষে আমরাই জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মে আবদ্ধ। কোনো ভৃত্য যখন কৃত্রিমভাবে তার প্রভুকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে, তখন বলা হয় সে মায়াগ্রস্ত। আমরা জড়া প্রকৃতিকে সম্পদ মনে করে ভোগ করার চেষ্টা করছি বটে, কিন্তু তার ফলে প্রকৃতপক্ষে আমরাই জড়া প্রকৃতির জটিল বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ছি।

সবকিছুর উপর আধিপত্য করার বাসনাই আমাদের হৃদয়ের সমস্ত কলুষের মূল কারণ। 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্ররূপ অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ উচ্চারণের ফলে তা বিদূরিত হয়। এ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে তৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করা যায়। এ শব্দতরঙ্গ সব ধরনের জড়চেতনা যথা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিজাত চেতনার ঊর্ধ্বে শুদ্ধ চিন্ময় স্তরে কীর্তিত হয়ে থাকে। এজন্য এর ভাষা বোঝা কিংবা মনের দ্বারা জল্পনা-কল্পনা বা বুদ্ধির দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। তাই যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে সবাই এ কীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারে। তারপর পারমার্থ সাধনে ক্রমোন্নতি ও উপলব্ধির ভিত্তিতে অপরাধমুক্তি হয়। শুদ্ধনামের স্তরে হরিনাম কীর্তনকালে আট প্রকার দিব্য আনন্দের আস্বাদন হয়, যথা : (১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) পুলক, (৪) স্বরভেদ, (৫) কম্প, (৬) বৈবর্ণ, (৭) আনন্দাশ্রুপাত এবং (৮) সমাধি। প্রাথমিক স্তরে এ অষ্টাসাত্ত্বিক বিকারসমূহ নাও হতে পারে; কিন্তু এ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে চিন্ময় স্তরে উপনীত হওয়া যায়। তার প্রথম লক্ষণ হলো, নামকীর্তনের সাথে সাথে নৃত্য করার প্রবণতা। আমরা তা বাস্তবেই দেখেছি। তাই একটি শিশুও কীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে যারা জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি

অত্যন্ত গভীরভাবে অনুরক্ত, তাদের ক্ষেত্রে আনন্দ লাভ করতে কিছু সময় লাগে। কিন্তু তারাও নামকীর্তনের প্রভাবে অচিরেই পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হতে পারে। ভগবৎপ্রেমে নিমগ্ন হয়ে শুদ্ধভক্তগণ যে হরিনাম কীর্তন করেন, তা শ্রবণ করা সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক। তাই শুদ্ধ ভক্তগণের শ্রীমুখ থেকেই হরিনাম শ্রবণ করা উচিত। অভক্তের মুখ থেকে হরিনাম শ্রবণ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। সর্পোচ্ছিষ্ট দুধ যেমন বিষাক্ত হয়ে পড়ে, তেমনি অভক্তের মুখ থেকে শোনা হরিনামও খারাপ ফল বয়ে আনতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদের আরও কিছু কথা

১। ভগবানের নাম এবং ভগবান অভিন্ন, নিয়মিত হরিনাম জপ করলে ভগবানের প্রতি যে কারো আসক্তি বৃদ্ধি পাবে। সেই অপ্রাকৃত স্বাভাবিক আসক্তি সমস্ত ইতর জড় ভোগ-বাসনা দূর করে নামগ্রহণকারীর হৃদয়কে সুনির্মল করবে।

২। ভগবানের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য যা দরকার, তা হলো দৈন্য ও আত্মনিবেদনের ভাব নিয়ে তাঁর নাম গ্রহণ করা।

৩। হরিনাম জপ করা উচিত সেবা ও শরণাগতির মনোভাব নিয়ে কৃষ্ণের কাছে করুণা প্রার্থনা করতে করতে। সেবার মনোভাব রহিত হয়ে নামজপ করলে কেবল শব্দমাত্র উৎপন্ন হয়, চিদনুভব হয় না।

৪। আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও ষড়গোস্বামীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। তাঁরা নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় মগ্ন থাকতেন, কখনোই বলতেন না– আমি কৃষ্ণের দর্শন পেয়েছি। বরং কেবল কান্না করতেন–‘কৃষ্ণ কোথায়, কৃষ্ণ কোথায়’ বলে। ভক্তগণও এভাবেই চিন্তা করবেন– কবে কৃষ্ণচন্দ্র আমায় দেখা দেবেন? কবে আমি ভক্তসঙ্গ করতে পারব? কবে আমার হৃদয় শুদ্ধ হবে? একজন ভক্তের ভাব গ্রহণ করে মহাপ্রভু স্বয়ং প্রেমাকুল হয়ে জগতের সর্বত্র কৃষ্ণকে খুঁজতেন।

৫। এ কান্না ভক্তিপথের চূড়ান্ত শব্দ। ভগবৎপ্রেম লাভের জন্য যে এভাবে কান্না করতে পারে, তার সাফল্য অনিবার্য।

৬। কীভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে হয়, এ প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন– “প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া অনেক কঠিন, কেননা তিনি পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু ভক্তরা তাঁর করুণাময়ী প্রকৃতির কোমলতার সুযোগ গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভের প্রার্থনা করেন, যার মূর্ত প্রকাশ শ্রীমতি রাধারাণী।”

৭। জড় জগতের দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধজীবকে প্রেম দানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত অচিন্ত্য শক্তিরাজি ও অসীম অপ্রাকৃত রূপ তাঁর নামে অর্পণ করেছেন, যার অচিন্ত্য শক্তি অজ্ঞানতাকে জ্ঞানে, গর্বকে বিনয়ে, ঈর্ষাকে প্রেমে এবং আসুরিক ভাবকে ভক্তভাবে পরিবর্তন করতে পারে।

৮। কৃষ্ণনাম দিব্যানন্দময়। তা পারমার্থিক সমস্ত প্রকার আশীর্বাদ আমাদের প্রদান করতে পারে, কারণ চিন্ময় রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁর নাম অভিন্ন।

৯। স্বয়ং ভয়ও নামের ভয়ে ভীত হয়, জন্ম-মৃত্যুর জটিল নিগড়ে আবদ্ধ জীব অবচেতনভাবে হরিনাম জপ করলেও সাথে সাথে এ জগৎ থেকে মুক্ত হতে পারে।

সিদ্ধি লাভের পথে

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-গীতিতে পরম সিদ্ধিলাভের যে পথ পরিক্রমার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে; তা উল্লেখ করা হলো :

নিজ-কর্মদোষ-ফলে, পড়ি ভবার্ণবজলে,
হাবুডুবু খাই কতকাল।

সাঁতারি সাঁতারি যাই, সিন্ধু অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল ॥
নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেইকালে আইলে তুমি, তোমা জানি কূলভূমি,
আশাবীজ হইল আমার ॥
তুমি হরি দয়াময়, পাইলে মোরে সুনিশ্চয়,
সর্বোত্তম দয়ার বিষয়।
তোমাকে না ছাড়ি আর, এ ভক্তিবিনোদ ছার,
দয়াপাত্র পাইলে দয়াময় ॥

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
'কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি' হৃদয়ে স্ফুরিল ॥
জানিলাম মায়াপাশে এ জড়-জগতে।
গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানামতে ॥
আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই' কৃষ্ণ হেরি– এ চিন্তা বিশাল ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয় ॥
নিমেষে হইল মোর শতযুগ-সম।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম ॥

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয়।
কি করি, কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয় ॥
ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ, মিনতি মানিয়া,
লওহে তাহারে সাথে ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ আর সহিতে না পারি।
পরান ছাড়িতে আর দিন দুই চারি ॥

গাইতে গাইতে নাম, উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কূলে।
বৃষভানুসুতা-স[illegible]ম নটবর রঙ্গে,
[illegible] ॥
দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন,
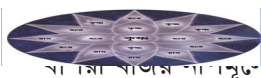
জ্ঞানহারা হইনু তখন।
কতক্ষণে নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হৈল মানি,
আর নাহি ভেল দরশন ॥

পর্ব দশ

যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্বকাননে।
রাধাসহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে ॥

সখী-আজ্ঞামতে করি দোঁহার সেবনন।
পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ ॥

কভু কৃপা করি, মম হস্ত ধরি,
মধুর বচন বলে।
তাম্বুল লইয়া, খায় দুই জনে,
মালা লয় কুতুহলে ॥

অদর্শন হয় কখন কি ছলে।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া জ্বলে ॥

যেখানে সেখানে থাকুক দু'জনে,
আমি ত চরণদাসী।
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা,
সকলে সমান বাসি ॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে-মরণে।
মোরে রাখি মারি সুখে থাকুক দু'জনে ॥

ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে,
পড়ি নিজ সখি পায়।
রাধিকার গণে থাকিয়া সতত,
যুগল চরণ চায় ॥

'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র তারক ও পারক উভয়ই হওয়ায় ব্রজপ্রেম লাভের জন্য সচেতন লোভের বশবর্তী হয়ে নামকীর্তন করতে থাকলে তা অতুল শক্তিমত্তা ও উদারতার সাথে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রেম-সেবার অধিকার দান করবে। ব্রজবাসীগণ এ সংকীর্তন করে থাকেন স্ব স্ব রুচি ও অভিষ্ট ভাব-সম্বন্ধ অনুসারে রস আস্বাদনের জন্য।

হরিনাম জপকৌশল

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপরাধমুক্ত হয়ে ভজন করাকেই সাধকের ভজন কৌশল বলেছেন– "*দশ অপরাধ ছাড়ি নামের গ্রহণ। ইহাই নৈপুণ্য হয় সাধনে ভজন ॥*"। তিনি এও বলেছেন যে, সাধনে নৈপুণ্য যোগ করলে অল্প সাধনেই ভক্তিলতার ফল যে প্রেম, তা লাভ করা যায়। তাই কীভাবে অপরাধমুক্ত হয়ে শুদ্ধনাম করা যায়, এ পর্বে এর ওপরেই কিছু ব্যবহারিক বিষয় আলোচিত হলো :

মনঃসংযোগের কৌশল

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ (৬/৫)

অর্থ : মানুষের কর্তব্য তার মনের দ্বারা নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করা, মনের দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করা কখনোই উচিত নয়। মনই জীবের অবস্থাভেদে বন্ধু ও শত্রু হয়ে থাকে।

অমৃতবিন্দু উপনিষদে (-২) বলা হয়েছে যে, মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়ের প্রতি আসক্ত মনই বন্ধনের কারণ এবং বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত মন মুক্তির কারণ। অতএব যে মন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত, তা পরম মুক্তির কারণ। একইভাবে শ্রীল প্রভুপাদও বলতেন– ভক্ত কৃষ্ণসেবায় এতই ব্যস্ত ও তৎপর থাকবে যে মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার তার অবসরই থাকবে না। যে ভক্ত কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দনরত এবং একাগ্রতার সাথে হরিনাম জপে উন্নতি সাধনের চেষ্টা করছেন, নামাপরাধ করার সময় তাঁর নেই।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি সর্বদা অপরাধের ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং সর্বক্ষণ তা নিয়েই চিন্তিত, তার মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব হ্রাস পেয়ে নেতিবাচক মনোভাব প্রবল হয়। অপরাধভীতির কারণে সে হরিনামে মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। বরং যা দরকার, তা হলো বিনম্রচিত্তে গভীর মনোযোগের সাথে হরিনাম জপ, কীর্তন ও শ্রবণ করা। তাই শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই ভক্তদের বলতেন– "কেবল নাম স্মরণ করো।" এক শিষ্য যখন শ্রীল প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেছিল যে, মনকে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ তাকে বলেছিলেন– "মন সংযত করার প্রয়োজন কী? তোমাকে তো কেবল নাম জপ করতে হবে এবং তা শ্রবণ করতে হবে; অন্যকিছু নয়। কেবল জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ আর শ্রবণ করতে হবে। ভাবনা-চিন্তা করার প্রশ্নই আসে না।"

মন তো চিন্তা করবেই। চিন্তা করাই তার ধর্ম (সংকল্প আর বিকল্প)। তাই চিন্তা করা থেকে তাকে বিরত করা অসম্ভব ব্যাপার। বরং বিষয় চিন্তার পরিবর্তে কৃষ্ণচিন্তা, কৃষ্ণস্মরণ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তো সেকথাই বলেছেন– "*মন্মন ভব*– তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো।" আর এর ফলে ভক্ত কী লাভ করেন? তিনি সেকথাও বলেছেন–

মচ্চিন্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ (গীতা ১০/৯)

অর্থ : যাঁরা আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছেন, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা আলোচনা করেন এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন।

আপনার মনকে জানুন

আপনার কাছে আপনার মন আপনার বন্ধু-শত্রু যাই হোক না কেন, তাকে নিয়েই আপনাকে চলতে হবে। মন আছে বলেই আপনি মানুষ। যার জন্য আপনি মানুষ, যাকে ছাড়া আপনি চলতে পারবেন না– তার সম্বন্ধে জানা আপনার অবশ্যই দরকার। তাই প্রতিদিন অন্তর্দর্শন, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমীক্ষণের দ্বারা আপনার মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হোন। প্রকৃতি ও চরিত্র সম্বন্ধে জানতে পারলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ হবে।

স্থূল দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ দেখা গেলেও মন সূক্ষ্ম দেহের অঙ্গ হওয়ায় তাকে দেখা যায় না; অথচ জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে অধিকাংশ মানুষ মনের দ্বারাই চালিত হয়ে থাকে। মনকে বুদ্ধি বা বিবেকের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তবে জীবনে প্রভূত উন্নতি সাধন করা যায়; কিন্তু মন অনিয়ন্ত্রিত হলে, জীবন বিচলিত হওয়ার সাথে সাথে হয়ে পড়ে অন্ধকারময়।

মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহই মানুষকে পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে মনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। মনের তিনটি ক্রিয়া; যথা : (১) চিন্তা, (২) ইচ্ছা ও (৩) অনুভব করা এবং স্তর তিনটি, যথা : (১) পরচেতন, (২) চেতন ও (৩) অবচেতন। সমস্ত স্মৃতি ও পূর্ব অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে সঞ্চিত থাকে।

মনকে একটি জলাশয়ের সাথে তুলনা করা যায়, যেখানে অসংখ্য চিন্তাতরঙ্গ প্রতিনিয়ত উৎপন্ন ও অন্তর্হিত হয়। একেই বলা হয় মনের বৃত্তি। সাধারণ মানুষের মনে প্রতি মিনিটে অসংখ্য বৃত্তির উদয় হয়ে থাকে। এ জগতে চিন্তার মতো প্রবল কোনো শক্তিই নেই। চিন্তাই সমস্ত কর্মোদ্যোগের উদ্ভাবক। যেকোনো কর্ম প্রথমে মনে চিন্তা করা হয়, তারপর স্থূল জড় দেহের সাহায্যে তা সম্পাদন করা হয়।

মন অসংখ্য সংস্কারে পূর্ণ। সংস্কার হলো পূর্বজীবনের চিন্তা-চেতনা ও অভিজ্ঞতার ছাপ, যাকে অবলম্বন করে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয়। পূর্ব ও বর্তমান জীবনের কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তি, অভ্যাস ও আচারসমূহ মনের মধ্যে প্রোথিত থাকে। সুপ্ত অবস্থা থেকে জেগে উঠে এরাই মানুষকে বিভিন্ন প্রকার কর্ম ও আচরণ করার জন্য বিশেষভাবে প্ররোচিত করে। শুধু তাই নয়, মন সর্বদা নিজের সাথে কথা বলছে– স্মৃতির পথ ধরে নানা পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করছে, জল্পনা-কল্পনা করছে, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করছে। এমনকি হরিনাম জপ কিংবা ধ্যানে বসলেও নানা চিন্তা উদিত হয়ে মনকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অতীতের ভোগবিলাস, রমণীয় দৃশ্যাবলি চলচ্চিত্রের মতো ক্রমাগত মানসপটে উদিত হয়ে ঘূর্ণিবায়ুর মতো মনকে চঞ্চল করে দেয়। কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণপূর্বক হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করলে, নামের কৃপা সেসবকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। ভগবান সৃষ্টির সবকিছু– একটি ধূলিকণা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি যদি চান, তবে আমাদের উন্মত্ত মনকেও মুহূর্তেই শান্ত করে দিতে পারেন। এজন্য তাঁর এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের কাছে কৃপা প্রার্থনা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। যেমন
দয়া করে তুমি আমাকে সাহায্য করো। আমার মনকে বশ করে একে তোমার

জার্মান দার্শনিক হেগেল একটি কথা বলেছেন– "You have to die to liv
মরতে হবে।" হ্যাঁ, আমাদেরও শুধু বাঁচা নয়, জীবনের পরম সফলতা লাভের জ
নিযুক্ত করতেই হবে। এজন্য কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া আমাদের গ
উপর পূর্ণ ভরসা করে নিরন্তর নাম গ্রহণ করলে যথাসময়ে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার
আর হবে না, ভগবৎ-উপলব্ধি, কৃষ্ণপ্রেম উভয়ই লাভ হবে।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এও বলেছেন–

অসংশয়ং মহাবাহো মনো মুর্নিগ্রহং চলম্
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে

অর্থ : হে মহাবাহো, মন যে দুর্দমনীয় ও চঞ্চল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।

এ শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, ক্ষুধার সময় ভোজন করলে ক্ষুধানিবৃত্তির সাথে সাথে যেমন তৃপ্তি ও শক্তি অনুভব হয়, তেমনি ভক্তির প্রভাবে মন বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত তৃপ্তি অনুভব করবে। আর অভ্যাস বলতে তিনি কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনকেই বুঝিয়েছেন। মানুষ অভ্যাসের দাস; তাই উত্তম অথবা অধম যে কর্মই করি না কেন, তা এক সময় আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, নিরপরাধে হরিনাম জপে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে যে কেউ কৃষ্ণপ্রেমের স্তরে উন্নীত হতে পারে।

নাম-ধ্যান

অরণি ঘর্ষণে অগ্নি

অরণি শব্দের অর্থ– অগ্নিমন্থন কাষ্ঠ, যে কাঠ ঘষে আগুন উৎপন্ন করা হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কীভাবে ভগবানের নাম ভগবানের রূপ বা মূর্তি প্রকট করে, সে সম্বন্ধে এক সুন্দর বর্ণনা আছে :

বহ্নের্যথা যোনিতস্য মূর্তির্ণ দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্যস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥ (১৩)
স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ (১৪)

কাঠ থেকেই আগুনের উৎপত্তি, কিন্তু ঘর্ষণের আগে কাঠে আগুন দেখা যায় না। ঘর্ষণের ফলে আগুন দৃষ্টিগোচর হয়। নিজের দেহকে সাধক নিম্ন অরণি (নিচের কাঠের টুকরো) এবং প্রণবকে উত্তর অরণি (উপরের কাঠের টুকরো) রূপে গ্রহণ করে বার বার ধ্যানরূপ ঘর্ষণের অভ্যাস করলে স্বপ্রকাশ পরমত্মাকে আগুনের মতো দেখতে পাবেন।

ব্যাখ্যা :

নিজ যোনি অর্থাৎ প্রকট হওয়ার স্থান কাঠের মধ্যে আগুনকে দেখা যায় না বলে এমনটি বলা যাবে না যে, আগুন নেই। আগুন অবশ্যই আছে এবং তা লাভ করা যায়। আগুনের সত্ত্বা স্বীকার করে দুটি কাঠ ঘর্ষণ করলে সেখান থেকেই আগুন পাওয়া যায়। তদ্রূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করলেও দেখা যায় না; কিন্তু ওঁ বা প্রণব জপরূপ সাধনার দ্বারা এ শরীরেই তাঁর সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। এর জন্য শরীরকে নিম্নের কাঠ এবং 'ওঁ' কে উপরের কাঠ হিসেবে গ্রহণ করে জিহ্বার দ্বারা জপ, মনের দ্বারা নিরন্তর পরমাত্মার চিন্তা করতে হয়। পরমাত্মার ধ্যানরূপ এ ঘর্ষণের ফলে হৃদয়ে সাক্ষাৎ পরমাত্মার দর্শন লাভ করা যায়।

আলোচ্য বিষয়ের অর্থ আরো দৃঢ় করার জন্য আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যেমন : পেষাই করে তিল বা সরিষা থেকে তেল, দধি থেকে মন্থনের দ্বারা মাখন এবং মাটি খননের দ্বারা কূপের জল পাওয়া যায়, তেমনি প্রত্যেকের দেহে ও নামে যে ভগবান বিদ্যমান, তাঁকেও একাগ্রতার সাথে হরিনাম জপ-কীর্তন ও শ্রবণরূপ ধ্যানের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হরিনাম জপ-কীর্তন ও শ্রবণে পূর্ণরূপে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে নামের কৃপা লাভ করা যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণের

রূপ-গুণ-লীলাও অনায়াসে দর্শন করা যায়। নির্মল চিত্তে কৃষ্ণ সবকিছু উন্মোচিত করেন– "*সেবোন্মুখো হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।*" শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, এমন অপূর্ব উপলব্ধি কৃষ্ণনাম বিনা লাভ করা অসম্ভব– "*রূপ-গুণ-লীলা-স্ফূর্তি নাম ছাড়া হয় না। রূপ-গুণ-লীলা হৈতে কৃষ্ণনাম হয় না ॥*" (প্রাকৃতরসশতদূষণী ৩১)

সবই দৃশ্যমান হবে

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমার স্বরূপ কী এ
পরিষ্কার উত্তর দিয়েছেন : হরিনাম গ্রহণের মাধ্যমেই অ
পরিষ্কার আকাশে ঝলমলে সূর্য উদিত হয়ে যেমন নি
অপরাধমুক্ত একনিষ্ঠ নামসাধকের হৃদয়াকাশে চিন্ময় নাম
তুলবে। এ বিষয়টি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁ

১। প্রথমে তোমাকে অপরাধশূন্য নামগ্রহণের স্তরে

২। তারপর হরিনামই তোমার কাছে তোমার স্বরূপ
স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ থেকে আলাদা বস্তু। তারপর যথাযথ
পরই তুমি শ্রীকৃষ্ণের রূপ সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পা

৩। এরপর শ্রীনাম তোমার বিশেষ গুণসমূহ তোমা
সৌন্দর্য সম্বন্ধেও তুমি উপলব্ধি করতে পারবে এবং

৪। তারপর চিন্ময় জগতে তোমার নির্দিষ্ট কার্যের সা
পারবে।

৫। সবশেষে তুমি তোমার নিত্যসেবা সম্বন্ধে উপলব্ধি

পত্রের শেষে তিনি এও লিখেছেন যে, এ সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি বলার কোনো প্রয়োজন নেই, একনিষ্ঠভাবে নাম গ্রহণের মাধ্যমে সবকিছুই প্রকাশিত হবে। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে–

সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল। / হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল ॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। / সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥

বৈধি ও রাগানুগা-নাম

স্বার্থ, ভয় ও কর্তব্যবোধে শাস্ত্রীয় বিধির বশবর্তী হয়ে হরিনাম গ্রহণ করাকে বৈধিনাম বলে। এমন নামজপে কোনো প্রেমের স্পর্শ নেই। বৈধি ভক্তির স্তরে ভক্ত মনে করেন, "আমি অধম, পাপীষ্ঠ আর কৃষ্ণ মহান, অনন্ত মহিমাময়।" পক্ষান্তরে রাগানুগা ভক্ত মনে করেন, "কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের। যেভাবেই হোক আমাকে ব্রজে গিয়ে তাঁর সেবা করতেই হবে।"

বৈধি ও রাগানুগা মার্গের ভক্তগণ যদিও একই নাম গ্রহণ করেন, তবু উভয়ের নামভজনের মধ্যে ভিন্নতা আছে। রাগানুগা মার্গের ভক্তগণ কৃষ্ণসেবা লাভের ঐকান্তিক বাসনা ও লালসা নিয়ে হরিনাম গ্রহণ করেন। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ ভক্তিসন্দর্ভে (৩১০) রাগের সংজ্ঞা দিয়েছেন– "বিষয়ী ব্যক্তির প্রিয় বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি ও প্রগাঢ় আসক্তিকে রাগ বলা হয়। তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আকৃষ্ট ও আসক্ত হয়ে প্রীতির সাথে কৃষ্ণসেবার জন্য প্রগাঢ় বাসনা বা তৃষ্ণাকে রাগ বলা হয়।"

যদি কেউ কৃষ্ণসেবার জন্য এমন বাসনা বা তৃষ্ণা নিয়ে রাধাকৃষ্ণের ধ্যানপূর্বক হরেকৃষ্ণ

মহামন্ত্র জপ-কীর্তন করেন, তবে তিনি অতি দ্রুত সার্থকতা লাভ করেন। সনৎকুমার সংহিতায় এমন ধ্যানের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনে রম্যে গোপগোভিরলঙ্কৃতে
কদম্বপাদপছায়ে যমুনাজলশীতলে।
রাধায়াসহিতং কৃষ্ণং বংশীবাদনতৎপরম্
ত্রিভঙ্গললিতং দেবং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥

অর্থ : রমণীয় বৃন্দাবনের গোপ-গোপী ও গাভীগণের দ্বারা অলঙ্কৃত শোভাময় বনের কদম্ব বৃক্ষতলে অথবা যমুনার স্নিগ্ধ-সুশীতল জলে আনন্দরসময় শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করছেন। ভুবনমোহন ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায় শ্রীরাধার পাশে দাঁড়িয়ে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মোহনবংশী বাজাচ্ছেন এবং তাঁর ভক্তগণের প্রতি অকুণ্ঠ কৃপা বিতরণ করছেন।

এ সংহিতায় এও বলা হয়েছে যে, এরূপ ধ্যান সহকারে কৃষ্ণনাম করলে দ্রুত কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। কৃষ্ণপ্রেম ছাড়াও এ নাম যে নামগ্রহণকারীকে নিত্য ব্রজবাসের অধিকার দেয়, তা পদ্মপুরাণেই উল্লেখ করা হয়েছে–

দ্বাত্রিংশদক্ষরং মন্ত্রং নামষোড়শকান্বিতম্।
প্রজপন বৈষ্ণবো নিত্যং রাধাকৃষ্ণস্থলং লভেৎ ॥

অর্থ : যে সকল বৈষ্ণব ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত মন্ত্র (হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র) জপ করেন, তাঁরা নিত্য ব্রজবাস লাভ করেন।

এ ভাব নিয়ে হরিনাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত কঠোর বিধি মেনে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম জপে অন্য বহু ফল লাভ হলেও কখনোই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায় না। সুতরাং নামগ্রহণকারীর চেতনা ও মনোভাব এবং মন্ত্রের অর্থ নিরূপণের ওপর তাঁর সফলতা নির্ভর করে।

এ সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃতে বলেছেন– "নামগ্রহণের সময় নামের স্বরূপ অর্থ আদরের সাথে অনুশীলনপূর্বক কৃষ্ণের কাছে সক্রন্দন প্রার্থনা করতে করতে কৃষ্ণকৃপায় ক্রমশ ভজনে ঊর্ধ্বগতি লাভ হয়। এমন না করলে কর্মী, জ্ঞানীদের ন্যায় সাধনে বহুজন্ম অতীত হয়ে যায়।"

তিনি আরো ব্যাখ্যা করেছেন যে, মায়াবাদী এবং জড়বিষয়কামীরাও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, কিন্তু মন্ত্র সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণার জন্য তারা পূর্ণ ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়। তারা জপ করে প্রধানত ভোগবিলাস বা মুক্তিলাভের আশায়। তাদের দ্বারা উচ্চারিত নামে নামাক্ষর থাকে; কিন্তু তাতে ভগবান থাকেন না। তাছাড়া চিন্তামণি হরিনাম ঐ জপকারীদের কিছু তুচ্ছ ফল প্রদান করেন, কিন্তু কখনোই কৃষ্ণপ্রেমরূপ চরম ফল প্রদান করেন না। কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তগণ তা জানেন। সেজন্য অন্য সবকিছুর চেয়ে তাঁদের কাছে হরিনামই অধিক আদরণীয়, সর্বক্ষণ হরিনামকেই তাঁরা হৃদয়ে ধারণ করে রাখেন।

হরিনাম জপের সময় নামাক্ষরসূহের অর্থ চিন্তনের সাথে সাথে দরকার ভগবানের কাছে সকাতর প্রার্থনা। যেকোনো মন্ত্রসিদ্ধির জন্যও মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি ও অর্থ স্মরণ-চিন্তনের গুরুত্ব অপরিসীম। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রের ১.২৮ সূত্রে এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন– "পবিত্র ধ্বনি 'ওঁ' ঈশ্বরবাচক। এর অর্থ অবধারণপূর্বক জপ করা

উচিত (তদ্‌জপস্তদর্থ ভাবনম্)"। আর যোগসূত্রের প্রথম ভাষ্যকার শ্রীল ব্যাসদেব বলেছেন– "যে যোগী মন্ত্রের শব্দ এবং এর অর্থের সম্বন্ধ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁকে অবশ্যই এর পুনরাবৃত্তি করতে হবে এবং মনকেও তা করার জন্য অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। এভাবে একাগ্রতা আসে।" কিন্তু ভক্তিযোগীদের ক্ষেত্রে একাগ্রতার অর্থ হলো হরিনামের চিন্ময় শব্দতরঙ্গে পূর্ণরূপে নিবিষ্ট হওয়া।

নামভজন গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিবিষ্ট হওয়ার কৌশল বর্ণনা করেছেন :

> নামজপের সময় নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণ ও লীলার কথা স্মরণ করো, সেইসাথে নামের অর্থও তোমার মনের কাছে ব্যাখ্যা করো। নামের রূপ ও অর্থ স্মরণকালে শ্রীকৃষ্ণের কাছে তোমার সক্রন্দন প্রার্থনাও করা উচিত। এভাবে নামানুশীলন করলে নামের করুণায় তোমার ভক্তিরও অগ্রগতি সাধিত হবে এবং ধীরে ধীরে তোমার চিত্ত কলুষমুক্ত হবে। তখন নির্মল হৃদয়ে শ্রীনাম তোমার জিহ্বায় আবির্ভূত হবেন। নাম পূর্ণরূপে উদিত হলে আনন্দঘনমূর্তি শ্রীকৃষ্ণেরও উদয় হবে।
>
> যত স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে নামের উদয় হয়, ভক্ত ততই শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভজনে উন্নতি লাভ করতে থাকেন। এ স্তরে ভক্ত গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন এবং তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে। ভজনকালেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ ও গুণের সম্মিলন দেখতে পান এবং তারপর তাঁর অপ্রাকৃত লীলাসমূহও।
>
> (নাম ভজন)

অনুরাগের সাথে শ্রীনামের অর্থ চিন্তনের কথা হরিভক্তিবিলাসেও উল্লেখ করা হয়েছে–

মনঃসংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থ চিন্তনম্।
অব্যগ্রত্বং অনির্বেদ্যো জপসম্পত্তি হেতবঃ ॥

অর্থ : মনোযোগী হওয়ার জন্য চিত্তের পবিত্রতা আবশ্যক। এর অর্থ নীরব থাকা এবং অর্থহীন প্রজল্প না করে মৌনতা অবলম্বন করা। জপের সময় মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করা উচিত। অব্যগ্রত্ব অর্থাৎ জড় কোনো বিষয়ের প্রতি লালায়িত না হওয়া, স্থৈর্য ও উৎকণ্ঠাশূন্যতা– এর সবই জপের সম্পত্তি হওয়ার কারণে সার্থক জপের অপরিহার্য অঙ্গ।

নামভজনে সফলতার জন্য ভক্তকে একসাথে তিনটি ভক্ত্যঙ্গ একসাথে অনুশীলন করতে হবে, যথা : **শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ**। সর্বোপরি আত্মনিবেদনের মনোভাব নিয়ে গভীরভাবে রাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলার ধ্যান করতে হবে। উপদেশামৃতে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদও এ কথা বলেছেন–

তন্নামরূপচরিতাদি সুকীর্তনানু–
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগী-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশ সারম্ ॥ (৮)

অর্থ : সমস্ত উপদেশের সারাংশ হলো– শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি প্রত্যেকেরই নিরন্তর উত্তমরূপে কীর্তন ও স্মরণ করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। এভাবে ক্রমে ক্রমে মন ভগবৎসেবায় নিয়োজিত হবে। তারপর ব্রজে বাস করে কৃষ্ণভক্তের আনুগত্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার সাথে সাথে তাঁর প্রিয় ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত।

লৌল্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর ভজনরহস্যে লিখেছেন যে, কৃষ্ণপ্রেম লাভের সুতীব্র লালসা বা লৌল্যই ভক্তের একমাত্র সম্পদ। এর অর্থ বস্তু লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, লোভ, তৃষ্ণা এবং অন্তর দিয়ে তা লাভের দুরাশা করা। এসম্বন্ধে শ্রীল

রায়রামানন্দ বলেছেন–

কৃষ্ণভক্তি রসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥ (চৈ. চ. মদ্য ৮/৭০)

অর্থ : কোটি কোটি জন্মের সুকৃতির দ্বারাও যা পাওয়া যায় না, তা কেবল একটি মাত্র মূল্য দিয়ে লাভ করা যায়–লোভ। সেই কৃষ্ণভক্তি রসভাবিত মতি যদি কোথাও পেয়ে থাকো, তবে তৎক্ষণাৎ তা কিনে নাও।

তবে জড় বিষয়ের প্রতি লোভ নিঃসন্দেহে এক কঠিন রোগ। এ থেকে আরোগ্য লাভ করা উচিত। নতুবা তা আমাদের তিলে তিলে কেবল ক্লেশ প্রদান করবে। কিন্তু কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য যে লোভ তা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। তা অবশ্যই বাড়ানো উচিত। উন্নতিকামী ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম লাভের তীব্র লালসার অগ্নিশিখা সর্বদাই চিত্তে প্রজ্বলিত রাখেন।

এ অগ্নিশিখাই তাঁর অনর্থ ও জড় বাসনাকে ভস্মীভূত করে। কৃষ্ণপ্রেম লাভের আজন্মলালিত বাসনা গাঢ়তাপ্রাপ্ত হয়ে এক সময় মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির মধুর সুর শ্রবণ এবং ব্রজগোপিকাগণের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ লীলাবিলাস ও মনোহর রূপ দর্শনের জন্য দিবানিশি তাকে ব্যকুল করে তুলবে। নাম গ্রহণের সময় আমাদেরও কৃষ্ণপ্রেম লাভের লোভ নিয়েই হরিনাম গ্রহণ করা উচিত।
"শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ ব্যর্থ নামজপ কখনোই সহ্য করতে পারতেন না। চিত্তে নামস্ফূর্তি না হওয়ায় তিনি প্রায়ই গঙ্গায় ঝাঁপ দিতেন। গলা পর্যন্ত জলে গিয়ে নামজপ করতেন, তারপর যখন নামস্ফূর্তি হতো কেবল তখনই উঠে আসতেন।" – প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর।

নামজপের আটটি নিয়ম

১। রাতে অন্নসহ অন্যান্য ভারী খাবার এড়িয়ে যথাসম্ভব হাল্কা খাবার গ্রহণ করুন। সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ুন এবং খুব ভোরে জেগে উঠুন। মঙ্গলারতির পর গভীর একাগ্রতা ও ভাবানুভূতি সহকারে হরিনাম জপ করতে থাকুন। ঘুম ঘুম ভাব এলে করতাল সহযোগে কিছুক্ষণ সুমধুর স্বরে কীর্তন করুন। তাতে তন্দ্রা দূর হবে, মনও সতেজ হয়ে উঠবে।

২। ভক্তসঙ্গে এবং তুলসীদেবী ও শ্রীবিগ্রহের সামনে বসে জপ করুন। মঙ্গলাচরণ করে নিরপরাধে জপ করার জন্য হরিনাম প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে স্মরণপূর্বক তাঁর কৃপা প্রার্থনা করুন। অশান্ত মনকে প্রার্থনা, প্রাণায়াম ও উচ্চৈঃস্বরে জপের দ্বারা শান্ত করুন। এর জন্য শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকটিও বার বার স্মরণ করুন।

৩। জপের পদ্ধতি :

ক) ঠিকভাবে বসুন; যোগশাস্ত্রে আছে, সোজা হয়ে বসলে মনঃসংযোগে সহায়ক হয়। সঠিকভাবে বসার অভ্যাস করলে দেহও নীরোগ, দৃঢ় ও কর্মঠ হয়। (গ্রহযামল ২/৮৫)

খ) নিরবচ্ছিন্নভাবে জপ করুন। লস এঞ্জেলসে একবার শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁর এক শিষ্য প্রশ্ন করেছিলেন, কী তাঁকে সবচেয়ে বেশি খুশি করবে। উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "একবারে বসে বিরামহীনভাবে পুরো ষোল মালা নামজপ সম্পন্ন করো।"

গ) স্পষ্টভাবে প্রত্যেকটি নামাক্ষর উচ্চারণের প্রতি মনোযোগ দিন।

৪। মনের সব চিন্তা এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করুন, শব্দতরঙ্গ শ্রবণের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিন।

৫। মনকে সংযত করুন :

ক) মন অন্য কিছুর দিকে ধাবিত হলে তাকে সচেতনভাবে সেখান থেকে প্রত্যাহার করে হরিনাম শ্রবণে নিয়োজিত করুন। তন্দ্রা এলে উঠে কিছুক্ষণ পায়চারি অথবা দু'একটি ব্যায়ামও করতে পারেন।

খ) গতকাল, গত সপ্তাহ, গত বছরের ঘটনা স্মরণ করার প্রবণতা বন্ধ করুন। মনপাখিটি দুটি ডানায় ভর করে ওড়ে, যথা : অতীত ও ভবিষ্যৎ। ওর ডানাদুটি কেটে দিন অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা বন্ধ করুন। কেবল জপ-কীর্তন-শ্রবণে মনোযোগ দিন। এ সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন–

"নিদ্রিত অতীতকে বিস্মৃত হও; ভবিষ্যতের স্বপ্ন আর দেখো না। কেবল যে সময়টুকু এখন (বর্তমান) তুমি পেয়েছো– তার সদ্ব্যবহার করো। তাতেই তোমার উন্নতি লাভ সুনিশ্চিত।" (শরণাগতি)

গ) আজ কী কী করণীয়– এ নিয়ে পরিকল্পনা বন্ধ করুন। অধিক প্রয়োজন হলে জপে সামান্য বিরতি নিয়ে সেসব লিখে রাখুন, তারপর প্রশান্তচিত্তে আবার জপ আরম্ভ করুন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে যে চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে– দৈন্য, সহিষ্ণুতা, মানশূন্যতা ও মানদাতৃত্ব, তা উপলব্ধি ও হৃদয়ে ধারণ করার চেষ্টা করুন।

৭। ধ্যান : জপের সময় শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামের রূপের ধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করুন। পূর্বতন আচার্যগণের দেওয়া নামের অর্থ চিন্তন করুন।

৮। মনোভাব : কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করার জন্য লোভ বা ব্যাগ্রতা এবং কান্না ও কাকুতি-মিনতির ভাব নিয়ে জপ করুন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "এ হরিনাম কীর্তন মায়ের জন্য একটি শিশুর কান্নার মতো।"

ভোগপ্রবৃত্তি নয়, কেবল সেবোন্মুখ ও কৃষ্ণপ্রীতির জন্য নাম গ্রহণ করলেই শুদ্ধনাম জপ-কীর্তন হয়। কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রীতির মনোভাবরহিত হয়ে নাম গ্রহণ করলে কেবল শব্দ বা আওয়াজ হয়, শুদ্ধনাম হয় না– 'নামাক্ষর বাহিরায়, নাম কভু নয়।' একে ভাবলেশহীন যান্ত্রিক জপের সাথেও তুলনা করা যায়।

নামজপ সম্পর্কিত শ্রীধর দাসের আট নিয়ম

১। হরিনাম জপের জন্য অনুকূল নির্বিঘ্ন পরিবেশ নির্বাচন করুন।

২। চোখ বন্ধ করে বিনয়, দৈন্য ও প্রার্থনার ভাব নিয়ে হরিনাম জপ ও শ্রবণে মনকে নিবিষ্ট করুন। দৃষ্টিপাতের ইতস্ততা এড়ানোর জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মাথা কাপড় দিয়ে আবৃত করার কথা বলেছেন।

৩। দৃঢ়তার সাথে সোজা হয়ে বসে প্রাণায়ামের সাহায্যে মনকে একাগ্র করুন। হরিভক্তিবিলাসেও গায়ত্রী জপের আগে প্রাণায়ামের বিধান দেওয়া হয়েছে।

৪। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষপূর্বক উপলব্ধি করুন; তারপর কেবল হরিনাম উচ্চারণ ও শ্রবণ বাদে বাকি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহকে প্রতিরোধ করুন।

৫। তৃণাদপি শ্লোকের চারটি দিব্যগুণ দৈন্য, সহিষ্ণুতা, গর্বশূন্যতা ও মানদাতৃত্বের দ্বারা মনকে আবিষ্ট করুন।

৬। হরিনাম জপের সময় সর্বদা এ মনোভাব বজায় রাখতে হবে যে, নামজপ মানেই রাধাকৃষ্ণের কাছে মিনতিপূর্ণ প্রার্থনা, কেবল তোতাপাখির কৃত্রিম বুলি নয়।

৭। জপকালে পূর্বতন আচার্যগণের দেওয়া হরিনামের অর্থ স্মরণ করুন।

৮। সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য-সাধন হরিনাম নিরপরাধে শুদ্ধভাবে গ্রহণের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমানন্দ লাভের অভিলাষ হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক রাখুন।

নামজপের পাঁচটি সূত্র

হরিনাম জপের নিম্নোক্ত পাঁচটি সূত্র যেন জীবনে প্রয়োগ করা যায়, তার জন্য নামপ্রভুর কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করতে হবে।

১। অনুরাগ

জীব কৃষ্ণের নিত্য-অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উভয়ের মধ্যকার এ সম্বন্ধও নিত্য। তাই উভয়ের মধ্যে অনুরাগ থাকাই স্বাভাবিক। না থাকাটা অস্বাভাবিক। কিন্তু জড়জগতে আবদ্ধ হয়ে জীব এ অস্বাভাবিক আচরণই করে থাকে। তারপরও এ জগতে যেসব ব্যক্তির সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাদের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে। সুতরাং সম্বন্ধই অনুরাগের কারণ। তাই কৃষ্ণের সাথে আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তা উপলব্ধি করতে হবে অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করতে হবে। এটি কেবল ভগবানের নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণই আমাদের দিতে পারেন। এজন্য তাঁদের সঙ্গ করতে হবে।

এ জগতে আবদ্ধ থাকলেও কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এ জগৎ ও জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কৃষ্ণের কৃপা ছড়িয়ে আছে। আমাদের জীবন ধারণের প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় উপাদান কৃষ্ণই সরবরাহ করছেন। সৌন্দর্যও যদি অনুরক্ত হওয়ার কারণ হয়, তবে কৃষ্ণের মতো সৌন্দর্য আর কার আছে? শুধু তাই নয়, জগতের সকল সৌন্দর্যের আধার ও উৎস শ্রীকৃষ্ণই। তারপরও আমরা যদিও তাঁকে ভুলে যাই তিনি আমাদের কখনোই ভোলেন না। দুঃখময় বদ্ধদশা থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য তিনি এ জগতে বার বার নেমে আসেন কখনো স্বয়ং, কখনো অবতাররূপে, কখনো বিগ্রহরূপে, কখনো ভক্তরূপে আবার কখনো নামরূপে। এ কলিযুগে নামরূপেই তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আর ভক্তরূপে স্বয়ং এসে তিনি দেখিয়ে গেছেন কীভাবে তাঁর নাম সাধনের মাধ্যমে সাধ্যরূপ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে মানবজীবনকে পরম ধন্য করা যায়। সুতরাং, এমন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর চেয়েও অধিক কৃপালু হরিনামের প্রতি যদি আমাদের অনুরাগ না হয়, তবে তা চরম দুর্দৈব ছাড়া আর কী হতে পারে? মহাপ্রভু স্বয়ং নামের মহিমা বর্ণনাপূর্বক আমাদের সে ইঙ্গিতই দিয়েছেন– "*নাম্নামকারি বহুধা......দুর্দৈবং ঈদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।*"

২। মনোযোগ

মন যদিও অবিশ্বাস্য গতিতে এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটে চলে, তবুও সে শাস্ত্রমতে এক সময়ে সে একাধিক বিষয়ে বা কাজে স্থির হতে পারে না; এক সময়ে কেবল সে একটি কাজই করে। একে বলা হয় মনের 'একমুখীতা তত্ত্ব'। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ তার পছন্দের কোনো বই পড়ায় নিবিষ্ট থাকে, তবে পারিপার্শ্বিক কোনো শব্দ সে শুনতে পাবে না। মনোযোগ অনুরাগের সাথে সম্পর্কিত। যার প্রতি মানুষ অনুরক্ত তার প্রতি মানুষের মনোযোগ বেশি থাকে। সুতরাং যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এবং তাঁর নামের প্রতি আমাদের প্রীতি ও অনুরাগ বাড়াতে পারি, তবে স্বাভাবিকভাবেই হরিনাম জপ-কীর্তনের প্রতি মনোযোগ হবে। এর জন্য নামপরায়ণ শুদ্ধভক্ত, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও রাধাগোবিন্দের কৃপা প্রার্থনা করতে হবে যেন তাঁরা আমাদের প্রীতি ও ভক্তি দান করেন।

৩। আত্তীকরণ

আত্তীকরণ অর্থ কোনোকিছুর সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া, নিমগ্ন হওয়া। যে বিষয় বা ব্যক্তির প্রতি আমাদের অনেক বেশি অনুরাগ ও ভালোবাসা থাকে, সাধারণত তার চিন্তায় আমরা নিমগ্ন হয়ে পড়ি। বার বার তার কথাই ভাবতে

ভালো লাগে এবং ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে পড়ি। একেই বলে আত্তীকরণ। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ সবই এক। যদি আমরা তাঁর নামে এমন তন্ময় হতে পারি, তবে অবশ্যই নামের কৃপাতেই আমরা উত্তরোত্তর শুদ্ধনাম করতে পারব। আর একবারও যদি শুদ্ধ কৃষ্ণনাম হয়, তবে সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার মতো আমাদেরও সমস্ত বিষয় বাসনারূপ অন্ধকার একেবারেই দূরীভূত হয়ে যাবে। তখন এমনিতেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের নামের প্রতি গভীর অনুরাগ ও প্রীতির উদয় হবে। এর জন্য আমাদের লোভ আর প্রার্থনা অবশ্যই নিষ্কপট ও তীব্র হতে হবে।

৪। আসক্তি

কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণনামের প্রতি আসক্তি দরকার। আসক্তি বা প্রবল আগ্রহের সাথে হরিনাম ভজন করার ফলে অচিরেই অনর্থ দূর হয়ে শুদ্ধনাম উদয় সম্ভব হবে। এজন্য নিষ্কপটে নাম প্রভুর কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করতে হবে।

৫। প্রীতি

জীবমাত্রই প্রীতির দ্বারা বশীভূত হয়। প্রীতির জন্য অনেকে জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করে। এমন প্রীতি যদি হরিনামের প্রতি থাকে তবে শীঘ্রই নামাপরাধশূন্য হয়ে শুদ্ধনাম গ্রহণপূর্বক কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হওয়া সম্ভব।

পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র জপ-কীর্তন

পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র জপকীর্তনের উপকার অনেক; কারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর, শ্রীবাস ঠাকুর ও অন্য ভক্তগণ তাৎক্ষণিকভাবে জপকারীকে পবিত্র করে তার পারমার্থিক উন্নতি ঘটান। তাঁরা কখনোই পতিত জীবদের কোনো অপরাধ নেন না। শুধু তাই নয়, নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করতেও তাঁরা আমাদের সহায়তা করে থাকেন। যেহেতু পতিতদের উদ্ধার করে তাদের পরম ধন কৃষ্ণপ্রেম দান করার জন্যই এ জগতে শ্রীগৌর-নিতাই আবির্ভূত হয়েছেন। পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে খুব সহজেই যে কেউ অপরাধ থেকেও মুক্ত হতে পারেন। অপরাধ থেকে মুক্তি ও হরিনাম গ্রহণের পূর্ণফল প্রাপ্তির জন্য তাই হরিনাম জপের পূর্বে পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র জপ করা উচিত। সুতরাং দোষের নিধি এ কলিযুগে 'পঞ্চতত্ত্ব' মহামন্ত্র 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রের চেয়ে কিছু অংশে কম জরুরি নয়।

জপ-বৈচিত্র্য

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে হরিনাম জপের তিনটি পন্থার কথা বলা হয়েছে; যথা : (১) মানসিক, (২) উপাংশু ও (৩) **বাচিক**। কোনো শব্দ না করে স্মরণের সাথে সাথে মনে মনে জপ করাকে মানসিক জপ বলা হয়। কেবল জপকারী শুনতে পায় এমন মৃদুস্বরে জপ করাকে উপাংশু এবং উচ্চৈঃস্বরে জপ করাকে বলে বাচিক জপ। এ সম্বন্ধে ভাগবতে (১০/৩৪/১৭) বলা হয়েছে– "হে অচ্যুত, তোমার নাম উচ্চারণকারী নিজের সাথে সাথে সেই নামধ্বনি যারা শ্রবণ করেছে, তাদেরও পবিত্র করেন।" আবার নারদীয় পুরাণে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, "যিনি নিঃশব্দে জপ করেন, তাঁর তুলনায় উচ্চৈঃস্বরে জপকারী একশত গুণ বেশি ফল লাভ করেন, নিঃশব্দে জপকারী কেবল নিজেকে মুক্ত করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে জপকারী জপ শ্রবণকারী অন্য অনেককে মুক্ত করেন।" শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "বর্তমান যুগে জপে মনঃসংযোগ করা খুব কঠিন। তাই যদি তুমি উচ্চৈঃস্বরে জপ করো, তবে অন্তত 'কৃষ্ণ' ধ্বনিটি শুনতে পাবে, তখন কৃষ্ণস্মরণ করা সহজ হবে।"

শুদ্ধনাম জপের পাঁচটি শক্তিশালী সূত্র

যেকোনো শাস্ত্রের শেষ কথাটিই যে ঐ শাস্ত্রের সর্বা
দেখতে পাই। ভগবদ্গীতার শেষ উক্তি– "*সর্বাধর্মান*
অনরূপভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শেষ অধ্যায়েও
শ্রীমন্মহাপ্রভু পরিষ্কার করেছেন– যা এর আগে অন্য
করার জন্য এ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। এক বি
অত্যন্ত আনন্দের সাথে তা নিয়েই এ দুই পার্ষদের স

হর্ষে প্রভু কহে
নামসংকীর্তন– কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
নামসংকীর্তন হইতে সর্বানর্থ-নাশ।
সর্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস ॥

অন্ত্য ২০/৮-১১)

উপায় হলো সেই বস্তু, যার মাধ্যমে আমরা অপ্রাপ্ত লক্ষ্যবস্তু লাভ করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, ধনুক হলো উপায়, যার দ্বারা তীর ছুড়ে দূরে পাঠানো যায়। মজার ব্যাপার হলো, নামগ্রহণের বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতেই তীর-ধনুকের উপমাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

"বৈদিক মন্ত্র 'ওঁ' হচ্ছে ধনুক, শুদ্ধ জীব স্বয়ং বাণ এবং ভগবান হলেন লক্ষ্যবস্তু।"
ভাগবত ৭.১৫.৪২

কৃষ্ণভক্তদের ক্ষেত্রে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র হলো ধনুক, শুদ্ধজীব বাণ আর লক্ষ্যবস্তু হলেন রাধা-কৃষ্ণ। বদ্ধ জীব (ধনুর্ধারী) সঠিকভাবে ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করতে পারলে তার জীবনের লক্ষ্য অর্জিত হবে। যদি বাণকে লক্ষ্যভেদ করতে হয় অথবা নামজপের মাধ্যমে জীবকে রাধাকৃষ্ণের কাছে পৌঁছাতে

হয়, তবে লক্ষ্যবস্তুর দিকে নিশানা করার সময় তাকে অমনোযোগী হলে চলবে না। কীভাবে নামজপের দ্বারা তীরকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে নিশানা করতে হয় তা আমাদের জানা দরকার।

আপনি কি মহামন্ত্র জপ করেন?

যদি করে থাকেন, তবে ভগবৎপ্রেমের চিন্ময় আনন্দ কি লাভ করেছেন?

যদি না করে থাকেন, তার মানে আপনি হয়ত প্রকৃতপক্ষে জানেনই না কীভাবে আপনার তীর-ধনুককে ব্যবহার করতে হয়। শুদ্ধনাম গ্রহণে নামজপকারীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আমরা ভাগবত থেকে তীর-ধনুকের উপমাটি গ্রহণ করেছি এবং বছরের পর বছর গবেষণা করে গৌড়ীয় শাস্ত্রসমূহের পাশাপাশি আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ আপনাদের সামনে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করেছি। আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, বর্ণিত পাঁচটি সূত্র ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পারলে যে কেউ ভজনজীবনে এর অলৌকিক ফল লাভ করবেন। এ সূত্রগুলোর প্রয়োগ করেই আপনি রাধাকৃষ্ণের কাছে পৌঁছার যোগ্যতা লাভ করতে পারবেন। সামান্যতম সম্বন্ধজ্ঞান সহকারেও যদি কেউ নামজপ শুরু করে, সেও দিব্যানন্দ লাভ করবে– উন্নত ভক্তগণের কথা তো কল্পনাই করা যায় না। নামজপের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ অঙ্গীকারপূর্বক বলেছেন, "ভক্তির এ পাঁচ অঙ্গ এতোই শক্তিশালী যে যেকোনো একটির প্রতি আকর্ষণও একজন নবীন ভক্তকেও ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় স্বাদ আস্বাদন করায়।"

শ্রীনামাষ্টকের প্রথম শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলেছেন– উপনিষদসমূহ মূর্তি ধারণপূর্বক ধূপ, দীপ ও পুষ্পের দ্বারা আরতি করার পর হরিনামকে সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের রাজা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।"

নামকীর্তন সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিনটি উপদেশ–

* **অপরাধশূন্য হয়ে নামগ্রহণ।**
* **নিষ্কপট দৈন্য সহকারে নামগ্রহণ।**
* **প্রেমলাভের সুতীব্র বাসনা নিয়ে নামগ্রহণ।**

এ তিন উপদেশ মেনে নাম গ্রহণ করলে প্রেমোদয় হয়।

কীর্তন-বাণের বিষয়গুলো যেহেতু শাস্ত্র থেকে নেয়া হয়েছে, তাই নামগ্রহণের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই অত্যন্ত সহায়ক হবে।

কীর্তন-বাণ

(বাণ শব্দের ইংরেজি ARROW-এর প্রত্যেক বর্ণ অনুসারে পাঁচটি সূত্র আলোচনা করা হয়েছে।)

A : Alignment (বিন্যস্তকরণ) সম্পূর্ণ উপস্থিতির সাথে দেহ, মন ও হৃদয়কে

	সমরেখায় স্থাপন করুন। অপরাধ বর্জন করুন।
R : Relationship (সম্বন্ধ)	রাধাকৃষ্ণের সাথে আপনার নিত্য সম্বন্ধের ব্যাপারে সজাগ থাকুন। এ সম্বন্ধের অনুশীলন দ্বারা নিজেকে সিক্ত করুন।
R : Rendering Service (ভগবৎসেবা সম্পাদন)	প্রেমপূর্ণ সেবাভাব নিয়ে নামগ্রহণ করুন। হরিনামের মাহাত্ম্য নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করুন।
O : Opening the Heart (হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ)	শ্রীগৌরচন্দ্র যে বিরহ ও আকাঙ্ক্ষার ভাব নিয়ে কীর্তন করতেন, আপনিও সে ভাবের অনুশীলন করুন। নামজপ শুদ্ধ ভক্তিভাবে পূর্ণ করুন।
W : Welcome the Divine Gift (দিব্য উপহারকে স্বাগত জানানো)	শরণাগতির ভাব নিয়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নামপ্রভুর উপহারটি লাভের জন্য প্রতীক্ষা করুন।

Alignment (বিন্যস্তকরণ)

নামভজনে প্রবেশ করার জন্য প্রথমে আমাদের নিজেদের বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। এর অর্থ একই রেখায় নিয়ে আসা অথবা যথাযথভাবে সংযুক্ত করা। ঠিক যেমন ভালোভাবে চালানোর আগে গাড়ির প্রত্যেকটি অংশ ভালোভাবে বিন্যস্ত করতে হয়।

যদি নামসাধনায় কেন্দ্রীভূত হয়ে শক্তি অর্জন করতে চাইলে নামগ্রহণের জন্য নিজেকে বিন্যস্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তিনটি বিষয়কে বিন্যস্ত করতে হবে, যথা : দেহ, মন ও হৃদয়।

দেহ স্থির করুন

নাম সাধনার জন্য আপনার দেহকে লক্ষ্য করুন। এমন জায়গায় বসুন। তারপর স্পষ্টভাবে হরিনাম উচ্চারণ করুন। সুন্দর একটি তালে নামোচ্চারণ করার সাথে সাথে সঠিকভাবে মালার গুটিকায় তা গণনা করুন। এমন ভঙ্গিতে বসুন যাতে আপনি সর্বাধিক একাগ্রতা বজায় রাখতে পারেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতে প্রতি মালা নাম জপ করার জন্য ছয় থেকে সাত মিনিট সময় নেয়া যেতে পারে। এর চেয়ে সামান্য দ্রুত অথবা ধীর গতিতে জপ করলে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। কিন্তু যদি এমন হয় যে, এক মালা জপ তিন মিনিটে শেষ হয়ে যায় আবার পনের মিনিটেও এক মালাই শেষ হয় না; তবে পরীক্ষা করে দেখুন আপনি মনোযোগের সাথে জপের সাথে সাথে সঠিকভাবে গুটি হিসাব করছেন কিনা। নতুবা নামজপের স্বাদ আপনার চলে যাবে।

মনকে স্থির করুন

মনকে কেন্দ্রীভূত করার সার কথা হলো, মন যেখানেই ধাবিত হোক না কেন, তাকে ধরে নামজপের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য আপনি একটি কার্ডে হরিনাম লিখে তার দিকে (অথবা রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ, ছাবি, মানসপট) তাকিয়ে জপ করতে পারেন। জপের সময় আপনার মানসপটে লেখা হরিনাম পড়তে পড়তেও জপ করতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শুধুই নামোচ্চারণের শব্দের প্রতি পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা : "তোমাকে জপ করতে হবে এবং তা শুনতে হবে। জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করে তা শুনতে হবে। কেবল এটুকুই। মন নিয়ে ভাবার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?" (প্রাতঃভ্রমণ, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫, হাওয়াই)

হৃদয়ের ভাব স্থির করুন

নামজপের সময় হৃদয়ের ভাব স্থির করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর শ্রীভাগবতার্ক মরীচিমালা গ্রন্থে জপকারীর মনোভাবের কথা বলেছেন–

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥

অর্থ : হে অরবিন্দাক্ষ, অজাতপক্ষ পক্ষীশাবক যেমন মাতার আগমনের প্রতীক্ষা করে, রজ্জুবদ্ধ গোবৎস যেমন ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে কখন স্তন্য পান করবে তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, বিষণ্ণা প্রেয়সী পত্নী যেভাবে প্রবাসী পতির দর্শন লাভের অপেক্ষা করে, আমার মনও সর্বদা সেভাবে আপনার সেবার আকাঙ্ক্ষা করছে।

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণাকৃষ্ণাবিত্যনেক-স্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্ধিতাং নামধেয় ॥

অর্থ : হে অঘদমন, হে যশোদানন্দন, হে নন্দসূনো, হে কমল-নয়ন, হে গোপীকান্ত, হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে প্রণতকরণ, হে কৃষ্ণ, ইত্যাদি অনেক স্বরূপে হে নাম, তুমি জীবের ভববন্ধন মোচনের জন্য প্রকটিত থেকে অপার করুণা প্রদর্শন করছ; অতএব হে নাম, তোমাতে আমার অনুরাগ প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হোক।

প্রকৃতপক্ষে, হৃদয় স্থির করে মনোযোগের সহিত নামজপ বলতে নামীর প্রতি গভীর আসক্তি নিয়ে জপ করাকে বোঝায়।

Relationship (সম্বন্ধ)

জীবন্ত নাম গ্রহণের দ্বিতীয় ধাপ হলো কৃষ্ণের সাথে আমাদের নিত্য সম্বন্ধবোধ বজায় রেখে নামজপ করা।

হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে (৩/১৫) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন,

যদি কৃষ্ণের সাথে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ অবগত না হয়ে নামজপ করি, তবে আমরা কেবল তার ছায়া লাভ করব, শুদ্ধ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতে পারব না। যদি আপনি শুধু খাবারের ছায়া ভক্ষণ করেন, তবে কি আপনার ক্ষুধানিবৃত্তি হবে? তখন ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য আপনি বাধ্য হয়ে অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করবেন। একইভাবে, মায়ার মধ্যে সুখ খোঁজার প্রবণতা থাকার কারণে আমরা হরিনাম জপের সময়ও কেবল নামের ছায়া আস্বাদন করি। তখন পারমার্থিকভাবে আমাদের হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আমরা ইচ্ছা করেই নামাপরাধ করি। এসব অনর্থের কারণে এবং আমাদের প্রকৃত স্বার্থবিরুদ্ধ কাজ করার ফলে আমাদের পারমার্থিক প্রগতি চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। কৃষ্ণের সাথে আমাদের যথার্থ সম্বন্ধ উপলব্ধিপূর্বক মনকে সঠিকভাবে স্থির করার জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি সহজ ধ্যানের পন্থা উল্লেখ করেছেন–

*** আমি অণুচৈতন্য নিত্য কৃষ্ণদাস,**

*** কৃষ্ণ বিভুচৈতন্য– আমার একমাত্র প্রভু এবং**

*** এ জড়জগৎ আমার প্রবৃত্তিশোধক কারাগার**

এ জ্ঞানকে সম্বন্ধ জ্ঞান বলা হয়।

তুমি চিন্ময় আত্মা, কৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেবল কৃষ্ণের সাথে সম্বন্ধ উপলব্ধির জন্যই তুমি এ জগতে আছো।" এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে–

কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥

কেউ যদি একবার ঐকান্তিকভাবে বলেন, "হে কৃষ্ণ যদিও বহুকাল আমি এ জড় জগতে তোমাকে ভুলে ছিলাম, কিন্তু আজ আমি তোমার শরণাগত হচ্ছি। আমি তোমার হলাম, এখন তুমি আমায় তোমার সেবায় নিযুক্ত করো।" তাহলে কৃষ্ণ তখন তাকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন।

Rendering Service (ভগবৎসেবা সম্পাদন)

হরিনাম জপের তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে ভগবৎসেবার ভাব নিয়ে নামজপ করা। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর শ্লোক রচনা করেছেন–

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদগ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

অর্থ : অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ লীলা কখনো প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। জীব যখন সেবোন্মুখ হয় অর্থাৎ চিৎস্বরূপে স্থিত হয়ে কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন অপ্রাকৃত জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনাম আদি স্বয়ংই স্ফুর্তি লাভ করে।

আমারদের দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ জড়। কিন্তু কৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কৃষ্ণকে উপলব্ধি করার আশাই করতে পারি না; অবশ্য কৃষ্ণ আমাদের জিহ্বায় আবির্ভূত হতে পারেন। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, কৃষ্ণ সেবোন্মুখ হয়ে যাঁরা তাঁর নাম গ্রহণ

অর্থ যাঁর মুখ কৃষ্ণের দিকে। কৃষ্ণ কেবল সেবা মনোভা
না থাকলে আমরা কেবল ছায়া-হরিনাম জপ করব, কে
তাই কৃষ্ণসেবার মনোভাব নিয়ে জপ করুন এবং কৃষ্ণে
সেবায় যুক্ত করেন। আপনার জীবনের কেন্দ্র থেকে ত
অর্থ নিহিত কেবল তাঁর প্রীতিবিধানের মধ্যেই, এর বাই
প্রতীক্ষা করি, তবে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ শুষ্ক নামজপের ম
জাগতিক জীবনের তখনই পরিসমাপ্তি হবে, যে মুহূর্তে ত
আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। তা করার জন্য একটি উ
দিয়েছেন, তা স্মরণ করা :

"হে শ্রীমতি রাধারাণী, হে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ত
আরেকবার শ্রীল প্রভুপাদ মহামন্ত্রের অর্থকে আরো সং

ভগবদ্গীতায় (৯.২৬) ভগবান ইঙ্গিত দিয়েছেন কীভাবে সেবা করতে হয়। তিনি ভক্তিসহকারে কেবল পত্র, পুষ্প, ফল প্রদান করার কথা বলেছেন। এ শ্লোকে তিনি ভক্তি শব্দটি দু'বার উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে

তিনি আসলে আমাদের ঐকান্তিক ভালোবাসার প্রতি আগ্রহী করতে চেয়েছেন।
তাই প্রেমময়ী সেবার ভাব নিয়ে জপ করুন, কীর্তন অথবা হরিকথা যেভাবেই হোক অন্যের কাছে হরিনামের মহিমা বর্ণনা করুন। যখন আপনি জপ বা কীর্তন করবেন তখন আপনার মনকে আপনার নতুন প্রকল্পের কথা জানান: "আমার এ জপ-কীর্তন কেবল কৃষ্ণের জন্য।" এবং কৃষ্ণকে সরাসরি সম্বোধন করুন "কৃষ্ণ, এ জপ-কীর্তন কেবল তোমার জন্য।" এ উপলব্ধি জপ-কীর্তনে উন্নতি সাধনে সহায়ক হবে।

Open the Heart (হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করুন)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে এক সরল প্রার্থনার মাধ্যমে হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করা যায়, যেখানে তিনি হরিনাম কীর্তনের সমস্ত ভাব ব্যক্ত করেছেন :

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

অর্থ : হে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর (দাস) হয়েও স্বকর্মবিপাকে বিষম ভব-সমুদ্রে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ চিন্তা কর।

সংস্কৃতে একে বলা হয় বিপ্রলম্ভ ভাব বা বিরহ ভাব। পারমার্থিক জীবনে বিরহের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ হয়। বাহ্যিকভাবে কৃষ্ণ ও ভক্তের মধ্যে অসীম দূরত্ব থাকলেও আভ্যন্তরীণভাবে কৃষ্ণ ভক্তের হৃদয়েই অবস্থান করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদগণের জীবনী অনুসরণ করে আমরাও বিরহভাব অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিভাব নিয়ে নামজপ করতে পারি । শ্রীল প্রভুপাদ একবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে কৃষ্ণভাবনার সর্বোচ্চ উৎকর্ষের কথা ব্যক্ত করেছিলেন–

"'কৃষ্ণ কোথায়? কৃষ্ণ কোথায়?' বলে উন্মাদের মতো সর্বদা কান্না করার নামই প্রকৃত কৃষ্ণভাবনামৃত। শ্রীকৃষ্ণের জন্য উন্মাদ হওয়ার মধ্যেই কৃষ্ণভাবনার চরম উৎকর্ষ নিহিত। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আমাদের সে পন্থাই প্রদর্শন করে গেছেন; গোস্বামীগণও সেই একই পন্থা প্রদর্শন করেছেন।"

ভাগবত প্রবচন (৬.১.৩৯), ২০
জুলাই ১৯৭৫, সানফ্রান্সিস্কো

এ জগৎ আমাদের প্রকৃত আলয় নয় তা জেনে যাঁরা এর মায়া পরিত্যাগ করেছেন, তাঁরাই কেবল এ বিরহ ভাব অনুভব করতে পারবেন। বদ্ধজীব তাদের প্রকৃত আলয়ের অনুসন্ধান করে না, যা এ জগতের অতীত। যখন আমরা হৃদয় থেকে এর জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করব, তখন আমরাও সেই ভাব বুঝতে পারব। এ ভাবকে বোঝাতে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন "আমার গোবিন্দকেই প্রয়োজন"। এ জগৎ আমাদের পারমার্থিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। কেবল রাধাকৃষ্ণই তা করতে পারেন।

Welcome the Divine Gift (দিব্য উপহারকে স্বাগত জানান)

উপযুক্ত গ্রহীতা হওয়ার জন্য এ পঞ্চম ধাপের প্রয়োজন। এটি সম্ভব হবে তখনই, যখন নামের কাছে আমরা পূর্ণরূপে শরণাগতির ভাব গ্রহণ করব এবং এমন প্রত্যয় থাকবে যে হরিনামই আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রদান করবে। ভক্তি ভগবান প্রদত্ত উপহার। আমরা আমাদের নিজের চেষ্টায় এ ভক্তি লাভ করতে পারি না। কিন্তু এমন কিছু কি আছে, যার দ্বারা আমরা কৃষ্ণের কাছ থেকে এ উপহার নিতে পারব? হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে, আপনি তাঁর শরণ নিন। কীভাবে কৃষ্ণের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় সে বিষয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন–

ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥

শ্রীনন্দনন্দন কার প্রার্থনা শুনবেন? যিনি শরণাগতির ছয়টি পন্থা অনুশীলন করেন।

জগদানন্দ পণ্ডিত বলেছেন–

“যদি শুদ্ধভক্তির পথে উন্নতি চান, তবে বহু পারমার্থিক বিধি পালনের প্রয়োজন নেই। কেবল কৃষ্ণনামের আশ্রয় গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করুন; এর দ্বারাই আপনার হৃদয় ও চেতনাকে পরিশুদ্ধ করুন।” –প্রেমবিবর্ত, অধ্যায় ৭

দ্রৌপদীর জীবনে আমরা এমন শরণাগতির দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। কৌরবেরা যখন প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে চেয়েছিলো, তখন দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণের নাম ধরে ডেকেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ উপস্থিত হতে বেশ সময় নিচ্ছিলেন। কেননা কৃষ্ণকে ডাকলেও দ্রৌপদী পিতামহ ভীষ্ম, স্বামীগণ এবং রাজসভায় উপস্থিত সভাসদগণের কাছেও সুরক্ষার আশা করেছিলেন। কিন্তু যখনই তিনি দেহ, মন, হৃদয় সমর্পণ করে দুবাহু তুলে আকুলভাবে কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন, তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে রক্ষা করলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন,

“মহাভারতে কৃষ্ণ বলেছেন, আমি যখন দ্রৌপদীর কাছ থেকে দূরে ছিলাম, তখন সে গোবিন্দ বলে আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকেছিলো। এ আহ্বানের কারণে আমি তার কাছে ঋণী হয়ে যাই, যা ক্রমেই আমার হৃদয়ে বাড়তে থাকে...। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারাও একইভাবে কৃষ্ণ ও তাঁর শক্তিকে আহ্বান করা হয়। কল্পনা করুন, যদি কেউ নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তবে তাঁর কাছে কৃষ্ণ কতটা ঋণী হতে পারেন। এমন ভক্তকে ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে কীভাবে সম্ভব?”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন কীভাবে হরিনাম ভক্তের দেহ ও মনে চিন্ময় আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ করায়–

লইনু আশ্রয় যাঁ’র
হেন ব্যবহার তাঁ’র
বর্ণিতে না পারি এ সকল
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়,
যাহে যাহে সুখী হয়
হেন বল করয়ে প্রকাশ ॥

শরণাগতি, শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, শ্লোক ৫

যদি হরিনামের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান, তবে আপনাকে অবশ্যই শরণাগতির অঙ্গসমূহ অনুশীলন করতে হবে। শরণাগত জীবন প্রথম প্রথম কঠিন লাগতে পারে, তাই হরিনামের শরণাগত হোন। নামপ্রভুর চরণে আশ্রয় নেয়ার মনোভাব নিয়ে জপ করুন।

“আমি এখানে তোমাদের শিক্ষা দিতে আসিনি, এসেছি তোমাদের অনুরোধ করতে– অনুগ্রহপূর্বক তোমরা হরিনাম

জপ-কীর্তন করো। দয়া করে এ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে চেতনা পরিশুদ্ধ করে তোমাদের চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করো।"

প্রাতঃভ্রমণ ১৯৭৪

কীর্তন বাণের এ পাঁচটি বিষয় আমাদের নিয়মিত অনুশীলন করা উচিত। রাতারাতি আমরা শুদ্ধনাম করার আশা করতে পারি না। আমাদের গন্তব্য বহু দূর, সেখানে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে; তাই প্রতিদিন একঘন্টা, দু'ঘন্টা অথবা অন্তত দশ মিনিট পূর্ণ মনোনিবেশের সাথে জপ করা উচিত। এ মনুষ্য শরীর নিত্য পারমার্থিক জীবন লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ। তাই এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যহার করুন।

কীর্তন-বাণের এ অনুশীলন আপনি আপনার সুবিধামতো করতে পারেন। যদি এর মধ্যে একটিও আপনার জন্য অনুকূল হয়, তবে সেটিই আপনি আপনার জপচর্চায় প্রয়োগ করতে পারেন। এর দু-একটির চর্চাও আপনাকে রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে পৌঁছে দিতে পারবে।

হরিনামের আশ্রয় গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের দুটি আবশ্যকীয় বিষয়ের কথা বলেছেন–

* সর্বদা বিনয়ের সাথে নামজপ করতে হবে (*তৃণাদপি সুনীচেন...*)

* ভগবানের বিরহ অনুভব করে জপ করতে হবে– যিনি এ সংসার-সমুদ্র থেকে আপনাকে উদ্ধার করার জন্য অপেক্ষা করছেন।

পরিশেষে, এ কথাটা স্মরণ রাখা উচিত যে, অত্যন্ত সুকঠিন কাজও ভগবানের কৃপাবলে অত্যন্ত সরল হয়ে যায়। কৃষ্ণ কেবল তাঁর শরণাগতজনের মাঝেই কৃপা বিতরণ করেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এতই করুণাময় যে, তিনি অকাতরে কৃপা বিতরণ করেন। তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিক্ষা অনুযায়ী মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন–

দন্তে তৃণ ধরি গোরা ডাকি হে তোমারে।
কৃপা করি এসো আমার হৃদয় মন্দিরে ॥

যদি ভগবান স্বয়ং সাহায্য করার জন্য সর্বদা আমাদের কাছে থাকেন, তবে অসম্ভব বলে কিছু থাকার কথা নয়। হরিনাম জপের জন্য এ উত্তম প্রচেষ্টাই শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করে এবং তিনি তাতে সাড়া দেন; কিন্তু চরম পর্যায়ে এ কথা বলা যাবে না যে, আমাদের কঠিন প্রচেষ্টার জন্যই তিনি তা করে থাকেন। প্রেমপূর্ণ সেবাই কেবল তাঁকে প্রীত করতে পারে।

হরিনামে রুচি বৃদ্ধি করুন

পারমার্থিক উন্নতির তিন ফল

১। ভক্তি

কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণসেবার প্রতি গভীর আকর্ষণ ও অনুরাগ। ভক্তি ভক্তি থেকেই আসে। সুতরাং ভক্তির সহকারে কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণনাম করলেই কেবল ভক্তি লাভ হতে পারে। আর ভক্তসঙ্গই ভক্তির সূতিকাগার। দু'ভাবে ভক্তসঙ্গ হয়, যথা :

(ক) সঙ্গগ্রহণ– সাধু-মহতের উপদেশ ও নির্দেশ পালন করা।
(খ) সঙ্গদান– অন্যের কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করা।

২। অনুভাব

ভক্তিমূলক বস্তুর প্রতি গভীর ভালোবাসা। নামকীর্তন ও বিগ্রহ আরাধনার মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের দিব্য গুণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে ভক্তিমূলক বিষয়ে গভীর অনুরাগ অনুভব করা।

৩। বিরক্তি

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসেবার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে অবাঞ্ছিত জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তি অনুভব করা।

শ্রদ্ধার আবশ্যকতা

পারমার্থিক জীবনে আমরা আমাদের হারানো সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি। শ্রদ্ধাহীন মানুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সাধন করা অসম্ভব। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "হে পরন্তপ, এ ভগবদ্ভক্তির প্রতি যাদের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা আমাকে লাভ করতে পারবে না। তাই তারা এ জড় জগতের জন্ম-মৃত্যুর পথে ফিরে আসে।" তবে বিভিন্ন মাত্রার শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু পরিপূর্ণ সিদ্ধির জন্য সবচেয়ে তীব্র ও সুদৃঢ় শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের প্রয়োজন। কোনো জড়বস্তু থেকে এ শ্রদ্ধা লাভ করা যায় না। কেবল সাধুসঙ্গ ও হরিনাম করলেই তা লাভ করা যায়।

সংক্ষেপে নামজপের ফল

* নিরপরাধে নাম গ্রহণ করলে অবাঞ্ছিত সব বিষয় থেকে হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায়।
* মনোযোগপূর্ণ নামজপ শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদকে আহ্বান করে।
* একবার তাঁর আশীর্বাদ পেলে আপনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণসেবার প্রবৃত্তি জন্মাবে এবং বৈচিত্র্যময় সেবার পরিস্ফুটন হবে আপনার হৃদয়ে। অর্থাৎ আপনার জীবন মঙ্গলময় হয়ে উঠবে।
* এমন আশীর্বাদ ও মঙ্গলের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে আপনি আপনার হৃদয়ে ভক্তিদেবীকে স্বাগত জানাবেন।
* এর পরই আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষিত উপলব্ধি লাভ করবেন– কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণনাম পরস্পর অভিন্ন।
* তারপর কৃষ্ণপ্রেমের পথে আপনি দ্রুতই অগ্রসর হতে থাকবেন এবং দিব্যানন্দসমুদ্রে অবগাহনের মতো নবনব প্রেমানন্দরস আস্বাদন করবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে যে চারটি দিব্যগুণের কথা বলেছেন, তা নিষ্ঠাবান নামকীর্তনকারী প্রত্যেকেরই অর্জন করতে হবে। তার মানে, জীবনে যাই কিছু হোক না কেন যদি কারো এ গুণগুলো থাকে, তবে তিনি সব পরিস্থিতিতে হরিনামের আশ্রয়ে থাকতে সক্ষম হবেন। কিন্তু যদি না থাকে, তবে সর্বদা পরিবর্তনশীল জীবনপ্রবাহে মানুষ কখনো হয়ত অত্যন্ত অমনোযোগের সাথে নামগ্রহণ করবে অথবা মোটেই করবে না। সেজন্যই যদি আমরা সব পরিস্থিতিতে নিষ্ঠার সাথে হরিনাম করতে চাই, তবে এ গুণসমূহ অবশ্যই অর্জন করা প্রয়োজন।

তিন ধরনের দৈন্য

১। হীনমন্যতা

এটি প্রথম প্রকার দৈন্য, যা দুর্বলমত মানসিকতার পরিচয় এবং পারমার্থিক জীবনের জন্য তা একেবারেই কাম্য নয়। এটি মিথ্যা দৈন্য, তা আসে মানসিক অস্থিরতা ও হীনমন্যতা থেকে। এ স্তরে মানুষ আসলে স্থূল মিথ্যা অহঙ্কার

ও দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা নিজের পরিচয় নির্ধারণ করে। এ ধরনের মানুষ নিজেকে মূল্যহীন মনে করে এবং অন্যদের তুলনামূলক ভালো অবস্থানের জন্য অশান্তি বোধ করে। কারণ এতে তার মিথ্যা অহম বিপর্যস্ত হয় এবং এভাবে তার নিজের প্রতি করুণা আরো বৃদ্ধি পায়। এ হীনমন্যতা পারমার্থিক জীবনের জন্য মোটেও উপকারী নয়। এ স্তরের যেকোনো মানুষ দেহাত্মবুদ্ধির উর্ধ্বে কিছুই ভাবতে পারে না।

২। অনুতাপ

এ ধরনের দৈন্য আসে অনুতাপ থেকে। যেমন ধরুন, কেউ হয়ত জানে যে, ভগবান এতোই মহান ও উদার যে তিনি তাঁকে লাভ করার পন্থাটি অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন– কেবল তাঁর নাম গ্রহণের মাধ্যমে, এমনকি স্থান-কাল-পাত্র ও বিধির বিচার না করেই যেকোনো অবস্থায় তাঁর নাম গ্রহণ করলে অনায়াসেই তাঁর কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর এতোই দুর্দৈব যে এমন নামের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ জন্মাচ্ছে না। কৃপা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি থেকেই এ অনুতাপ। এ ধরনের দৈন্য মিথ্যা অহঙ্কারের দ্বারা ততো বেশি প্রভাবিত নয়।

তবুও এ উভয় প্রকার দৈন্য কেবল নিজের সীমিত অনুভূতি থেকে উৎপন্ন হয়, যাতে কেবল আত্মকেন্দ্রিকতা থাকে। এ সম্বন্ধে মাধ্বাচার্য বলেছেন, “যখন কেউ নিজেকে স্থূল দেহ বলে পরিচয় দেয়, তখন তার মধ্যে অপরিমিত কাম বাসনা ও নিদ্রা থাকে এবং এর দ্বারা তার অভ্যন্তরীণ শান্তি সর্বদাই ভস্ম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা মন ও কল্পনার ভিত্তিতে তাদের নিজেদের পরিচয় দেয়, তারা এর ফল হিসেবে আশঙ্কা ও ভয় লাভ করে এবং শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ে। যখন কেউ বুদ্ধির ভিত্তিতে নিজের পরিচয় দেয়, তাকে তার অস্তিত্বের জন্য তিক্ততা ও হতাশা ভোগ করতে হয় এবং যারা মিথ্যা অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে নিজের পরিচয় দেয়, তারা হীনমন্যতায় ভোগে।”

অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

চেতনাকে জাগ্রত করে হীনমন্যতাকে যথাযথভাবে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে আমরা অবশ্যই হতভাগা, যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের জন্য এত বড় কৃপা করা সত্ত্বেও আমরা তা গ্রহণ করিনি। অতএব অনতিবিলম্বে তা গ্রহণ করা উচিত। আর তা না করার জন্য যে কষ্ট বা অনুশোচনাবোধ হবে, তা আমাদের কর্মফলকে নাশ করবে। তাই বাস্তবতার নিরিখেই নিজেকে অত্যন্ত অধঃপতিত জীব বলে মনে করা উচিত, যে তার পারমার্থিক জীবন চর্চার সুযোগ হারিয়েছে এবং সেইসাথে গভীরতর পারমার্থিক জীবনে প্রবেশ করার জন্য দৃঢ়সংকল্পও হতে হবে।

৩। কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় দৈন্য

এ দৈন্যই আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। কারণ
দৈন্য আত্মা থেকে আসে যখন আমরা আমাদের পরিচয়
আমাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে আমাদের পরিচয় দিই। এ স্ত
কারণে আমরা গর্বশূন্য হই। তখন সচেতনতার সাথে স্বে
এবং আমরা এও বুঝতে পারি যে গুরুদেব ও কৃষ্ণের কৃ
অবস্থায় কেউ আমাদের প্রশংসা করলেও, আমরা তা গুরু
এমন যথার্থ দৈন্যের জন্য কী করা দরকার?

আমাদের কর্তব্য

ক) অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আমরা আমাদের দেহ,
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও নিত্যসেবক।

খ) জগতের সবকিছু অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে দর্শন করা এব
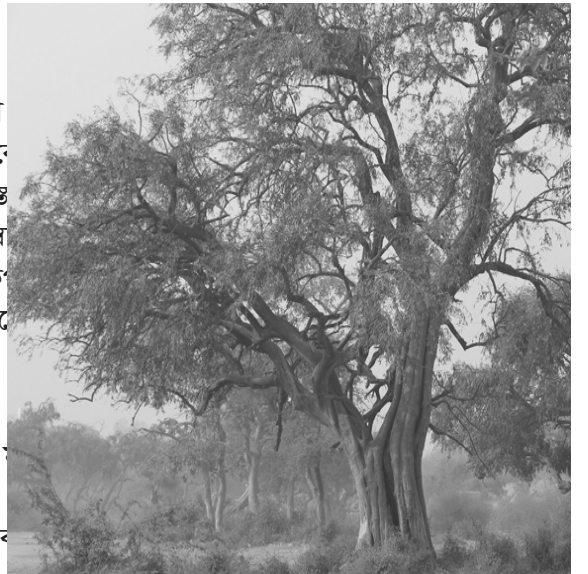
গ) জীবনের যেকোনো পরিস্থিতিতে সহিষ্ণুতা ও দৈন্যের সাথে নামানুশীলন করা।

শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী বলেছেন যে, মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে বর্ণিত চার নীতি অনুসরণ করে যিনি হরিনাম গ্রহণ করবেন, তিনি নিশ্চিত জীবনের চরম সাধ্য রাধাকৃষ্ণের চরণপদ্ম লাভ করবেন–

ঊর্ধ্ববাহু করি কহোঁ, শুন সর্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ (চৈ. চ. আদি ১৭/৩২)

তিনি এও বলেছেন–

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥ (চৈ. চ. ২২/৩৩)

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "কৃতজ্ঞতাবোধ হৃদয়েরই এক অবস্থার নাম, যেখানে পারমার্থিক উন্নতি সংঘটিত হতে পারে।" তাই এ মানবদেহ দেওয়ার কারণে কৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমাদের সাধন-ভজনের প্রত্যেকটি দিন শুরু করা উচিত। গুরুদেবসহ পারমার্থিকভাবে যাঁরা আমাদের সাহায্য করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

বিষয় সম্বন্ধে

সম্রাট কুলশেখর বিষয়ের প্রতি বিরক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির কথা বলতে গিয়ে অত্যন্ত চমৎকার কিছু কথা বলেছেন– "এ দেহ প্রতি পদক্ষেপে দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত, তাপ, ঠাণ্ডা, হতাশা আদি দুঃখসহ তথাকথিত অনেক সুখ আমার কাছে প্রতিনিয়তই আসে। এ শরীর এখন খুব সুন্দর দেখালেও অবশেষে তা মারা যাবে। কেউই তা এড়াতে পারবে না। দেহ পুনরায় পঞ্চভূতে পরিণত হবে। যদি জিজ্ঞেস করেন, "এর নিরাময় কী?" তবে আপনার এখনই জানা উচিত : অনন্ত শক্তিশালী কৃষ্ণরূপী অমোঘ ঔষধ পান করুন! একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আপনার দেহের মৃত্যু চিরতরে নিরাময় করতে পারেন।" (মুকুন্দমালা স্তোত্র)

বৃক্ষ এবং জীবন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

জীবনকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করে এর তিনটি পরিধি নির্ধারণ করা যায়, যথা : (১) ব্যক্তিগত যত্নশীলতা (মূল), (২) সহায়ক জীবনধারা (কাণ্ড) ও (৩) অন্যের জীবনে ভূমিকা (ফুল-ফল)। বৃক্ষের ক্ষেত্রে যেমন গভীরে প্রোথিত সুদৃঢ় মূল, মজবুত কাণ্ড এবং সজীব ও স্বাস্থ্যকর শিখর থাকলে স্থির-অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সাথে সাথে মানুষের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হয়, তেমনি মানুষের জীবনের ভিত্তিস্বরূপ সম্বন্ধজ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তিরূপ অভিধেয়ের (হরিনাম কীর্তন সহকারে নববিধা ভক্তি যাজন) প্রয়োজন। এ ভিত্তি অগভীর হয়, তবে জীবনবৃক্ষ সহজেই ভেঙ্গে পড়বে।

সহায়ক জীবনধারা বলতে মানুষের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতাকে ও শারীরিক কল্যাণ নির্ভর করে তিনটি স্তম্ভের ওপর, যথা : স্বাস্থ্য সঠিক জীবনধারা। এজন্য মনিসিক সাধনা– সত্যবাদিতা, অসৎসঙ্গ অতিরিক্ত কিছু ব্যবহার না করা, ক্ষমাশীলতা ও নির্ভীকতা, হৃদয়ের
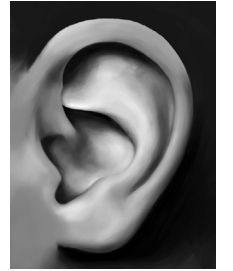
সাথে কায়িক বা শারীরিক সাধনা– শুচিতা বজায় রেখে ইন্দ্রি... য় নিযুক্ত করা প্রয়োজন। সবশেষে অন্যের জীবনকে পারমার্থিকভাবে সমৃদ্ধ করাকে বৃ... য় তুলনা করা হয়।

হরিনামই সকল সাধনার মূল

যদি আমরা হরিনামকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে গুরুত্ব দিই, প্রশাখা-পাতায় জল সিঞ্চনের মতোই বোকামী করা হবে। মূলস্বরূপ হরিনাম সাধনই আমাদের সর্বতোভাবে করা কর্তব্য *নাহিক আর চৌদ্দভুবন মাঝে।*" গভীর মনোযোগের সাথে হ

* সাধুসঙ্গ, বিশেষ করে গুরুদেব এবং অন্য প্রবীণ ভ
* বিষয়ীসঙ্গ থেকে দূরে থাকা এবং
* দৃঢ়সংকল্প ও অদম্য উৎসাহের সাথে হরিনাম জপ করা।

"হরিনাম সমস্ত চিন্ময় রসের মূর্তপ্রকাশ (চৈতন্য-রসবিগ্রহ)। তাই জীবনের একমাত্র কর্তব্য হিসেবে

সাধু ও শাস্ত্রের কথা শুনে নামকীর্তনের প্রতি বিশ্বাস জন্মাবে

প্রসাদ নৃত্য ও কীর্তনের জন্য আমাদের শক্তি যোগাবে

নামকীর্তনের রস আস্বাদনের জন্য নামকীর্তন করা প্রয়োজন

কৃষ্ণপ্রেমের প্রাথমিক পর্যায় ভাবস্তরে নামকীর্তন করার জন্য নামকীর্তনে রস আস্বাদন করা প্রয়োজন

এবং চিন্ময় জগতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন ভাবস্তরে সংঘটিত স্বতঃস্ফূর্ত নাম-সংকীর্তন

ভাব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হলো জীবের অধিকার ও স্বরূপ অনুসারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের যেকোনোটির প্রাথমিক রস লাভ করা
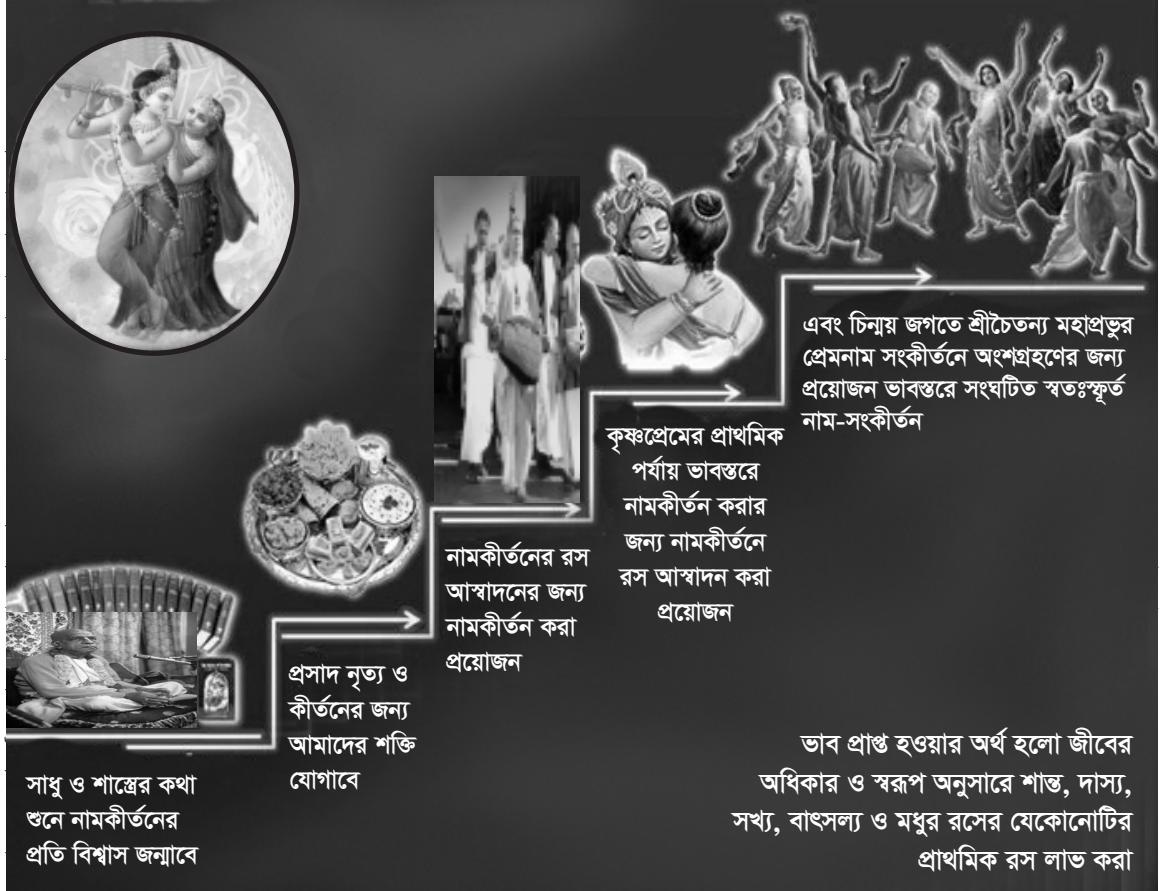
পদ্মপুরাণে অবৈষ্ণবের মুখ থেকে হরিকথা বা হরিনাম শ্রবণকে সর্পোচ্ছিষ্ট দুধের সাথে তুলনা করে সর্বতোভাবে তা শ্রবণ করা থেকে বিরত থাকার কথা বল

অবৈষ্ণব মুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
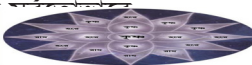
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

অর্থ : অবৈষ্ণবের মুখ থেকে গীত বা কীর্তিত হরিকথা (বা হরিনাম) শ্রবণ করা উচিত নয়। সর্পোচ্ছিষ্ট দধ

যেমন

অবৈষ্ণ

যায়।

পরিশিষ্ট

হরিনামের মহিমা সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রোক্তি

(১)

সংকীর্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্‌গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্বশক্তি দিল নামে করিয়া বিভাগ।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

(২)

দশে পাঁচে মিলে নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

শ্রীনারদীয় পুরাণে বলা হয়েছে–

(৩)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

অর্থ : কলিযুগে হরিনাম, হরিনাম, কেবল হরিনামই গতি। কলিতে ধ্যান, যজ্ঞ ও পরিচর্যা আদি অন্য গতি নেই।

(৪)

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যাঃ গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

অর্থ : গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য ঋষিগণ কলিযুগের প্রশংসা করে থাকেন; যেহেতু কলিতে কেবল সংকীর্তনের দ্বারা সর্বস্বার্থ লাভ হয়।

(৫)

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোঃ মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥

অর্থ : সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের মাধ্যমে যজন করে এবং দ্বাপরযুগে অর্চন আদির দ্বারা যে ফল লাভ হতো, কলিযুগে কেবল ‘হরেকৃষ্ণ’ মহামন্ত্র কীর্তনেই সে সমস্ত ফল লাভ হয়।

(৬)

সত্যে ধ্যানে ত্রেতায় যজ্ঞে দ্বাপরে অর্চনে।
মিলে যাহা কলিতে তাহা কেশবকীর্তনে ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীনারদের উক্তি–

(৭)

অহো সুনির্মলা যূয়ং রাগো হি হরিকীর্তনে।
অবিধূয় তমঃ কৃৎস্নং নৃণাং নোদিতি সূর্যবৎ ॥

অর্থ : নারদ বললেন আহা! তোমাদের অন্তঃকরণ কী সুনির্মল, যেহেতু হরিনামকীর্তনে তোমাদের অনুরাগ দেখা যাচ্ছে; কেননা আগে অন্ধকার বিনাশ না করে যেমন সূর্যের উদয় সম্ভব হয় না, নামসূর্যও তেমনি আগেই তোমাদের হৃদয়ের তম (পাপমলঃ) ধ্বংস করে রসনায় উদয় হয়েছেন।

(৮)

পাপানলস্য দীপ্তস্য মা কুর্বন্তু ভয়ং নরাঃ।
গোবিন্দনামমেঘৌঘৈর্নশ্যতে নীরবিন্দুভিঃ ॥ (গরুড় পুরাণ)

অর্থ : হে নরগণ! তোমরা দীপ্ত পাপবহ্নি দেখে ভীত হয়ো না; গোবিন্দ নামরূপ মেঘপুঞ্জের বারিবিন্দুর দ্বারা ঐ পাপাগ্নি একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

(৯)

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্তিতে সর্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব ॥

অর্থ : বাঘের দ্বারা অবরুদ্ধ হরিণ যেমন ভয়ে আকুল হয় এবং অকস্মাৎ আগত সিংহকে দেখে ভয় পেয়ে বাঘ পলায়ন করলে হরিণ মুক্ত হয়, তদ্রূপ পাপী লোক অবশ হয়েও হরিনাম কীর্তন করলে অনায়াসে সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে থাকে।

(১০)

যন্নামকীর্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমং।
মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতুনামিব পাবকঃ ॥

অর্থ : মার্জন ও প্রক্ষালন দ্বারা যেমন সুবর্ণ আদি ধাতুর বাইরের মলই শুধু নষ্ট হয়, ভেতরের ময়লা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু অগ্নির দ্বারা বাহ্য ও অন্তর্মল উভয়ই বিনষ্ট হয়ে সম্যকভাবে শোধিত হয়, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা জীবের শুধু বাইরের পাপমাত্রই বিনষ্ট হয়, অন্তরের পাপবীজ বা পাপবাসনা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু নামকীর্তন দ্বারা বাইরে প্রকাশিত পাপবীজ, পাপবাসনা সমস্তই সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

(১১)

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং
প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাং।
অনেকজন্মার্জিতপাপসঞ্চয়ং
হরত্যশেষং শ্রুতমাত্র এব ॥ (বামন পুরাণ)

অর্থ : নিজের কার্যের দ্বারা প্রসিদ্ধ চোর যেমন সংসারে পরিচিত হয়ে থাকে, নারায়ণ নামরূপ চোরও তেমনি সারা পৃথিবীতে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সামান্য তস্করের দ্বারা বাইরের অর্থাদি অপহৃত হয়ে থাকে বটে, কিন্তু এ তস্করের নাম শ্রবণ মাত্রই অন্তরের অনেক জন্মার্জিত পাপভার নিঃশেষ হয়ে যায়।

(১২)

গোবিন্দেতি তথা প্রোক্তং ভক্ত্যা বা ভক্তিবর্জিতৈঃ।
দহতে সর্বপাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ (স্কন্দ পুরাণ)

অর্থ : 'গোবিন্দ' নাম ভক্তি বা অভক্তি যেরূপেই হোক উচ্চারিত হলেই তা যুগান্তকালীন সমুত্থিত অগ্নির ন্যায় সকল পাপ দগ্ধ করে থাকেন।

(১৩)

প্রমাদাদপি সংপৃষ্টো যথাহনলকণো দহেৎ।
তথৌষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং হরিনাম দহেদঘম্ ॥ (কাশীখণ্ড)

অর্থ : প্রমাদবশতও অগ্নিস্পর্শে যেরূপ দেহ দগ্ধ হয়, সেরূপ যেকোনোরূপে হরিনাম অধরে স্পৃষ্ট হলেই সমস্ত পাপ দগ্ধ করে থাকে।

(১৪)

নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাং।
একমেব হরের্নাম সর্বপাপবিনাশনং ॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

অর্থ : মমতার দ্বারা ব্যাকুলচিত্ত বিষয়ান্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে একমাত্র হরিনামই সর্ব পাপবিনাশক।

(১৫)

হরিহরি সকৃদুচ্চরিতং দস্যুচ্ছলেন যৈর্মনুষ্যৈঃ।
জননীজঠরমার্গলুপ্তা ন মম পটলিপি বিশন্তি মর্ত্যাঃ ॥ (যমরাজ উক্তি)

অর্থ : যেসব মানুষ ছলক্রমেও 'হরি'র নাম একবারমাত্রও উচ্চারণ করে, তাদের জননীজঠর পথ লুপ্ত হয়ে যায় এবং তারা আর আমার পটলিপি মধ্যে প্রবেশ করে না অর্থাৎ তারা মুক্ত হয়ে যায়।

(১৬)

হত্যাযুতং পানসহস্রমুগ্রং গুর্বঙ্গনাকোটিনিষেবণঞ্চ।
স্তেয়ান্যনেকানি হরিপ্রিয়েন গোবিন্দনাম্না নিহতানি সদ্যঃ॥

(পদ্মপুরাণ, নারদ উক্তি)

অর্থ : লোকে যদি অযুত ব্রহ্মহত্যা, সহস্র ভীষণ সুরাপান, কোটি গুর্বঙ্গনা গমন এবং অসংখ্য বিপ্র স্বর্ণাদি অপহরণ করে, তাহলেও হরিপ্রিয় গোবিন্দনামে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

(১৭)

অনিচ্ছয়াপি দহতি স্পৃষ্টো হুতাবহো যথা।
তথা দহতি গোবিন্দনামব্যাজাদপীরিতং॥

অর্থ : অনিচ্ছায় অগ্নিস্পর্শ হলেও যেমন সে অগ্নিতে দগ্ধ হতে হয়, তেমনি পুত্রাদির নামছলেও গোবিন্দ নাম কীর্তিত হলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।

(১৮)

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
দূরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে॥

অর্থ : অমিততেজশালী শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর নাম কীর্তনমাত্রই দিবসের আগমনে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ পাপসমূহও বিলীন হয়ে যায়।

(১৯)

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোহপরে॥
সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিস্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥

অর্থ : যমুনাচরগণ, তোমরা এমন আশঙ্কা করিও না যে, অজ্ঞানকৃত পাপ নামবলে বিনষ্ট হয়, জ্ঞানকৃত মহাপাপসমূহ সহস্র প্রকারে কৃত হলে দ্বাদশাব্দিক কোটি কোটি ব্রতেও নিবৃত্ত হয় না। এ বিষয়ে স্থূল সিদ্ধান্ত শ্রবণ করো, স্বর্ণ অপহরণকারী, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীঘাতী, রাজহত্যাকারী, গোহত্যাকারীসহ অন্যান্য যত পাপচারী আছে সকলের পক্ষেই নারায়ণের নাম কীর্তন প্রধান প্রায়শ্চিত্ত বলে কীর্তিত; যেহেতু নারায়ণ নাম উচ্চারণ করামাত্রই নামগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের বিষয়ে নারায়ণের মতি হয় অর্থাৎ নারায়ণ মনে করেন যে এ নামোচ্চারক ব্যক্তি আমার লোক, এজন্য একে সর্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

(২০)

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুদ্ধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নাম পদৈরুদাহৃতৈস্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥

অর্থ : ভগবান শ্রীহরির নামোচ্চারণে জীব যেরূপ শুদ্ধিলাভ করে, মনু প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী মুনিগণ পাপনিষ্কৃতির জন্য যেসব ব্রত প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান করেছেন, তাতে পাপী ব্যক্তির তদ্রূপ শুদ্ধি ঘটে না। অপরদিকে নামোচ্চারণে পাপনাশ ভিন্ন অন্য ফলও জন্মে থাকে, যেহেতু নারায়ণ নামোচ্চারণে পাপনাশের সাথে সাথে উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণসমূহও প্রকাশিত হয়, তা কৃচ্ছ্রতা-চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপক্ষয়মাত্রে ক্ষীণ হয় না।

(২১)

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যম্বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

অর্থ : সঙ্কেতে অর্থাৎ পুত্রাদির নাম গ্রহণের মাধ্যমে, পরিহাস ছলে, গীতাদিতে বা অবহেলাক্রমে ভগবান নারায়ণের নাম উচ্চারিত হলে অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়ে থাকে।

(২২)

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ॥

অর্থ : গৃহ থেকে পতিত অথবা পথে যেতে যেতে স্খলিত, কিংবা ভগ্নগাত্র অথবা সর্প আদির দ্বারা দংশিত কিংবা জ্বর আদিরোগে সন্তপ্ত অথবা দণ্ডাদির দ্বারা আহত ও অবশ হয়েও কোনো পুরুষ যদি 'হরি'র নাম উচ্চারণ করে, তবে তাকে আর নরক-যাতনা ভোগ করতে হয় না।

(২৩)

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোক নাম যৎ।
সংকীর্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥

অর্থ : শ্রীভগবন্নামের পাপক্ষয়কারী ক্ষমতা জেনেই হোক অথবা না জেনেই হোক কীর্তন করলে, অগ্নি যেমন কাষ্ঠসমূহকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ পাপসমূহও ভস্মীভূত হয়ে থাকে।

(২৪)

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্যহাঘবান্।
শ্বাদঃ পুল্কসকো বাপি শুদ্ধ্যেরন্ যস্য কীর্তনাৎ॥ (ভাঃ ৬/১৩/৮)

অর্থ : ঋষিগণ বললেন, ব্রহ্মঘাতী, পিতৃঘাতী, গোহত্যাকারী, মাতৃঘাতী, গুরুহন্তা, কুকুরভোজী, চণ্ডালসহ অন্য যেকোনো পাতকী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনে পবিত্র হয়ে থাকে।

(২৫)

বর্তমানস্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎ সর্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্তনাৎ॥ (লঘুভাগবত)

অর্থ : যে পাপ বর্তমান অর্থাৎ ঘটছে, যে পাপ ঘটেছে এবং যে পাপ ঘটবে তার সবই ভগবানের নামকীর্তনরূপ অগ্নিতে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় দগ্ধ হবে।

(২৬)

বসন্তি যানি কোটিস্তু পাবনানি মহীতলে।
ন তানি তত্তুলাং যান্তি কৃষ্ণনামানুকীর্তনে॥ (কূর্মপুরাণ)

অর্থ : মহীতলে যে কোটি কোটি পবিত্রকারী বস্তু আছে, তার সবই কৃষ্ণনাম কীর্তনরূপ পরম পাবনের তুল্য হতে পারে না।

(২৭)

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ॥ (বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণ)

অর্থ : পাপহরণের জন্য হরিনামের যত শক্তি আছে, পাতকীরা সে পরিমাণ পাপ করতেও সমর্থ হয় না।

(২৮)

শ্বাদোঽপি ন হি শক্নোতি কর্তুং পাপানি যত্নতঃ।
তাবন্তি যাবতী শক্তির্বিষ্ণোর্নাম্নোঽশুভক্ষয়ে॥ (ইতিহাসোত্তম)

অর্থ : অশুভ ক্ষয় করতে বিষ্ণুনামের যত শক্তি আছে, নিত্য কুকুর-ভক্ষণশীল পরম পাপজাতিও তত পাপ করতে পারে না।

(২৯)

তন্নাস্তি কর্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্তনং॥ (স্কন্দ পুরাণ)

অর্থ : কলিযুগে গোবিন্দনাম যে পাপ ক্ষয় করতে পারে না, সংসারে কর্মজনিত, বাক্যজনিত এবং মানসজনিত তেমন পাপই নেই।

(৩০)

শমায়ালং জলং বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ঃ।
শান্ত্যৈ কলেরঘৌঘস্য নামসংকীর্তনং হরেঃ॥ (বিষ্ণু ধর্মোত্তর)

অর্থ : অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে যেমন জল সমর্থ, সূর্যোদয় যেমন অন্ধকার নাশে সমর্থ, কলির পাপরাশি শান্তির জন্য শ্রীহরির নাম সংকীর্তন সেরূপ সমর্থ।

(৩১)

পরাকচান্দ্রায়ণতপ্তকৃচ্ছ্রৈর্নদেহিশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
কলৌ সকৃন্মাধবকীর্তনেন গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

অর্থ : এ কলিযুগে একবার মাত্র 'গোবিন্দ' নাম দ্বারা মাধবের সংকীর্তন করে জীবের যেমন শুদ্ধি সম্পাদিত হয়, পরাক ব্রত, চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছ্র প্রভৃতি পন্থায়ও তেমন শুদ্ধিলাভ হয় না।

(৩২)

অতীতপুরুষান্ সপ্ত ভবিষ্যাংশ্চ চতুর্দশ।

নরস্তারয়তে সর্বান্ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্তয়ন্ ॥ (দ্বারকা মাহাত্ম্য)

অর্থ : যে ব্যক্তি কলিকালে 'কৃষ্ণ' নাম কীর্তন করেন, তাঁর দ্বারা সাত পূর্বপুরুষ ও ভবিষ্যৎ চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে থাকে।

(৩৩)

মহাপাতকযুক্তোহপি কীর্তয়ন্ননিশং হরিং।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পঙ্‌ক্তিপাবনঃ ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

অর্থ : যদি কোনো ব্যক্তি মহাপাতকী হয়েও দিবানিশি হরিকীর্তন করেন, তিনি শুদ্ধচিত্ত হয়ে পঙ্‌ক্তিপাবন (মুক্ত) হন।

(৩৪)

গোবিন্দেতি মুদা যুক্তঃ কীর্তয়েদ্ যস্ত্বনন্যধীঃ।
পাবনেন চ ধন্যেন তেনেয়ং পৃথিবী ধৃতা ॥ (লঘুভাগবত)

অর্থ : যিনি আনন্দ সহকারে অনন্য বুদ্ধিতে 'গোবিন্দ' নাম কীর্তন করেন, সেই ধন্য ও পাবন পুরুষ এ ধরাকে ধারণ করে আছেন।

(৩৫)

ন চৈবমেকং বক্তারং জিহ্বা রক্ষতি বৈষ্ণবী।
আশ্রাব্য ভগবৎখ্যাতিং জগৎ কৃৎস্নং পুনাতি হি ॥ (হরিভক্তি সুধোদয়)

অর্থ : বিষ্ণুনাম উচ্চারণকারী জিহ্বা যে কেবল বক্তাকেই রক্ষা করে তা নয়, ভগবানের নামাত্মিকা কীর্তি শ্রবণ করিয়ে সমস্ত জগৎকেই পবিত্র করে থাকে।

নৃসিংহ পুরাণে প্রহ্লাদের উক্তি–

(৩৬)

তে সন্তঃ সর্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ।
যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ ॥

অর্থ : প্রহ্লাদ বললেন, হে নৃসিংহ, যে সকল সাধু আনন্দিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে তোমার নাম গান করেন, তাঁরাই সর্বজীবের অকপট ও নিঃস্বার্থ বন্ধু।

(৩৭)

অচ্যুতানন্দ-গোবিন্দ-নামোচ্চারণ-ভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

অর্থ : আমি সত্যি বলছি, হে অচ্যুত, হে আনন্দ, হে গোবিন্দ, ইত্যাদি নামোচ্চারণে ভীত হয়ে সমূহ রোগ-বালাই বিনষ্ট হয়।

(৩৮)

ন শাম্ব ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নান্যৌষধৈরপি।
হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ ॥ (পরাশর সংহিতা)

অর্থ : হে শাম্ব, অন্যান্য হেয় ঔষধের দ্বারা ব্যাধিজনিত দুঃখ বিনষ্ট হয় না, কিন্তু হরিনামরূপ ঔষধ পান করলে ব্যাধি দূরীভূত হয়, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

(৩৯)

মহাব্যাধিসমাচ্ছন্নো রাজবাধোপপীড়িতঃ।
নারায়ণেতি সংকীর্ত্য নিরাতঙ্কো ভবেন্নরঃ ॥ (অগ্নি পুরাণ)

অর্থ : যে মানুষ মহাব্যাধিগ্রস্ত ও রাজার দ্বারা পীড়িত, তিনি 'নারায়ণ' নাম সংকীর্তন করে নিরাতঙ্ক হন।

(৪০)

সংকীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথা তমোহর্কোহভ্রমিবাতিবাতঃ ॥ (ভা: ১২/১২/৪৮)

অর্থ : শ্রীভগবানের নামকীর্তন অথবা তাঁর বিক্রম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করলে তিনি হৃদয়ে প্রবেশ করে, সূর্যদেব যেরূপ তমোরাশি বিনাশ অথবা ঝঞ্ঝাবায়ু যেরূপ জলদজাল ছিন্ন করে, সেভাবে জীবগণের নিখিল দুঃখ বিনাশ করেন।

(৪১)

সর্বপাপপ্রশমনং সর্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্বদুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্তনম্ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

অর্থ : হরিনামকীর্তন সর্বপাপের প্রশমন, সর্বপ্রকার উপদ্রব নাশ ও সকল দুঃখ দূর করেন।

(৪২)

কীর্তনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।

যক্ষরাক্ষসবেতালভূতপ্রেতবিনায়কাঃ ॥
ডাকিন্যো বিদ্রবন্তি স্ম যে তথান্যে চ হিংসকাঃ।
সর্বানর্থহরন্তস্য নামসংকীর্তনং স্মৃতম্ ॥

অর্থ : অমিত-তেজস্বী বিষ্ণুর নাম কীর্তনমাত্রই যক্ষ, রাক্ষস, বেতাল, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, ডাকিনীসহ অন্যান্য হিংস্র প্রাণীরা ভয়ে পলায়ন করে। অর্থাৎ হরিনাম সংকীর্তন সর্বানার্থহর বলে শাস্ত্রে কথিত হয়েছে।

(৪৩)

নামসংকীর্তনং কৃত্বা ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু।
বিয়োগং শীঘ্রমাপ্নোতি সর্বানর্থৈর্ন সংশয়ঃ ॥

অর্থ : ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পতনকালে নামসংকীর্তন করলে সর্বপ্রকার অনর্থ থেকে শীঘ্র মুক্তিলাভ হয়, সন্দেহ নেই।

(৪৪)

মোহানলোল্লসজ্জ্বালাজ্বলল্লোকেষু সর্বদা।
যন্নামাম্ভোধরচ্ছায়াং প্রবিষ্টো নৈব দহ্যতে ॥ (পদ্ম পুরাণ)

অর্থ : নিত্য বৃদ্ধিশীল মোহ, অজ্ঞান এবং গৃহাদি বিষয়ক মমতারূপ অনল জ্বালায় জ্বলিত লোকসকলের মধ্যে যারা ভগবানের নামরূপ মেঘের ছায়ায় প্রবিষ্ট হন, তারা দগ্ধ হন না।

(৪৫)

কলিকালকুসর্পস্য তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রস্য মা ভয়ং।
গোবিন্দনামদাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্ ॥ (স্কন্দ পুরাণ)

অর্থ : কলিকালরূপ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ক্রূর প্রকৃতি সর্পের আর ভয় নেই, সে গোবিন্দ নামরূপ দাবানলে দগ্ধ ও ভস্মত্ব প্রাপ্ত হবে।

(৪৬)

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান ॥
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

অর্থ : এ ঘোর কলিযুগে যে সকল মানুষ হরিনামপরায়ণ, নিশ্চয় তাঁরাই কৃতকৃত্য, কলি তাঁদের বাধা দিতে পারে না। হে নরে, হে কেশব, হে গোবিন্দ, হে বাসুদেব, হে জগন্ময়, যাঁরা নিরন্তর এ সকল নাম কীর্তন করেন, তাঁদের কলি বাধাদানে সমর্থ হয় না।

(৪৭)

যথা যথা হরের্ন্নাম কীর্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥ (নৃসিংহ পুরাণ)

অর্থ : নারকীয় মানবগণ যে যেভাবে হরিনাম কীর্তন করেছিল, শ্রীহরির প্রতি তারা সেভাবেই ভক্তি লাভ করে সদ্য সুখ লাভ করে বিষ্ণুলোকে সমুপস্থিত হয়েছিল।

(৪৮)

নরকে পচ্যমানানাং নরানাং পাপকর্মণাং।
মুক্তিঃ সংজায়তে তস্মান্নামসংকীর্তনাদ্ধরেঃ ॥ (ইতিহাসোত্তম)

অর্থ : যে সকল পাপপরায়ণ মানুষ নরকে পচ্যমান, শ্রীহরির নাম সংকীর্তনমাত্রই তারা নরক থেকে সদ্য মুক্তিলাভ করে।

(৪৯)

নাতঃ পরং কর্মনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্মসু সজ্জতে মনোরজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোহন্যথা ॥ (ভা: ৬/২/৪৬)

অর্থ : তীর্থপাদ ভগবানের নামানুকীর্তন ভিন্ন অন্য কিছুই মুমুক্ষুদের কর্মনিবন্ধক বা পাপের মূলচ্ছেদক নয়, নামকীর্তন-ব্যতীত অন্য যে সকল প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাতে রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মন মলিন হয়ে থাকে, কিন্তু ভগবানের নাম কীর্তনে মন একান্ত নির্মল হয়, পুনরায় কর্মে আসক্ত হয় না।

(৫০)

যন্নামধেয় ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিংপ্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥

অর্থ : আসন্ন শয্যায় শায়িত, আতুর অথবা যে কূপাদির মধ্যে পতিত হয়েছে, কিংবা সোপানাদির ওপর যার পদস্খলন হচ্ছে, এরূপ পুরুষ তত্তৎকালে বিবশ হয়েও যাঁর নাম গ্রহণ করে কর্মবন্ধন ছেদন করে উত্তমা গতি (বৈকুণ্ঠ) লাভ করে, কলিযুগের জনগণ তাঁর অর্চনা করবে না অর্থাৎ কলিকালের প্রভাব বশতঃ ভগবদ্বিমুখ থাকবে।

(৫১)

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপিবিনাশমায়াত্তি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তেপ্রারব্ধকর্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ (স্তবমালা)

অর্থ : যে প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ ব্যতিরেকে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহমান ব্রহ্মচিন্তার দ্বারাও বিনাশ হয় না, হে নাম, জিহ্বাগ্রে তোমার উদয় মাত্রেই সেই প্রারব্ধকর্ম অপহত হয়, এ কথা বেদ পুনঃ পুনঃ বলেছেন।

(৫২)

মম নামানি লোকেহস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটিস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥ (বিষ্ণুযামলে শ্রীভগবানের উক্তি)

অর্থ : এ সংসারে শ্রদ্ধা সহকারে যিনি আমার নামসকল কীর্তন করেন, আমি তাঁর কোটি কোটি অপরাধ ক্ষমা করে থাকি, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

(৫৩)

জাতে নামাপরাধেহপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থ : কখনো প্রমাদবশত নামাপরাধ উপস্থিত হলে সর্বদা নামকীর্তন করে একমাত্র নামেরই আশ্রয় গ্রহণ করবে।

(৫৪)

ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোহপ্যথর্বনঃ।
অধীতস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥ (বিষ্ণুধর্মে প্রহ্লাদ বাক্য)

অর্থ : যিনি 'হরি' এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই তার দ্বারা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ অধ্যয়ন করেছেন।

স্কন্দ পুরাণে পার্বতীর বাক্য–

(৫৫)

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥

অর্থ : বৎস, তুমি ঋক্ যজু ও সামবেদ কিছুই পাঠ করো না; কেবল শ্রীহরির 'গোবিন্দ' নাম প্রত্যহ গান কর।

(৫৬)

বিষ্ণোরেকৈক নামাপি সর্ববেদাধিকং মতং।
তাদৃক্ নামসহস্রেণ রামনামসমং স্মৃতম্ ॥ (বিষ্ণু পুরাণ)

অর্থ : বিষ্ণুর এক একটি নামও সর্ববেদের অধিক বলে অভিমত, আবার ঐ প্রকার সহস্র বিষ্ণুর নামের সাথে এক রামনাম সমান বলে অভিহিত।

(৫৭)

তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিশতানি চ।
তানি সর্বান্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনাৎ ॥ (বামন পুরাণ)

অর্থ : শতকোটি তীর্থই বল বা সহস্রকোটি তীর্থই বল, বিষ্ণুর নামানুকীর্তন দ্বারা জীব সকলেরই ফল প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(৫৮)

বিশ্রুতানি বহূনেব তীর্থানি বহুধানি চ।
কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নামকীর্তনতো হরেঃ ॥ (বিশ্বামিত্র সংহিতা)

অর্থ : জল স্থলাদিতে বহুপ্রকার ও বহুসংখ্যক বিশ্রুত তীর্থ সকল, হরিনাম কীর্তনের কোটি অংশের একাংশেরও তুল্য নয়।

(৫৯)

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতঃ মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্তের্নসমং শতাংশৈঃ ॥

অর্থ : সূর্যগ্রহণকালে কোটি গো-দান, প্রয়াগ-গঙ্গার জলে কল্পকাল বাস, অযুত যজ্ঞ এবং সুমেরুসদৃশ স্বর্ণদান, কিছুই গোবিন্দ নামকীর্তনের শতাংশের একাংশেরও তুল্য নয়।

(৬০)

বাজপেয়সহস্রাণাং নিত্যং ফলমভীপ্সসি।
প্রাতরুত্থায় ভূপাল কুরু গোবিন্দকীর্তনং ॥
কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্তনং ॥ (গরুড় পুরাণ)

অর্থ : হে রাজন, যদি নিত্য সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের ফল অভিলাষ কর, তাহলে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্বক গোবিন্দনাম কীর্তন করতে থাক। হে নরনায়ক, সাংখ্য বা অষ্টাঙ্গাদি যোগে কী করবে? যদি মুক্তিলাভের অভিলাষ থাকে, তাহলে গোবিন্দনাম কীর্তন করতে থাক।

(৬১)

এতং ষড়্বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরং।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনং ॥ (স্কন্দপুরাণ)

অর্থ : শ্রীবিষ্ণুর নামানুকীর্তনই কাম ক্রোধাদি ষড়্বর্গের বিনাশক, অতিশয়রূপে শত্রুনিগ্রহকারক; আর এটিই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিদানস্বরূপ।

(৬২)

সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যমায়ুষ্যং ব্যাধিনাশনং।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বাসুদেবস্য কীর্তনং ॥ (শ্রীকৃষ্ণামৃত স্তোত্র)

অর্থ : বাসুদেবের নাম কীর্তন, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, আয়ুবর্ধক, ব্যাধিনাশন, ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ ও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ।

(৬৩)

পরিহাসোপহাসাদ্যৈর্বিষ্ণোর্গৃহ্নন্তি নাম যে।
কৃতার্থাস্তেহপি মনুজাস্তেভ্যোপীহ নমো নমঃ ॥ (শ্রীনারায়ণ ব্যূহস্তব)

অর্থ : পরিহাস বা নিন্দার ছলে যাদের মুখ থেকে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তারাও কৃতার্থ হয়ে থাকেন, অতএব তাদের নমস্কার, নমস্কার!

(৬৪)

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেতদ্দুর্লভঞ্চাকৃতাত্মনাং।
কলৌ যুগে হরের্নাম তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥

অর্থ : এ কলিযুগে পাপীদের দুর্লভ হরিনাম একবারও যারা কীর্তন করেন, তারা যে কৃতার্থ, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

(৬৫)

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোহভিলভ্যতে ॥ (ভা: ১১/৫/৩৬)

অর্থ : গুণজ্ঞ, সারগ্রাহী আর্যেরাই কলিকে সম্মান করে থাকেন; কারণ, যে কলিযুগে কেবল নামকীর্তনমাত্রেই সকল প্রকার স্বার্থ লাভ হয়।

(৬৬)

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্তনং।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥ (স্কন্দপুরাণ)

অর্থ : সংসারের মধ্যে শ্রীহরিকীর্তনই উত্তম তপস্যা, বিশেষত কলিযুগে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতির জন্য শ্রীহরির নামকীর্তন করবে।

(৬৭)

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু ॥ (স্কন্দপুরাণ)

অর্থ : দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতিতে, দেবতা ও সাধুসেবা তথা রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে, জ্ঞানে ও অধ্যাত্মবস্তুতে যে সকল পাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শক্তি আছে, বিষ্ণু সমস্তই আকর্ষণপূর্বক তাঁর নামসমূহে স্থাপন করেছেন।

(৬৮)

বাতোহপ্যতো হরের্নাম উগ্রাণামপি দুঃসহঃ।

সর্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ ॥

অর্থ : সূর্য যেমন তমোরাশি বিনাশ করে, তেমনি ভগবানের নামরূপ বায়ু যথা সামান্য থেকে ভয়ানক পাপ পর্যন্ত বিদূরিত করে থাকে।

(৬৯)

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যাজগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তিসর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ (গীতা ১১/৩৬)

অর্থ : অর্জুন বললেন– হে হৃষীকেশ, তোমার গুণ ও নামকীর্তন দ্বারা কেবল আমিই আনন্দানুভব করছি না, তাতে সমস্ত জগৎ সংসারও হর্ষিত ও অনুরক্ত হয় তা যথেষ্ট বটে; অন্যের কী কথা, রাক্ষসনিকর পর্যন্ত তোমার নামের প্রভাবে ভীত হয়ে দিগন্তে পলায়ন করে; সিদ্ধ পুরুষেরা পর্যন্ত তোমার নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করে নমস্কার করে থাকে।

(৭০)

স্বপন্ ভুঞ্জন ব্রজংস্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা।
যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

অর্থ : শয়নের সময়, ভোজন ও গমনের সময়, স্থিতি ও দণ্ডায়মান অবস্থায়, অনুগমনে এবং অন্য কথা প্রসঙ্গে যারা হরিনাম উচ্চারণ করে থাকেন, তাদের নিত্য নমস্কার।

(৭১)

স্ত্রীশূদ্রপুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ (নারায়ণ ব্যূহস্তব)

অর্থ : স্ত্রী, শূদ্র ও চণ্ডাল প্রভৃতি যেকোনো পাপজাতিও যদি ভক্তিভরে হরিনামকীর্তন করে, তাদেরও নমস্কার।

(৭২)

অনন্যহতয়ো মর্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্যাদিবর্জিতাঃ ॥
সর্বধর্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেঽপি ধার্মিকাঃ ॥ (পদ্ম পুরাণ)

অর্থ : যে সকল মানুষের অন্য গতি নেই, যারা বিষয়ভোগে রত, যারা পরতাপদায়ক, জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত, ব্রহ্মচর্যাদিবর্জিত এবং সর্বধর্মপরিত্যাগী, তারাও যদি একমাত্র বিষ্ণুর নামকীর্তন করে, তাহলে ধার্মিকদেরও দুর্লভ গতি সুখে লাভ করতে পারে।

(৭৩)

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥ (বিষ্ণুধর্ম)

অর্থ ; হে লুব্ধক, শ্রীহরির নামকীর্তন করতে দেশ ও কালের নিয়ম নেই এবং উচ্ছিষ্টমুখে গ্রহণেও নিষেধ নেই।

(৭৪)

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীর্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্তনে তস্য স পবিত্রকরো যথা ॥ (স্কন্দ, পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্মোত্তর)

অর্থ : হরি যখন পবিত্রকারী, তখন তাঁর নামকীর্তনে অশৌচাশঙ্কা নেই, অতএব সর্বদা সর্বত্র তাঁর নাম কীর্তন করা কর্তব্য।

(৭৫)

ন দেশ কালাবস্থাসু শুদ্ধাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্ ॥ (স্কন্দ পুরাণ)

অর্থ : ভগবানের নামকীর্তনে দেশ, কাল ও অবস্থার বিচার নেই অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় প্রভৃতি সকল বয়সে এবং জাগ্রৎ, উন্মাদ ও প্রমোদ প্রভৃতি সকল সময়ে এবং (অশৌচাদি কালেও) নামকীর্তন করায় বাধা নেই, নাম স্বতন্ত্র এবং কামীর কামদ।

(৭৬)

ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।
পরং সংকীর্তনাদেব রাম রামেতি মুচ্যতে ॥ (বৈশ্বানর সংহিতা)

অর্থ : দেশকালের নিয়ম বা শৌচাশৌচের নির্ণয় কিছুই নেই; কেবল রাম, রাম– এ নামকীর্তন করলেই মুক্ত হবে।

(৭৭)

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।

বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনে ॥
কালোহস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোহস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসংকীর্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥ (বৈষ্ণব চিন্তামণি)

অর্থ : নারদ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে রাজন, বিষ্ণুর নাম করতে দেশ বা কালের নিয়ম নেই, এ বিষয়ে সন্দেহ করবেন না। সংসারে দান, যজ্ঞ, স্নান ও মন্ত্রাদি জপ কাল সাপেক্ষ বটে, কিন্তু বিষ্ণুর নামসংকীর্তনে কালের অপেক্ষা নেই।

(৭৮)

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগীনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥ (ভা: ২/১/১১)

অর্থ : শুকদেব বললেন– হে রাজন, শ্রীহরির নামকীর্তনে ফলাকাঙ্ক্ষীদের ফল প্রাপ্তি, মুমুক্ষুদের মোক্ষলাভ এবং জ্ঞানীগণের জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটে থাকে; মোটকথা, কী সাধক, কী সিদ্ধ, কারো পক্ষেই এটি ভিন্ন অন্য কোনো মঙ্গল দেখা যায় না।

(৭৯)

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছতি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্তনং ॥ (গরুড় পুরাণ)

অর্থ : হে নরনাথ, সাংখ্যযোগ বা অষ্টাঙ্গযোগে কী ফল হবে? যদি মুক্তি লাভের ইচ্ছা করে থাকো, তাহলে গোবিন্দনাম কীর্তন করো।

(৮০)

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ (স্কন্দ পুরাণ)

অর্থ : যে ব্যক্তি একবার মাত্র হরি এ দুই অক্ষর উচ্চারণ করেছে, সে মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে।

(৮১)

অপ্যন্যচিত্তোহশুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্তয়েদ্ধরিং।
সোহপি দোষক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্যথা ॥ (ব্রহ্ম পুরাণ)

অর্থ : যিনি অন্য মনস্ক হয়ে বা অশুদ্ধ থেকেও সর্বদা হরিকীর্তন করেন, তিনিও শিশুপালের মতো সর্বদোষ মুক্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করে থাকেন।

(৮২)

সকৃদুচ্চারয়েদযস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্বাণমধিগচ্ছতি ॥ (পদ্ম পুরাণ)

অর্থ : যিনি আলস্য পরিত্যাগপূর্বক একবার মাত্রও নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেন, তিনি বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে নির্বাণ মুক্তি লাভের অধিকারী হন।

(৮৩)

সর্বধর্মবহির্ভূতঃ সর্বপাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনাৎ ॥ (বৈশম্পায়ন সংহিতা)

অর্থ : যে সর্বধর্মবহির্ভূত হয়ে সকল প্রকার পাপকর্মে অনুরক্ত, বিষ্ণুনাম কীর্তনে সেও যে মুক্ত হয়ে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই।

(৮৪)

যথা কথঞ্চিদ্ যন্নাম্নি কীর্তিতে বা শ্রুতেপি বা।
পাপিনোহপি বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ শুদ্ধা মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ ॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

অর্থ : ভগবানের নাম যৎকিঞ্চিৎরূপে কীর্তন বা শ্রবণ করলে পাপপরায়ণ মানুষও বিশুদ্ধ হয়ে মোক্ষলাভ করে।

(৮৫)

প্রাণপ্রয়াণপাথেয়ং সংসারব্যাধিভেষজং।
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥ (ভারত বিভাগ)

অর্থ : 'হরি'– এ দুটি অক্ষর পরলোক-গমন পথের পাথেয়, সংসার রোগের ঔষধ ও দুঃখ-শোক নিবৃত্তির উপায়।

(৮৬)

নব্যং নব্যং নামধেয়ং মুরারের্যদযচ্চৈতদেগয়পীযূষপুষ্টং।

যে গায়ন্তি ত্যক্তলজ্জাঃ সহর্ষংজীবন্মুক্তাঃ সংশয়ো নাস্তি তত্র ॥ (নারদ পুরাণ)

অর্থ : মুরারির যে সকল নাম প্রতিক্ষণে নুতনত্ব নিবন্ধন মাধুরী বিশেষ প্রকাশ করে থাকে, যে নাম সকল গীতযোগ্য গাথাদির শ্লাঘ্যতর মধুর রসপূর্ণ, যাঁরা লজ্জা পরিহারপূর্বক সানন্দে এ নাম গান করে থাকেন, তাঁরা যে জীবন্মুক্ত তাতে সন্দেহ নেই।

(৮৭)

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥ (ভাঃ ১/১/১৪)

অর্থ : সূত বললেন– "হে ঋষিগণ, ঘোর সংসারী ব্যক্তি বিবশ হয়ে যাঁর নাম স্মরণ করলে তৎক্ষণাৎ সংসার হতে মুক্ত হয়। স্বয়ং ভয়ও তাঁর নাম-রবে ভীত হয়ে থাকে।"

(৮৮)

যস্যাবতারগুণকর্মবিড়ম্বনানি নামানি যেহসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেহনৈকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বাসংযান্ত্যপাবৃতামৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ (ভাঃ ৩/৯/১৫)

অর্থ : ব্রহ্মা বললেন– "হে প্রভো, যদি লোকে প্রাণত্যাগকালে বিবশ হয়েও আপনার অবতার, গুণ ও কর্ম ইত্যাদির উল্লেখ করে দেবকীনন্দন, ভক্তবৎসল, গোবর্ধনধারী ও কংসারী প্রভৃতি নাম কীর্তন করে, তাহলেও বহু জন্মার্জিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে, নিরস্তাবরণ সত্যরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অতএব হে জন্মরহিত, আপনার শরণাপন্ন হলাম।"

(৮৯)

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং সঙ্কীর্তনং ভগবতো গুণকর্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোহপি নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥ (ভাঃ ৬/৩/২৪)

অর্থ : ভগবানের গুণ, কর্ম ও নামকীর্তন দ্বারা পাপীর পাপ ক্ষয় হয়ে থাকে, এতে আশ্চর্যের কী? কারণ মহাপাতকী আজামিল যখন প্রায়শ্চিত্ত না করে অশুচি ও মরণকালে নিজের পুত্র নারায়ণকে ডেকে মুক্তি লাভ করেছে, তখন পাপক্ষালনের কথা আর কী বলব?

(৯০)

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে।
নামসংকীর্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দনং ॥
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি উক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ ॥ (লিঙ্গ পুরাণ)

অর্থ : শিব বললেন– "নারদ, যখন মানুষ গমন, অবস্থান, শয়ন, ভোজন, নিশ্বাস পরিত্যাগ, বাক্যপূরণ ও অবহেলাক্রমে কলিমর্দন বিষ্ণুর নাম কীর্তন করে মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন ভক্ত ভক্তিভরে ডাকলে যে পরমধামে তার গতি হবে, তা অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখে না।

(৯১)

ব্রাহ্মণঃ শ্বপচীং ভুঞ্জন্ বিশেষেণ রজস্বলাং।
অশ্নাতি সুরয়া পক্কং মরণে হরিমুচ্চরন্ ॥
অভক্ষ্যগম্যয়োর্জ্জাতং বিহায়াঘৌঘসঞ্চয়ম্।
প্রযাতি বিষ্ণুসালোক্যং বিমুক্তো ভববন্ধনৈঃ ॥ (নারদ পুরাণ)

অর্থ : ব্রাহ্মণ যদি রজঃস্বলা চণ্ডালী উপভোগ ও সুরাপক্ক অন্ন ভোজন করেও মৃত্যুকালে একবার মাত্র হরিনাম উচ্চারণ করে, তাহলে অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্যাগমন প্রভৃতি সঞ্চিত উৎকট পাপভার ও সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে বিষ্ণু-সালোক্য প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(৯২)

জিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
বিষ্ণোর্লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

অর্থ : 'হরি'– এ দুইটি অক্ষর যাঁর জিহ্বাগ্রে বিরাজমান থাকে, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন; সেখান থেকে আর তাঁর পুনরাগমন হয় না।

(৯৩)

যত্র যত্র স্থিতো বাপি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্তয়েৎ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিং ॥ (পদ্ম পুরাণ)

অর্থ : যত্র-তত্র থেকেও যদি মানুষ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কীর্তন করে, তবু সে সর্বপাপ থেকে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে পরম পদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।
অম্বরীষের প্রতি নারদের বাক্য–

(৯৪)

তদেব পুণ্যং পরমং পবিত্রং গোবিন্দগেহে গমনায় পত্রং।

তদেব লোকেষু কৃতৈকসত্রং যদুচ্যতে কেশবনামমাত্রং ॥ (পদ্ম পুরাণ)

অর্থ : একমাত্র কেশবের নামোচ্চারণই পরম পুণ্য, পরম পবিত্র, বৈকুণ্ঠ গমনের সহায় এবং সংসারের মধ্যে সেটিই একমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান।

(৯৫)

এবং সংগ্রহণী পুত্রাভিধানব্যাজতো হরিং।
সমুচ্চার্যান্তকালেহগাদ্ধাম তৎপরমং হরেঃ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

অর্থ : দুরাচারী অজামিল বেশ্যাপুত্রের নামের ছলে মরণকালে হরিনাম উচ্চারণ করে তাঁর প্রসিদ্ধ স্থান প্রাপ্ত হয়েছিল।

(৯৬)

নারায়ণমিতি ব্যাজাদুচ্চার্য কলুষাশ্রয়ঃ।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

অর্থ : সর্ব পাপাশ্রয় অজামিলও যখন পুত্রচ্ছলে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেছিল, তখন শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের নাম কীর্তন করলে যে কী ফল হবে তা কী করে বলা যাবে?

(৯৭)

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ (ভা: ৬/২/৪৯)

অর্থ : শুকদেব বললেন, "হে রাজন, দুরাচার অজামিল পুত্রের নামে ভগবানের নাম উচ্চারণ করেছিল বলে, তাতে সে যখন সমস্ত পাপ হতে বিনির্মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে গমন করল, তখন শ্রদ্ধাপূর্বক নামোচ্চারণ করলে পাপমুক্ত হয়ে যে ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হবে, এটি কি বড় বিচিত্র!

(৯৮)

যে কীর্তয়ন্তি বরদং বরপদ্মনাভং শঙ্খাজচক্রশরচাপগদাহসিহস্তং।
পদ্মালয়াবদনপঙ্কজষট্পদাক্ষং ন্যূনং প্রযান্তি সদনং মধুঘাতিনস্তে ॥ (বামন পুরাণ)

অর্থ : যাঁরা বরপ্রদ, পদ্মনাভ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শর, ধনুক ও অসিধারী এবং লক্ষ্মীর বদনকমলের ভ্রমর তুল্য শ্রীহরির নাম কীর্তন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মধুসূদনের সদনে গমন করবেন।

(৯৯)

বাসুদেবেতি মনুজ উচ্চার্য ভবভীতিতঃ।
উন্মুক্তঃ পদমাপ্নোতি বিষ্ণোরেব স সংশয়ঃ ॥ (আঙ্গিরস পুরাণ)

অর্থ : মানুষ বাসুদেবের নাম কীর্তন করে ভবভয় থেকে মুক্তিলাভ করে বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ ধামে গমন করেন, এতে সন্দেহ নেই।

(১০০)

সর্বত্র সর্বকালেষু যেহপি কুর্বন্তি পাতকং।
নামসংকীর্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥ (নন্দি পুরাণ)

অর্থ : যারা সকল কালে সর্বত্র পাপকর্ম করে থাকে, তারাও নাম সংকীর্তনের দ্বারা বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

(১০১)

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ (ভা: ১২/৩/৫১)

অর্থ : হে রাজন, কলির নিখিল দোষ সত্ত্বেও এর একটি মহান গুণ দেখতে পাওয়া যায় যে, শুধু 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে মানুষ জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমধামে উন্নীত হবেন।

(১০২)

যদীচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ যৎ পরমং পদং।
তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্তনং ॥ (গরুড় পুরাণ)

অর্থ : শুকদেব অম্বরীষকে বললেন, "হে রাজেন্দ্র, যদি তুমি পরম জ্ঞান এবং তা হতে পরমপদ পাওয়ার ইচ্ছা কর, তাহলে আদরের সাথে গোবিন্দ নাম কীর্তন করতে থাক।"

(১০৩)

বাসুদেবস্য সংকীর্ত্যা সুরাপো ব্যাধিতোহপি বা।

মুক্তো জায়তে নিয়তং মহাবিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ (বরাহ পুরাণ)

অর্থ : কি সুরাপায়ী, কি ব্যাধিগ্রস্ত এমন যেই হোক না কেন, বাসুদেবের নাম কীর্তন করলেই সে নিত্যমুক্ত হয়ে থাকে এবং মহাবিষ্ণু সর্বদা তার প্রতি প্রসন্ন থাকেন।

(১০৪)

নামসংকীর্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃটপ্রস্খলিতাদিষু।
করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ ॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

অর্থ : হে বিপ্রগণ, যাঁরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদিতে নিরন্তর বিষ্ণুর নামকীর্তন করেন, অধোক্ষজ ভগবান তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন।

(১০৫)

ঋণমেতং প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসীনং ॥ (মহাভারত, শ্রীভগবদ্বাক্য)

অর্থ : শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "দূরদেশস্থিতা দ্রৌপদী বিপদে পড়ে, হে গোবিন্দ বলে আমাকে যে আহ্বান করেছিল, সেই ঋণ আমার বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোনও ক্রমে হৃদয় থেকে অপসৃত হচ্ছে না।"

(১০৬)

গীত্বা চ মম নামানি নর্তয়েন্মম সন্নিধৌ।
ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোহহং তেন চার্জুন ॥
গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দনঃ ॥ (আদি পুরাণ)

অর্থ : ভগবান বললেন, "হে অর্জুন, যাঁরা আমার নাম গান করে আমার সমক্ষে নৃত্য করে থাকেন, আমি তাঁদের প্রতি প্রীত হয়ে থাকি। যাঁরা আমার সমক্ষে আমার নামগানে রোদন করে থাকেন, আমি তাঁদেরই বশ হয়ে থাকি। অন্যে জনার্দনকে বশীভূত করতে পারে না।

(১০৭)

জিতস্তেন জিতস্তেন জিতস্তেনেতি নিশ্চিতম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ (বিষ্ণুধর্মোত্তরে প্রহ্লাদ বাক্য)

অর্থ : যাঁর জিহ্বাগ্রে 'হরি'– এ দুইটি অক্ষর বিদ্যমান, তিনি নিশ্চয়ই ভগবানকে বশীভূত করেছেন। (ঐকান্তিক ভক্তগণ নামনিষ্ঠ।)

(১০৮)

এবমৈকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে ॥ (হরিভক্তিবিলাস)

অর্থ : ঐকান্তিক ভক্তগণ নামের ভগবদ্বশীকারিত্ব শক্তির কথা জেনেই পরম প্রীতির সাথে কেবল নামের কীর্তন ও স্মরণ করে থাকেন, অন্য কৃত্যের প্রতি তাঁদের রুচি হয় না।

(১০৯)

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাংসকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ (প্রভাস খণ্ড)

অর্থ : হে ভৃগুবর, ভগবানের নাম মধুর থেকেও মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সমস্ত বেদরূপ কল্পলতার সৎফল এবং চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ। কৃষ্ণনাম যদি শ্রদ্ধায় বা হেলায়, অব্যক্ত কিংবা অসম্পূর্ণভাবেও একবার মাত্র কীর্তিত হন, তবে মনুষ্যমাত্রকেই উদ্ধার করে থাকেন।

(১১০)

ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেতদেব ধনার্জনং।
জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্ যদ্দামোদরকীর্তনং ॥ (স্কন্দ ও পদ্মপুরাণ)

অর্থ : দামোদরের নামকীর্তনই সকল মঙ্গলানুষ্ঠানের ফল, এটিই ধনোপার্জনের উপায় এবং এটিই জীবন ধারণের ফল।

(১১১)

এতদেব পরং জ্ঞানমেতদেব পরন্তপঃ।
এতদেব পরং তত্ত্বং বাসুদেবস্য কীর্তনং ॥ (বিষ্ণুরহস্য ও বিষ্ণুধর্মোত্তর)

অর্থ : বাসুদেবের নামকীর্তনই পরম জ্ঞান, পরম তপস্যা এবং পরম তত্ত্ব।

(১১২)

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।

ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনন্তু ততো বরম্ ॥ (বৈষ্ণবচিন্তামণি, শিব-উমা সংবাদ)

অর্থ : বিষ্ণুর স্মরণ করলে বহু আয়াসে সংসার বন্ধন ছিন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু তার নামসংকীর্তনে ওষ্ঠমাত্র স্পন্দিত হলে ভবভয় প্রশমিত হয়, এজন্য স্মরণাঙ্গ ভক্তি অপেক্ষা কীর্তনের মাহাত্ম্য অধিক।

(১১৩)

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥

অর্থ : হে রাজন, যিনি শত শত পূর্বজন্মে বাসুদেবের সম্যক অর্চনা করেছেন, তাঁরই মুখে সর্বদা হরিনাম অবস্থিতি করেন। এজন্য অর্চনাঙ্গ ভক্তি অপেক্ষা কীর্তন শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য : ভক্তির অঙ্গ বহুপ্রকার; তার মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এ নববিধা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, এ নববিধা ভক্তির মধ্যে স্মরণ, অর্চন, কীর্তন এ তিনটি অঙ্গ শ্রেষ্ঠতর, এ তিন অঙ্গের মধ্যে আবার নাম কীর্তনই শ্রেষ্ঠতম।

(১১৪)

প্রভাতে চার্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্যসাধনং ॥ (হরিভক্তি বিলাস)

অর্থ : প্রভাতে, অর্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নে ও দিবসশেষে যিনি হরিকীর্তন করেন, তাঁকে আর অন্য কোন সাধন করতে হয় না।

(১১৫)

যদভ্যর্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্তনাৎ ॥ (বিষ্ণু রহস্য)

অর্থ : সত্যযুগে শত শত যজ্ঞানুষ্ঠানে এবং ভক্তিভাবে হরির অর্চনায় যে ফল হত, কলিকালে গোবিন্দনাম কীর্তনমাত্রেই অবিকল সেই ফল পাওয়া যায়।

তাৎপর্য : যেমন স্থানসমূহের মধ্যে মথুরাদি, মাসসমূহের মধ্যে কার্তিক এবং তিথিসমূহের মধ্যে একাদশ্যাদি তিথি ভগবৎপ্রিয়, তদ্রূপ যুগসকলের মধ্যে কলিযুগই ভগবানের প্রিয়; মথুরাদি স্থানে, কার্তিকাদি মাসে বা একাদশ্যাদি তিথিতে, স্বল্পকর্ম কৃত হলেও যেমন বহু ফলোপদায়ক হয়, সেরূপ কলিকালে নামসংকীর্তনের দ্বারা অনায়াসে অন্যান্য যুগের বহু কঠোর সাধনার দুর্লভ সাধ্যবস্তুসমূহ এবং অন্যান্য যুগ-দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমও স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এজন্যই "ধন্য কলি" বলে উক্ত হয়েছে। আর এজন্যই সত্যাদি যুগের জীবগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণের বাঞ্ছা করে থাকেন।

শ্রীমধ্বাচার্যের মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীনারায়ণসংহিতার উদ্ধৃতি–

(১১৬)

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥ (শ্রীনারায়ণ সংহিতা)

অর্থ : দ্বাপর যুগের অধিবাসীগণ কেবল পঞ্চরাত্র অবলম্বনপূর্বক হরিপূজা করেছেন, কিন্তু বর্তমান কলিযুগে সেই দ্বাপরীয় উপাসনা-প্রণালীর পরিবর্তে কেবল নামোচ্চারণ দ্বারা হরিপূজা হয়ে থাকে।

(১১৭)

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ (ভা: ১২/৩/৫২)

অর্থ : সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বাপরে পরিচর্যা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে হরিকীর্তনে সেই ফল লাভ হয়।

(১১৮)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ (ভা: ১১/৫/৩২)

অর্থ : যখন ভগবান (অন্তরে) কৃষ্ণবর্ণ ও (বাইরে) ইন্দ্রনীলমণিসদৃশ জ্যোতিবিশিষ্ট হয়ে সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদসহ অবতীর্ণ হন, তখন বিবেকী মানুষেরা কীর্তনরূপ যজ্ঞ (অর্চনা) দ্বারা তাঁর অর্চনা করেন।

(১১৯)

মহাভগবতা নিত্যং কলৌ কুর্বন্তি কীর্তনং। (স্কন্দ পুরাণ)

অর্থ : মহাভাগবতগণ কলিযুগে নিত্য সংকীর্তন করেন।

(১২০)

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনং।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

অর্থ : নারদ বললেন, হরির নামই আমার জীবন, হরির নামই আমার জীবন, হরির নামই আমার জীবন, কলিতে হরির নাম ব্যতীত অন্য গতি নেই, অন্য গতি নেই, অন্য গতি নেই।

(১২১)

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকং।
ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ ॥

অর্থ : একবারমাত্র চৈতন্যময় হরির নামোচ্চারণে যে ফল লাভ হয়, সহস্রবদন অনন্ত ও চতুর্মুখ বিধাতা সে ফল বর্ণনায় সমর্থ হন না। আদি পুরাণে কৃষ্ণার্জুন সংবাদে বলা হয়েছে–

(১২২)

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ততে হৃদয়ে মম ॥
ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতং।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলং ॥
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশঃ শমঃ।
ন নাম সদৃশং পুণ্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ ॥ (আদি পুরাণ)

অর্থ : শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "হে অর্জুন, যে সকল মানব শ্রদ্ধা বা অবহেলাক্রমে আমার নাম জপ করে, সর্বদা আমার হৃদয়ে তাদের নাম জাগরুক থাকে। নামসদৃশ জ্ঞান নেই, নামসদৃশ ব্রত নেই, নামসদৃশ ধ্যান নেই, নামসদৃশ ফল নেই, নামসদৃশ দান নেই, নামসদৃশ শান্তি নেই, নামসদৃশ পুণ্য নেই এবং নামসদৃশ আশ্রয় নেই।"

(১২৩)

নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ ॥
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ ॥
নামৈব করণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ ॥

অর্থ : নামই পরম মুক্তি, নামই পরম গতি, নামই পরম শান্তি, নামই পরম নিষ্ঠা, নামই পরম ভক্তি, নামই পরম মতি, নামই পরম প্রীতি, নামই পরম স্মৃতি, নামই জীবের কারণ, নামই জীবের প্রভু, নামই পরম আরাধ্য এবং নামই পরম গুরু।

(১২৪)

নামযুক্তান্ জনান্ দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধো ভবতি যো নরঃ।
য যাতি পরমং স্থানং বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জুন ॥

অর্থ : নামকীর্তনকারী মানুষকে দেখে যিনি প্রীত হন, তিনি পরমপদ লাভ করে বিষ্ণুর সাথে আনন্দ উপভোগ করেন। অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি দৃঢ়মনে নামের আশ্রয় গ্রহণ করো, নামযুক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয়; তাই হে অর্জুন, তুমি নামযুক্ত হও।

(১২৫)

দেহদেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ। (কূর্ম পুরাণ)

অর্থ : ঈশ্বরের দেহদেহী ভেদ নেই কেন? যেহেতু আমাদের যেমন কেবল আত্মাটুকুই চৈতন্য পদার্থ, দেহ জড় পঞ্চভূত নির্মিত, ঈশ্বরের সেরূপ নয়, তাঁর দেহ আত্মাদি সমস্তই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মঘন-স্বরূপ।

(১২৬)

ঈশ্বরে নাহিক কভু দেহদেহী ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥ (চৈ: চ: অন্ত্য ৫ম প:)

(১২৭)

ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন।

মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥ (বেদ)

অর্থ : হে বিষ্ণো, যাঁরা তোমার 'বিষ্ণু' নাম বিচার করে সতত উচ্চারণ করেন অর্থাৎ ভজনা করেন, তাঁদের ভজনাদির বিষয়ে কোনো নিয়ম নেই, কারণ নামই জ্ঞানস্বরূপ, সর্বপ্রকাশক ও সুজ্ঞেয়, সে নামেরই আমরা ভজনা করি।

(১২৮)

সুদিতাশ্রিতজনার্তিরাশয়ে রম্যচিদ্ঘনসুখস্বরূপিণে।
নাম গোকুলমহোৎসবায় তে কৃষ্ণপূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥ (স্তবমালা)

অর্থ : হে নাম, তুমি তোমার আশ্রিত জনের আর্তিরাশি বিনাশকারী, তুমি রম্য সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ, তুমি গোকুলবাসীগণের মহোৎসবস্বরূপ ও কৃষ্ণের পূর্ণবিগ্রহস্বরূপ, তোমাকে বারবার নমস্কার করি।

(১২৯)

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ (পদ্ম পুরাণ)

অর্থ : নাম চিন্তামণি, নামী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেমন চৈতন্যরসবিগ্রহ, নামও সেরূপ চৈতন্যরসময়; কৃষ্ণ যেমন পূর্ণ শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, তাঁর নামও তেমন পূর্ণশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। সুতরাং নাম ও নামীতে কোনো ভেদ নেই।

(১৩০)

অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥ (পদ্মপুরাণ ও পদ্যাবলী)

অর্থ : যে ব্যক্তির বিষ্ণুপ্রতিমায় শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মর্তবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের কলি-কলুষনাশক চরণামৃতে জলবুদ্ধি, সমস্ত পাপনাশক বিষ্ণুর নামরূপ মন্ত্রে সামান্য শব্দবুদ্ধি এবং সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সাথে তুল্য জ্ঞান করে, সে নিশ্চয়ই নারকী।

(১৩১)

সর্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ। হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্যাৎ দ্বিপদ্পাংশনঃ ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ। নাম্নোহপি সর্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥
জাতে নামপরাধেহপি প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সংকীর্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং। অবশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥ (পদ্ম পুরাণ)

তাৎপর্য : সর্বপ্রকার অপরাধকারী শ্রীহরির আশ্রয়গ্রহণে মুক্ত হয়; যে অধম হরির নিকট অপরাধ করে, সে যদি কখনও নামাশ্রয় করে, তবে সে ব্যক্তি নামের কৃপায় উদ্ধার পায়, কিন্তু সর্বসুহৃদ্ নামের নিকট অপরাধ নিষ্কৃতির অন্য উপায় নেই। যদি প্রমাদবশত কখনো নামাপরাধ জন্মে, তবে একমাত্র নামেরই শরণাগত হয়ে সর্বদা নামসংকীর্তন করতে হবে। অবিশ্রান্ত নাম করলে নামই সেই অপরাধ মার্জনা করবেন।

(১৩২)

বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতে
সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তি শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতী।
সানন্দং মধুপর্কসংভৃতিবিধৌ বেধা করোত্যুদ্যমং
বক্তুং নাম্নি তবেশ্বরাভিলষিতে ব্রূমঃ কিমন্যৎ পরং ॥ (কোন মহাজন কৃত)

অর্থ ; হে ঈশ, তোমার নামকীর্তনের অভিলাষ করলেই পাপসকল কম্পিত হয়, মোহমহিমা অর্থাৎ দেহ, গৃহ, জায়াদি সম্বন্ধীয় মোহাতিশয় সম্যক মোহ প্রাপ্ত হয়, সুনিপুণ চিত্রগুপ্ত শঙ্কিত হয়ে পূর্বে পাপীর শ্রেণীতে লিখিত (নাম-গ্রহণাভিলাষী ব্যক্তির) নাম কর্তনার্থ নখরঞ্জনী অর্থাৎ নরুণ ধারণ করেন; আর তিনি নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠে যাবেন, এ ভেবে ব্রহ্মা মধুপর্ক হাতে তার সংবর্ধনার উদ্যম করেন; হে প্রভো, তোমার নামগ্রহণাভিলাষী হলে যখন এরূপ হয়ে থাকে, তখন নামগ্রহণ করলে যে কী ফল হবে, তা আর কী বলব।

(১৩৩)

অংহঃ সংহরতেহখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব কিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥ (শ্রীধরকবি কৃত)

অর্থ : সূর্য যেমন উদিত হওয়ামাত্র অন্ধকারসমুদ্র শোষণ করে জগতের মঙ্গল বিধান করেন, সেরূপ জগতের মঙ্গলস্বরূপ শ্রীহরিনাম একবারমাত্র জীবের শ্রবণ বা বাগাদি ইন্দ্রিয়ে উদয় হলেই অখিলপাপ সংহার করে অশেষ মঙ্গল সাধন করেন।

(১৩৪)

চতুর্ণাং বেদানাং হৃদয়মিদমাকৃষ্য হরিণা চতুর্ভির্যদ্বর্ণৈঃ স্ফুটমঘটি নারায়ণপদং।
তদেতদ্গায়ন্তো বয়মনিশমাত্মানমধুনা পুনীমো জানীমো ন হরিপরিতোষায় কিমপি ॥ (শ্রীমল্লক্ষ্মীধর কৃত)

অর্থ : শ্রীহরি চারি বেদের হৃদয় অর্থাৎ সারাংশ আকর্ষণপূর্বক চারিটি বর্ণ দ্বারা স্পষ্টরূপে "নারায়ণ" নাম যোজনা করেছেন, সেজন্য এখন আমরা নিরন্তর সেই "নারায়ণ" নামই গান করে আত্মাকে পবিত্র করব; এছাড়া হরি-সন্তোষের অন্য কোনো সাধন জানি না।

(১৩৫)

কঃ পরেত নগরী পুরন্দরঃ কো ভবেদথ তদীয়কিঙ্করঃ।
কৃষ্ণনাম জগদেকমঙ্গলং কণ্ঠপীঠমুবরী করোতি চেৎ ॥ (শ্রীআনন্দাচার্য কৃত)

অর্থ : জগতের একমাত্র মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণনাম যদি কণ্ঠপীঠকে অঙ্গীকার করেন অর্থাৎ কণ্ঠে বিরাজ করেন, তাহলে প্রেতপুরের পুরন্দর যম কোথাকার কে এবং কেই বা তাঁর কিঙ্কর হয়?

(১৩৬)

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াং।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াং ॥ (শ্রীধরস্বামী কৃত)

অর্থ : জ্ঞান ও সিদ্ধি এ দুটি তুলাতে তুলিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণনাম ও প্রেম এ দুটি তুলাতে তুলিত হয়নি অর্থাৎ নাম ও প্রেমের তুলনা নেই। (তুলা অর্থ দাঁড়িপাল্লা)

(১৩৭)

স্বর্গার্থীয়াব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজাং।
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ
সর্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রৌতু ॥ (শ্রীধরস্বামী কৃত)

অর্থ : স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য কর্মানুষ্ঠান কেবল লোকসকলকে দীন ভাবাপন্ন করে, মোক্ষ বা মুক্ত হওয়ার অভিলাষে করা জ্ঞানানুষ্ঠান মানুষকে কেবল ক্লেশের ভাগী করে মাত্র এবং যোগের অভ্যাস অতিশয় বিরস। সুতরাং এসবের অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান ও যজ্ঞানুষ্ঠানের কোনোই প্রয়োজন নেই, সেসব পরিত্যাগ করে আমার রসনা কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কীর্তন করুক।

(১৩৮)

সদা সর্বত্রাস্তে ননু বিমলমাদ্যং তব পদং
তথাপ্যেকং স্তোকং নহি ভবতরোঃ পত্রমভিনৎ।
ক্ষণং জিহ্বাগ্রস্তং তব নু ভগবন্নামনিখিলং
সমূলং সংসারং কষতি কতরৎ সেব্যমনয়োঃ ॥ (শ্রীধরস্বামী কৃত)

অর্থ : হে ভগবান, তোমার অঙ্গপ্রভা (ব্রহ্ম) ও নাম এ দুই স্বরূপের মধ্যে অর্থাৎ অঙ্গপ্রভারূপ ব্রহ্ম ও নামব্রহ্মের মধ্যে নামব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সেই অঙ্গপ্রভারূপ নির্মলব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজমান থাকলেও তিনি সংসার বৃক্ষের একটিমাত্র কোমলপত্রও ছিন্ন করতে সমর্থ হন না; কিন্তু হে প্রভো, তোমার নামব্রহ্ম ক্ষণকালের জন্যও জিহ্বাগ্রস্ত হলে মূলসহ সংসারতরু উৎপাটন করেন।

(১৩৯)

যোগশ্রুত্যুপপত্তিনির্জনবনধ্যানাধ্বসংভাবিতাঃ
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহরপ্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলধামনাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি ॥ (শ্রীমদীশ্বরপুরী কৃত)

অর্থ : দ্বিজাতিগণ অষ্টাঙ্গযোগ, বেদানুশীল, নির্জন বনে ধ্যান এবং তীর্থপর্যটন দ্বারা সম্ভাবিত নির্ভয় স্বরূপানুভূতি প্রাপ্ত হয়ে অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করে যদি মুক্ত হন, হোন; কিন্তু আমরা কদম্বকুঞ্জকুহরে বিকশিত ইন্দীবর শ্রেণীতুল্য শ্যামসুন্দর নামের সেবক, অতএব আমাদের লক্ষ লক্ষ জন্ম হোক।

এর ভাবার্থ হলো, মোক্ষপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা সংসারে জন্ম গ্রহণ করে নামকীর্তন অধিক আনন্দজনক।

(১৪০)

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং

পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানং।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম ॥ (এক মহাজনকৃত)

অর্থ : হে ভক্তগণ, সমস্ত কল্যাণের আদি কারণ, কলির কলুষনাশক, সকল পবিত্রের পবিত্র, উচ্চারণমাত্রে মুমুক্ষুদের সহসা পরম পদ লাভের পাথেয়স্বরূপ, পণ্ডিতদের বাক্য সকলের একমাত্র বিশ্রামস্থান, সাধুদের জীবনতুল্য এবং ধর্মবৃক্ষের বীজসদৃশ কৃষ্ণনাম তোমাদের সমৃদ্ধির কারণ হোক।

(১৪১)

বিচেয়ানি বিচার্যাণি বিচিন্তাণি পুনঃ পুনঃ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু নঃ ॥ (শ্রীভবানন্দ কৃত)

অর্থ : হে ভগবান, কৃপণেরা যেমন যত্নের সাথে নানা স্থান হতে ধনসংগ্রহ করে, ধনের মনোহারিত্ব ও বহু মূল্যত্ব আদি বিচার করে এবং সর্বদা ধনের রক্ষণ বিষয়ে চিন্তা করে, সেরূপ তোমার নাম আমাদের সঞ্চয়ের বিষয়, বিচার্য ও চিন্তনীয় হোক।

(১৪২)

শ্রীরামেতি জনার্দনেতি জগতাং নাথেতি নারায়ণে-
ত্যানন্দেতি দয়াপরেতি কমলাকান্তেতি কৃষ্ণেতি চ।
শ্রীমন্নামমহামৃতাব্ধিলহরীকল্লোলমগ্নং মুহু-
র্মুহ্যন্তং গলদশ্রুনেত্রমবশং মাং নাথ নিত্যং কুরু ॥ (শ্রীলক্ষ্মীধর কৃত)

অর্থ : হে রাম, হে জনার্দন, হে জগন্নাথ, হে নারায়ণ, হে আনন্দ, হে দয়াপর, হে কমলাকান্ত, হে কৃষ্ণ, হে নাথ, তোমার এ সকল শ্রীমন্নামরূপ মহাসুধাসিন্ধুর লহরীকল্লোলে নিত্য আমাকে মগ্ন, বারংবার মোহযুক্ত, সজলনেত্র ও বিবশতাপন্ন করতে আজ্ঞা হোক।

(১৪৩)

শ্রীকান্ত কৃষ্ণ করুণাময় কঞ্জনাভ কৈবল্যবল্লভ মুকুন্দ মুরান্তকেতি।
নামাবলীং বিমলমৌক্তিকহারলক্ষ্মী লাবণ্যবঞ্চনকরীং করবাম কণ্ঠে ॥ (শ্রীলক্ষ্মীধর কৃত)

অর্থ : শ্রীকান্ত, কৃষ্ণ, করুণাময়, পদ্মনাভ, কৈবল্যপতি, মুকুন্দ ও মুরান্তক এ সকল নির্মল মুক্তাহারের শোভা তিরস্কারিণী নামাবলীকেই আমরা সর্বদা কণ্ঠে ধারণ করব।

(১৪৪)

জয় জয় জয় দেব দেব দেব ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যনামধেয়
জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণ দেব শ্রবণমনো নয়নামৃতাবতারঃ ॥ (শ্রীবিল্বমঙ্গল)

অর্থ : হে দেব, হে দেব, হে দেব, হে কৃষ্ণদেব, হে শ্রবণ-মনো নয়নামৃতাবতার, হে ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যনামধেয়, তোমার জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক।

(১৪৫)

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্বৈর্নাট্যৈর্যঃ পরিকীর্তিতঃ ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোহল্পদর্শকঃ ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥ (ভক্তিরসামৃত সিন্ধু)

অর্থ : নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভেদে হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ বলিয়া খ্যাত; পণ্ডিতগণ হরির অখিলগুণ প্রকাশক স্বরূপকে পূর্ণতম, তদপেক্ষা অল্পগুণ প্রকাশক স্বরূপকে পূর্ণতর ও তা অপেক্ষা অল্পগুণ প্রকাশক স্বরূপকে পূর্ণ বলে কীর্তন করে থাকেন। কৃষ্ণ গোকুলে পূর্ণতম, মথুরা ও দ্বারকায় পূর্ণতর ও বৈকুণ্ঠে পূর্ণরূপে বিরাজমান। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বরূপই পূর্ণতম ভগবান।

যেমন ভগবানের নামীস্বরূপগণের ধাম ও লীলানুযায়ী ভগবত্ত্ব প্রকাশের তারতম্য অনুসারে পূর্ণতা, পূর্ণতরতা ও পূর্ণতমতা ভেদ আছে, সেরূপ ভগবানের নামস্বরূপগণেরও শক্তিগত তারতম্য আছে।

(১৪৬)

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।

সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥

অর্থ : মহাদেব বললেন, হে পার্বতী, আমি পুনঃ পুনঃ রামনাম কীর্তন করে পরমানন্দানুভব করি। রামনাম কীর্তন করলে মহাভারতীয় বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠের ফল লাভ হয়। অর্থাৎ বিষ্ণুসহস্রনামের ফল এক রাম নামেই প্রকটিত।

(১৪৭)

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

অর্থ : বিষ্ণুসহস্রনাম তিনবার আবৃত্তি করলে যে ফল লাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণের নাম একবার আবৃত্তিতেই সে ফল পাওয়া যায়।

(১৪৮)

নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরং ॥ (প্রভাস পুরাণ)

অর্থ : ভগবান বললেন, "হে পরন্তপ, আমার নামসকলের মধ্যে কৃষ্ণনামই মুখ্যতর, তা অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ও মুক্তিজনক।"

(১৪৯)

ইদং কীরিটী সংজপ্য জয়ী পাশুপতাস্ত্রভাক্।
কৃষ্ণস্য প্রাণভূতঃ সন্ কৃষ্ণং সারথিমাপ্তবান্ ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

অর্থ : অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধীয় একটিমাত্র নাম জপ করে সংগ্রামজয়ী পাশুপত অস্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

(১৫০)

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিতনিজধর্মধ্যানপূজাদিযত্নং।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণীনাং যৎপরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥ (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত)

অর্থ : শ্রীনাম ভগবানের আনন্দময় স্বরূপ, সেজন্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করলে শ্রীনাম প্রাণীদের স্বধর্ম, ধ্যান, অর্চন আদি অনুষ্ঠানের কষ্টকে বিরমিত করেন অর্থাৎ যাঁরা নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁদের স্বধর্ম, স্মরণ ও অর্চনাদি অনুষ্ঠানের ক্লেশ পেতে হয় না, নাম তাঁদের সর্ব মহা-সাধনের সর্ব মহাসাধ্য প্রদান করেন। প্রাণীগণ কোন প্রকারে (ক্ষুৎপিপাসাদি বা হেলায় শ্রদ্ধায়) একবার মাত্র নামাশ্রয় করলে নাম তাঁদের মুক্তি প্রদান করেন।

(১৫১)

নারদবীণোজ্জীবনসুধোর্মিনির্যাসমাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥ (স্তবমালা, শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক)

অর্থ : হে কৃষ্ণনাম, তুমি নারদ মুনির বীণার দ্বারা প্রকটতা লাভ করে সুধা-তরঙ্গের নির্যাসরূপ মাধুরীপূর হয়েছো। তুমি রসের সাথে আমার রসনায় অজস্র স্ফূর্তি লাভ করো।

(১৫২)

যস্মিন্ ন্যস্তমতির্নযাতি নরকং স্বর্গোহপি যচ্চিন্তনে
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোহপি লোকোহল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোহমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ
কিঞ্চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্তিতে ॥

অর্থ : যাঁকে চিত্তার্পণ করলে কখনো নরক দর্শন হয় না, যাঁর ধ্যানে স্বর্গপ্রাপ্তিও বিঘ্ন বলে প্রতীতি হয়, যাঁর ধ্যানে সমাধিপ্রাপ্ত হলে ব্রহ্মালোকও অতি তুচ্ছ বোধ হয়, যে অব্যয় পুরুষ অমলচিত্ত মানবগণের অন্তরে অবস্থিত হয়ে মুক্তি প্রদান করেন, সেই ভগবানের নামকীর্তনে যে পাপ দূরীভূত হবে এতে আশ্চর্য বা সন্দেহের কি আছে?

(১৫৩)

ইয়ঞ্চ কীর্তনাখ্যভক্তির্ভগবতোদ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াহীন
জনৈকবিষয়াপারকরুণাময়ীতিশ্রুতিপুরাণাদিবিশ্রুতিঃ।

(ক্রম সন্দর্ভ, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উক্তি)

অর্থ : কলির জীবগণ স্বভাবতই দ্রব্য-জাতি-গুণ-ক্রিয়াদিহীন, নিতান্ত দীনাতিদীন, এজন্যই করুণাময় সংকীর্তন, কলিতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং কলির দীনজীবকে অনায়াসে পূর্বযুগের সর্বমহাসাধনসমূহের সর্বমহাসাধ্য প্রদান করে কৃতার্থ করেছেন।

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-

মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মোক্ষশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগেব ফলিত শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ (পদ্যাবলী)

অর্থ : যাঁর দ্বারা স্বভাবতই চিত্ত আকৃষ্ট হয়, মহাপাতক নাশক, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন আচণ্ডাল লোকের পক্ষে সুলভ, মোক্ষ-সম্পত্তির বশী-কারক, দীক্ষাপুরশ্চর্যবিধান নিরপেক্ষ কৃষ্ণনাম মন্ত্র জিহ্বা স্পর্শমাত্রই দুর্বাসনা বিনাশ পূর্বক প্রেমফল প্রদান করেন।

(১৫৫)

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্ষা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

অর্থ : হে ভগবান, যাদের জিহ্বায় আপনার নাম বিরাজ করে, তারা যদি অত্যন্ত নীচকুলেও জন্মগ্রহণ করে, তবু তারা শ্রেষ্ঠ। যাঁরা আপনার নামকীর্তন করেন, তাঁরা সকল প্রকার তপস্যা করেছেন, সমস্ত যজ্ঞ করেছেন, সর্বতীর্থে স্নান করেছেন এবং সমস্ত বেদ পাঠ করেছেন, সুতরাং তাঁরা আর্যের মধ্যে পরিগণিত।

পুরাণে উক্ত আছে, এক যবন মলত্যাগকালে শূকরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে "হারাম হারাম" বলে বারবার চিৎকার করতে করতে প্রাণত্যাগ করার পর শুকরের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত "হারাম" শব্দের প্রভাবে তার মুক্তিলাভ হয়েছিল।

(১৫৬)

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ (বরাহ পুরাণ)

ভাবার্থ : এ শ্লোকের পাত্র যবন, মলত্যাগকালে বিন্মুত্রপূরিত শূকরের দ্বারা নিপীড়িত, ভীত, চঞ্চল, ম্রিয়মাণ যবনের ভগবন্নামে শ্রদ্ধা বা নামোচ্চারণের উদ্দেশ্যও নেই; তবুও কেবল শূকরোদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যাবনিক ভাষায় "হারাম" শব্দমাত্র উচ্চারিত হয়ে যবনকে যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত পরমপদ প্রদান করলেন।

যিনি শ্রদ্ধার সাথে নামগ্রহণ করেন, তাঁর অন্য কোনও সাধনের বা দেশ কালাদির অপেক্ষা না করে নাম যে তাঁকে পরমবস্তু প্রেম প্রদান করবেন, তাতে সন্দেহ কী?

(১৫৭)

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ (ভা: ৬/২/৪৯)

অর্থ : দাসীসঙ্গী ম্রিয়মাণ অজামিল যমদূত দর্শনে ভীত হয়ে "নারায়ণ" নামক স্বপুত্রকে আহ্বান করতেই তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, শ্রদ্ধার সাথে নামগ্রহণের ফলের কথা আর কী বলব?

(১৫৮)

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্তনং তব ॥ (ভা: ৮/২৩/১৬)

অর্থ : শুক্রাচার্য বললেন, হে ভগবান, মন্ত্রের স্বরভ্রংশাদির দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুর অশৌচ ও দক্ষিণার দ্বারা যে ছিদ্র বা ন্যূনতা ঘটে, আপনার নামসংকীর্তন তা নিশ্ছিদ্র করে থাকে।

(১৫৯)

সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমন্যং শ্রেয়োহস্তীত্যাহ এতদিতি। (শ্রীধর স্বামীপাদ কৃত টীকা)

অর্থ : সাধক বা সিদ্ধ সকলের পক্ষেই হরিনামের তুল্য আর অন্য শ্রেয় নেই।

(১৬০)

তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তৈরেব সুকৃতং কৃতং।
তৈরাপ্তং জন্মনঃ প্রাপ্যং যে কালে কীর্তয়ন্তি মাং ॥ (বরাহপুরাণ)

অর্থ : যারা স্নানকালে আমার নামকীর্তন করেন, তারা ধন্য, তারাই কৃতার্থ, তারাই পুণ্যকর্মা এবং তারাই জন্মের প্রাপ্য ফল লাভ করেছেন।